

ରଜାଦେଖାର ଉପକଥା



ରଜାଦେଖାର ଉପକଥା

SCANNED and PREPARED BY

SUDIP

boirboi.blogspot.com

বইটি পরে জদি ভালো লাগে তাহলে boirboi.blogspot.com এর chat box যে এসে
ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

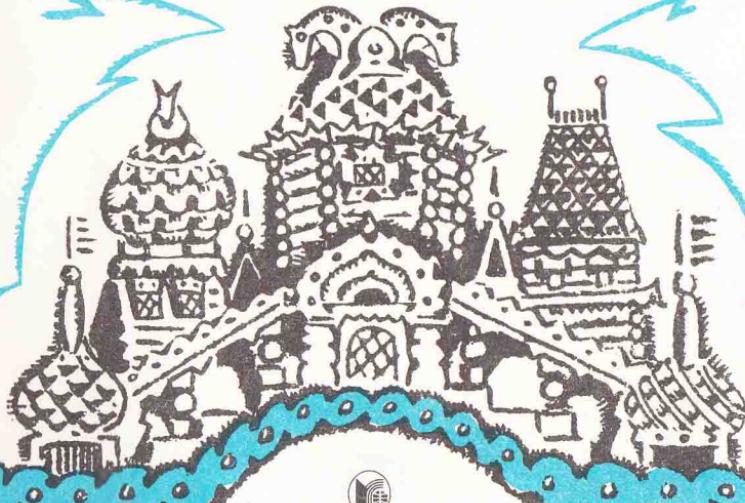


ncert.nic.in

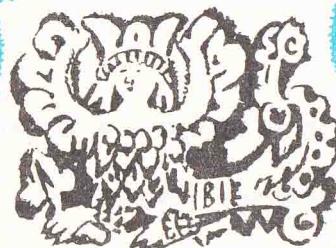
bairbel.blogspot.com



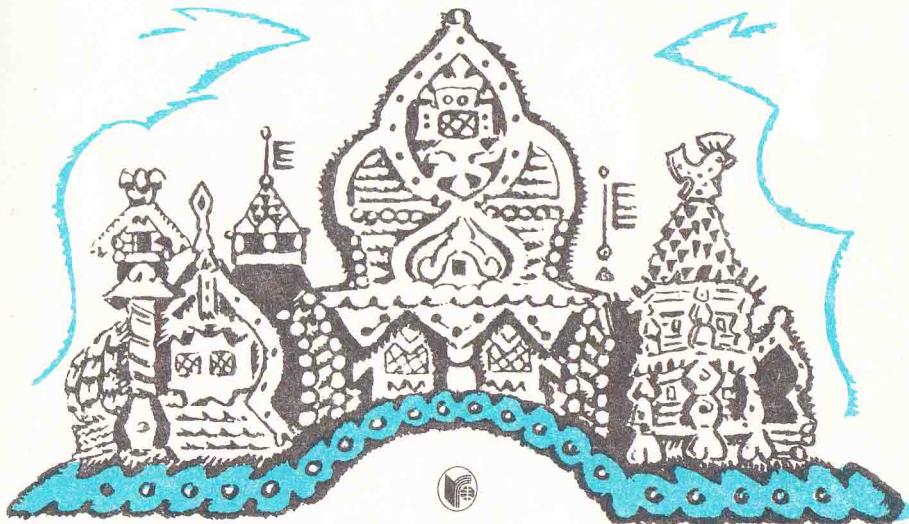
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО "РАДУГА"
МОСКВА



ଶ୍ରୀବ୍ରଜାଦିଶ୍ଵର ଉପରକଶା



‘ରାଧୁଗା’ ପ୍ରକାଶନ
ମାଙ୍କୋ

অনুবাদ: সুর্যপ্রসা ঘোষ

সম্পাদনা: নন্দী ভৌমিক

চিত্রাঙ্কন: ড. আ. মার্ভারিনা ও ক. ড. কুজেংসভ

অঙ্গসজ্ঞা: ড. আ. মার্ভারিনা

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

На языке бенгали

RUSSIAN FOLK TALES

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

P 4803000000-422 без объявления.
031(05)-86

ISBN 5 05 001557-X

সংচৰ্চ

ভূমিকা	৭
গোল রুটি	১০
সীম বাঁচি	১৪
হলদে-বুটি মোরগাটি	২১
শেয়াল আৱ নেকড়ে	২৬
শেয়াল আৱ সারস	৩০
কেঠো পা ভালুক	৩২
চাষী আৱ ভাজুক	৩৫
শীতেৰ বাসা	৩৭
সেয়ানা চাষী	৪০
সাত-বছুৱে	৪৮
কুড়লেৰ জাউ	৫০
ফমৱাজ আৱ সৈনিক	৫৫
গৰ্পী-বৌ	৬৯
জয়দারেৰ সঙ্গে কাঞ্জলেৰ ভোজন	৭৪
অভাৰ	৭৭
বৰফ-বুড়ো	৮৪
ঝাজহাঁস আৱ ছোট মেয়ে	৮৯
হাওৰোশেচকা	৯৩
আলিঙ্গনুশকা বোন আৱ ইভানুশকা ভাই	৯৭

বাঙ্গ রাজকুমারী	102
বাদ্যকরী ভাসিলসার কথা	111
বালঘলে বাজ ফিনিস্ট	130
সিভ-কা-বৰ্কা	141
রাজপুত্র ইভান আৱ পাঁশুটে নেকড়ে	149
অ-জানি দেশেৱ না-জানি কী	158
কুদে ইভান বড় বৰ্দ্ধিয়ান	181
মাছেৱ আজ্ঞায়	208
নিকিতা কজেম্যাকা	219
ইলিয়া মুৱমেৎসেৱ প্ৰথম অভিযান	222
ইলিয়া মুৱমেৎস আৱ শিসে-ডাকাত সলভেই	227
দৰ্বীন্য নিকিতিচ আৱ জ্বেই গৱীনীচ	233
আলিওশা পপোভিচ	243
মিকুলা সেল্যানিভিচ	248

ভূমিকা

তোমরা যখন ছোট ছিলে, খুব ছোট, যখন লিখতে পড়তে কিছুই শের্ষান, তখন মা ঠাকুরমার কোলে বসে রূপকথা শুনতে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতে।

এখন তোমরা বড় হয়েছ। তবু সেই তোমাদের প্রিয় রূপকথার ভদ্র ও নির্ভয় আর হাসিখুশি সব বক্তৃনায়কদের সঙ্গে ঘোগ হয়ত একেবারে হারিয়ে ফেলোনি। বহিয়ের পাতায় ছবির পর্দায় বা রঙমণ্ডে প্রায়ই তাদের সঙ্গে দেখা হয়।

বড়ো হয়ে তোমরা জেনেছ, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব রূপকথা আছে। বিভিন্ন দেশের রূপকথার মধ্যে যেমন মিল অনেক তেমনি তফাও প্রচুর। ভারতীয়, ইংরেজী, রুশী, জার্মান, ফরাসী, চীনে রূপকথার পার্থক্য খুব সহজেই ধরা যায়। কেননা সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং যে দেশে গল্পগুলি জন্মলাভ করে প্রায়বান্ধবমে হাতবদলের ফলে বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে, রূপকথায় যে সব কিছুর সংস্পর্শ ছাপ থেকে যায়। ছোটবেলায় তোমরা নিজেরাই যে সব রূপকথা শুনেছ, আমার তো মনে হয় তোমরা যখন অনেক বড় হবে, তখন তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও সেই সব রূপকথাই শোনাবে।

রূশদেশের লোকেরা অসংখ্য গাথা, নীতিকথা, সূক্ষ্য হেঁয়ালি আর চমৎকার চমৎকার রূপকথা রচনা করেছে।

এই সব কাহিনী পড়তে পড়তে দেখবে, ধারা কাহিনী বল্ছে তাদের কেউ থাকে দুর্বল নদীর পাড়ে, কেউবা বিস্তীর্ণ স্টেপ অগ্নিক্ষেত্রে কারও বাস স্কুলে পাহাড়ে, কারওবা ভীষণ গহন বনে।

এই সব কাহিনীর বেশির ভাগই যথন প্রথম বলা হয়েছিল, তারপর বহুশতাব্দী প্রয় হয়ে গেছে। যারা কাহিনী বলেছে তারা তাদের পছন্দমত, তাদের ইচ্ছামূলকে এদিক ওদিক বাড়িয়ে নতুন কিছু যোগ করে নতুন রূপ দিয়েছে। মাহিনীগুলো যত প্ররোচনা হয়েছে, ততই বেশি অনোগ্রাহী হয়েছে, আর তাদের শিল্পগুণও বেড়েছে! শত শত বছর ধরে লোকেরা ঘেজে ঘসে তুলার নানা টানে এদের একেবারে নির্ভুল করে তুলেছে।

এই সব কাহিনীর মধ্যে এমন সব কাব্য রসের পরিশ আছে যার টানে রাশদেশের বড় বড় সাহিত্যিক, শিল্পী অথবা সঙ্গীতজ্ঞ এ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। রাশদেশের বিখ্যাত কবি আলেক্সান্দ্র সের্গেরেভিচ পুর্শকিন (১৭৯৯—১৮৩৭) তাঁর বৃক্ষী দাইমার কাছে এসব কাহিনী শুনতে খুব ভালবাসতেন। পুর্শকিন বলেছেন, ‘কী অপরূপ এই রূপকথা! প্রত্যেকটি যেন এক একটি কবিতা।’

রাশদেশের উপকথায় যেমন বিষয়বৈচিত্র্য তেমনি প্রকাশবৈচিত্র্য। রুশী শিশুরা জীবজন্মুর গল্প অনেক জানে। এই জীবজন্মুর গল্পগুলো অনেককাল আগে শিকারীরা রচনা করেছে, তারা বনের জীবজন্মুকে ভাল করে চিনেছিল, দেখেছিল তাদের প্রত্যেকেরই চারিপিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব আছে। এই গল্পগুলি তৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে নীতিকথার মতো। তাতে রূপকের আকারে মানুষের লোভ, ধৰ্মার্থ, নিবৃত্তিতা প্রভৃতি নানা দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সবচেয়ে কাব্যময় আর আনন্দের ইল রূপকথাগুলো। এয়া আমাদের অপরূপ কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। মনে হয় এই সব রূপকথার ভিত্তি কেবল কল্পনা আর স্বপ্ন। অমঙ্গলের বাহনদের সঙ্গে এই সব রূপকথার মৌখীর নায়করা যদ্দু করেছেন, তাঁরা কেউই সাধারণ জগতের নিয়মে বাঁধা নন। কিন্তু তবু এই সব কিছুর ভিতরে মানুষের সত্যিকার স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। এই রূপকথাগুলির বীর নায়কেরা লোকপ্রচালিত আদশের মৃত্তি। তাঁরা সবসময়ই নিভীক, দঃসাহসী, মহৎ অমঙ্গলকে তাঁরা জয় করবেনই। রূশ কাহিনীকাররা খুব ভালোবাসেন ঘোরায়া গল্প ও চুট্টি।

এইসব উপরিথা যে কালে জন্ম নিয়েছে তখন মালিকরা তাদের গোলাম চাষীদের লিয়ে যা খুশী তাই করতে পারত। বিছী করতে পারত, সৈন্যদলে পাঠাতে পারত, কিম্বা ইচ্ছা হলে একটা শিকারী কুরুরের সঙ্গে বদল দিতে পারত। কিন্তু তবুও দেখা যায় গরীব চাষী ও সৈন্যরা সবসময় তাদের নিষ্ঠুর জোভী নিবন্ধনি প্রভু আর তার খামখেয়ালী স্তৰীকে শেষ পর্যন্ত জরু করে ছেড়েছে।

এই বইটিতে তোমরা এই সব গল্পই পড়বে।

এছাড়া কয়েকটি বীলীনাও পড়তে পাবে। প্রাচীন রূপ মহাকাব্যগুলি এই নামে অভিহিত। এদের একটা অন্তুত ধীর ছন্দ আছে। এখনও সৌভাগ্যের সন্দৰ্ভের উন্নরের কোন কোন লোকেরা এই সব গাথা গেয়ে বেড়ায়। এই সব বীলীনায় বলা হয়েছে রূপ বীর বগাতীরদের কথা, যারা তাদের মাতৃভূমিকে সাহসের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করে এসেছে।

উপরিথা পড়তে ছোটদের জেয়ে বড়রাও কিছু কম ভালবাসে না। কারণ এইসব গল্পের ভাষার সৌন্দর্য, নায়কদের মোহনীয়তায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না তাদের মর্মবাণীতে—কেননা এই সব গল্প দেশকে ভালবাসতে শেখায়, সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থা রাখতে বলে, উন্নত ভাবিষ্যত এবং মন্দের উপর ভালু জয়ের প্রত্যয় গড়ে তোলে।

এ. পমেরাঞ্জলি

boinbel.blog.net.com

boinbel.blog.net.com



baitai.blog.net.com

baitai.blog.net.com



গোল রুটি

এক ছিল বুড়ো আর এক বৃড়ী।

একদিন বৃড়ীকে বুড়ো ডেকে বলল:

‘ও বৃড়ী একবার হাঁড়িটা চেছে, ময়দার টিন বেড়ে বেছে দেখ না, একটু ময়দা পাস কিনা। একটা গোল রুটি করে দিবি?’

বৃড়ী তখন একটা ঘোরগের পাখনা নিয়ে বসে গেল। হাঁড়ি চেছে, ময়দার টিন বেড়ে, কোনরকমে দু'মণ্ডো ময়দা বের করল।

ময়ান দিয়ে বৃড়ী ময়দাটুকু ঠাসল। তারপর সূন্দর গোল একটা রুটি তৈরী করে, ঘিরে ভেজে, রেখে দিল জানলার ওপরে জুড়বার জন্যে।

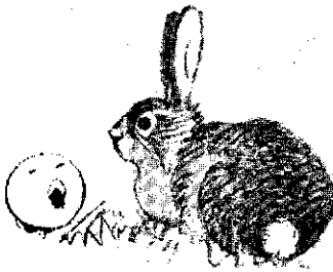
গোল রুটি আছে, আছে, হঠাত গড় গড় — গড়তে শুরু করল — জানলা থেকে বেঁশি, বেঁশি থেকে মেঝে, মেঝে থেকে গাঁড়য়ে দরজার কাছে — এসে একলাফে ঢোকাট ডিঙিয়ে সোজা বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি পেরিয়ে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে ফটক, ফটক তো চললই।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক খরগোসের সঙ্গে।
খরগোস বলল,

‘গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব !’

শোল রুটি বলল, ‘খাস না খরগোস, বরং গান গাই শোন্ :

ছোট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়েতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই !
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস, তুইও পাবি না !’



খরগোস চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে
গেল বহুদ্রু।

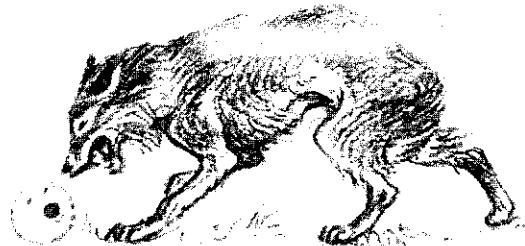
গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক নেকড়ের সঙ্গে।

‘গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব !’

‘পাঁশটে নেকড়ে, খাস না, গান গাই শোন্ :

ছোট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,

ষি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
ওরে নেকড়ে, তুইও পাব না!



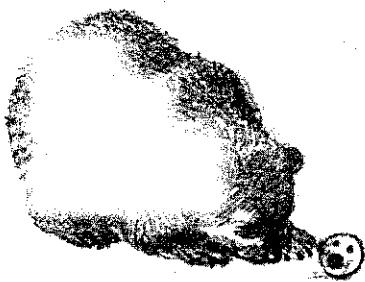
নেকড়ের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রূটি গড়াতে গড়াতে চলে
গেল বহুদুর।

গোল রূটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক ভালুকের সঙ্গে।

‘গোল রূটি, গোল রূটি, তোকে আমি খাব !’

‘ওরে ট্যারা-থাবা ভালুক, আমার খাওয়া তোর কম্ম নয় !’

ছোটু গোল রূটি,
চৰ্ছি গৃটিগৃটি,
গমের ধাঘা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ষি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
নেকড়ে পেল না,
ভালুক, তুইও পাব না !’



ভালুকের ছাঁথের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে
গেল বহুদ্রুণ।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক শেয়ালের সঙ্গে।

‘গোল রুটি, গোল রুটি বল্ তো, গাড়িয়ে গাড়িয়ে চললি কোথায়?’
‘চলেছি রাস্তা বেয়ে।’

‘তা বেশ, কিন্তু একটা গান শুনিয়ে যা না ভাই।’

গোল রুটি গান সুরু করল:



‘ছোট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
মরদার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়েতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বৃঢ়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
নেকড়ে পেল না,
ভালুক পেল না;
সেয়ান্য শেয়াল, তুইও পাবি না।’

শেয়াল বলল, ‘বা ! খাসা গান ! কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব ভালুক, কানে ভাল
শুনতে না পাই ! এক কাজ কর, আমার নাকে বসে, গান ধর, কুই !’

এক জাফে শেয়ালের নাকে চড়ে বসল গোল রুটি। তারপর জোর গলায়
গান ধরল।

শেয়াল তবু আবার বলে:

‘গোল রাঢ়িট, গোল রাঢ়িট, একটু বসে জিভের ‘পরে, শেষবারটি শুনিয়ে
দে রে।’

গোল রাঢ়িট এক লাফে গিয়ে বসল একেবারে শেয়ালের জিভের ওপর —
বস্তু — শেয়ালও অম্বিন খেয়ে ফেলল।





সীম বীচি

এক ছিল মোরগ আর মুরগী। খুঁটে খুঁটে থাচ্ছে মোরগ, খুঁটে তুলল
সীমের বীচি।

‘কক্-কক্-কক্, গিন্ধী, বীচি খাবি আয় !’

‘কক্-কক্-কক্, মোরগ, তুই-ই খা !’

সীমের বিচি থেলে মোরগ কিঞ্জি গলায় গেল আটকে। তখন মোরগ-গিন্ধীকে
ডেকে বলল:

‘গিন্ধী, নদীকে গিয়ে বল আমায় একটু জল দিতে !’

মোরগ-গিন্ধী দৌড়েল নদীর কাছে।

‘নদী, নদী, একটু জল দাও না ? মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে !’

নদী বলল:

‘আগে লাইম গাছের কাছে যাও, একটা পাতা চেয়ে আনো, তবে জল দেব।’
মোরগ-গিন্বী দোড়েল লাইম গাছের কাছে।

‘লাইম গাছ, ও লাইম গাছ, একটা পাতা দাও না ? পাতা নিয়ে নদীকে
দেব, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে
গেছে।’

লাইম গাছ বলল :

‘আগে চাষীমেয়ের কাছে যাও, একগাছি সুতো চেয়ে আনো, তবে
পাতা দেব।’

মোরগ-গিন্বী ছুটল চাষীমেয়ের কাছে।

‘চাষীমেয়ে, চাষীমেয়ে, একগাছি সুতো দাও না ? সুতো নিয়ে লাইম গাছকে
দেব, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা নদীকে দেব, তবে নদী জল দেবে, তবে
মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।’

চাষীমেয়ে বলল :

‘আগে চিরুনিওয়ালার কাছে যাও, একটা চিরুনি নিয়ে এস, তবে
সুতো দেব।’

মোরগ-গিন্বী ছুটল চিরুনিওয়ালার কাছে।

‘চিরুনিওয়ালা, ও চিরুনিওয়ালা, একটা চিরুনি দাও না ? চিরুনি দেব
চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে
লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে,
মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।’

চিরুনিওয়ালা বলল :

‘আগে রুটিওয়ালার কাছে যাও, একটা রুটি এনে দাও, তবে পাবে চিরুনি।’

মোরগ-গিন্বী ছুটল রুটিওয়ালার কাছে।

‘রুটিওয়ালা, ও রুটিওয়ালা, আমায় একটা রুটি দাও না ? রুটি নিয়ে
চিরুনিওয়ালাকে দেব, তবে চিরুনিওয়ালা চিরুনি দেবে।’ চিরুনি দেব
চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে

লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে,
মোরগের গজুর সীম বীচ আটকে গেছে।'

রুটিওয়ালা বলল:

'আগে কাঠুরের কাছে ধাও, জবালানি কাঠ এনে দাও, তবে রুটি দেব।'
মোরগ-গিন্বী ছুটল কাঠুরের কাছে।

'কাঠুরে, ও কাঠুরে, একটু জবালানি কাঠ দাও না? জবালানি দেব
রুটিওয়ালাকে, তবে রুটিওয়ালা রুটি দেবে। রুটি দেব চিরুনিওয়ালাকে, তবে
চিরুনিওয়ালা চিরুনি দেবে। চিরুনি দেব চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো
দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব
নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গজুর সীম বীচ
আটকে গেছে।'

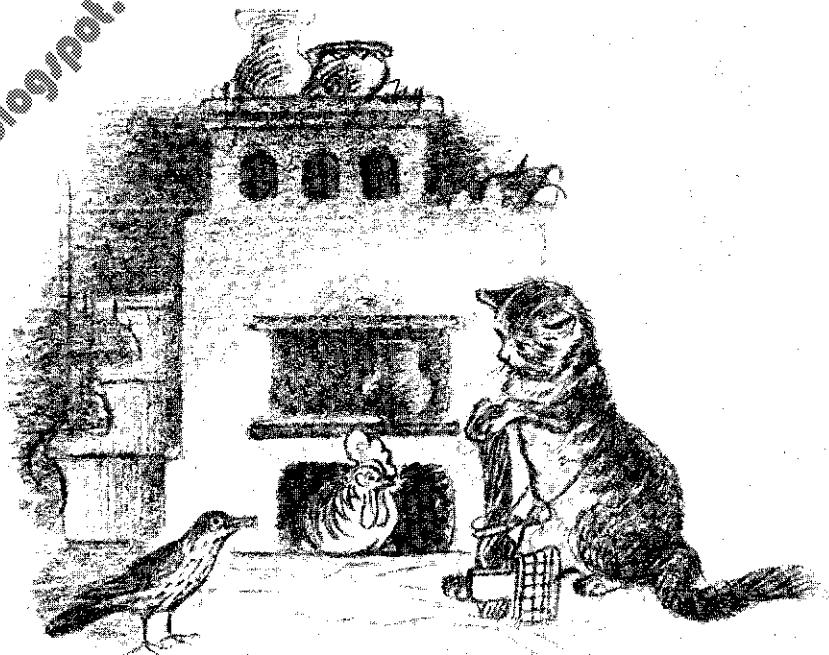
মোরগ-গিন্বীকে কাঠ দিল কাঠুরে।

মোরগ-গিন্বী কাঠ নিয়ে গেল রুটিওয়ালার কাছে। রুটিওয়ালা রুটি দিল।
রুটি পেয়ে চিরুনিওয়ালা চিরুনি দিল। চিরুনি পেয়ে চাষীমেয়ে সুতো দিল।
সুতো পেয়ে লাইম গাছ পাতা দিল। পাতা পেয়ে নদী মোরগের জন্মে একটু
জল দিল।

মোরগ জল খেল। সীম বীচ নেমে গেল।

মোরগ ডেকে উঠল:

'কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ!'



হলদে-বুঁটি মোরগাটি

এক বেড়াল, এক শালিক আর এক হলদে-বুঁটি মোরগাটি। ছিল তারা একই বনে, একই কুঁড়েয়। বেড়াল? শালিক গভীর বনে চলে যায় কাঠ আনতে, মোরগ বাড়ীতে থাকে একা। বেরবার আগে ওরা মোরগকে সাধান করে দেয়:

‘আমরা দূরে চলে যাচ্ছি। তুই ঘর দোর দেখিস। কিন্তু আবধান টুঁ শব্দটি করবি না। আর শেয়াল এলে জানলা দিয়ে আবার মাথা দুর করিস না।’

শেয়াল যেই দেখে বেড়াল আর শালিক বেরিয়ে গেছে, অম্বিন মোরগের জানলার নীচে গিয়ে গান জোড়ে:

‘হলদে ঝুঁটি, হলদে ঝুঁটি,
বাহাবে মোর মোরগাঁটি,
তেল-চক্-চক্ তোমার গা,
রেশমী তোমার দাঢ়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুর্টি নিয়ে নাও !’

গান শুনে মোরগ যেই মুখ বের করেছে, অমনি শেয়াল খ্যাঁক করে ধরে
নিয়ে চলল নিজের গর্তে ।

ছোট্ট মোরগ চীৎকার করে কাঁদতে লাগল :

‘শেয়ালে নিল ধ-রে
গহন বন পা-রে,
ধর নদীর ধা-রে,
খাড়া পাহাড় ঘু-রে ...
ও শালিক, ও বেড়াল রে,
আয় না বাঁচা মো-রে !’

মোরগের কানা কানে যেতেই বেড়াল আর শালিক শেয়ালের পেছনে ছুটল
মোরগকে ছিনয়ে আনল শেয়ালের হাত থেকে ।

আবার বেড়াল আর শালিক কাঠ কাটতে গেল । আবার মোরগকে সাবধান
করল :

‘দেখ বাপদ মুরগাঁর পো, আজ আবার যেন মুখ বের করিস না । আজ
আমরা আরও দূরে যাব, হয়ত তোর ডাক শন্তেই পাৰ না !’

বেড়াল আর শালিক বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনি শেয়াল বাড়ীয়ে কাছে
গিয়ে গান ধরল :

‘হলদে ঝঁটি, হলদে ঝঁটি,
বাহারে মোর মোরগাটি,
তেল-চক্-চক্ তোমার গা,
বেশভী তোমার দাঢ়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুটি নিয়ে নাও।’

মোরগ কিন্তু চুপটি করেই বসে রইল। তাই শেয়াল ফের গান ধরল:

‘ছেলেমেয়েরা এ পথ দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে,
দৌড়ে খেতে গমগন্তো সব ছাড়িয়ে পড়েছে।
মুরগীর দল খুঁটে খুঁটে খেতে লেগেছে,
মুরগীর দল মোরগদের বাদ দিয়েছে ...’

মোরগ জানলা দিয়ে মুখ বের করে বলল:

‘কক্ কক্ কক্ ! বাদ দেবে কেন ?’

আর অর্মান শেয়াল ওকে থ্যাংক করে ধরে নিয়ে চলল নিজের গর্তে। মোরগ
চীৎকার করে কান্না জুড়ল:

‘শেয়ালে নিল ধ-রে
গহন বন পা-রে,
ধর নদীর ধা-রে,
খাড়া পাহাড় ঘু-রে ...
ও শালিক, ও বেড়াল রে,
আয় না বাঁচা মো-রে !’

মোরগের কান্না কানে পেঁচতেই শালিক আর বেড়াল শেয়ালের পিছনে
ছুটল। বেড়াল মাটিতে ছোটে, শালিক বাতাসে ওড়ে... শেয়ালকে ধরে বেড়াল
আঁচড়ায়, শালিক ঠোকরায়, কেড়ে নিল মোরগকে।

দিন যাই ফের আবার শালিক বেড়াল গভীর বনে কাঠ কাটতে ধাবার জন্মে
তৈরী হলু ধাবার আগে মোরগকে ওরা অনেক সাবধান করে দিল:

‘তোয়ালের কথা শৰ্দ্দানস না, মূখ বের করিস না। আজ আমরা আরও দূরে
মরি। চেঁচালে শুনতেও পাব না।’

এই বলে শালিক আর বেড়াল বনে কাঠ কাটতে চলে গেল অনেক দূরে।
এদিকে শেয়ালও এসে জানলাৰ নীচে বসে বসে গান ধৱল:

‘হলদে ঝুঁটি, হলদে ঝুঁটি,
বাহারে মোৰ মোৰগটি,
তেল-চক্-চক্ তোমার গা,
রেশমী তোমার দাঢ়ীটা,
জানলা দিয়ে মূখ বাড়াও,
মটৱশুঁটি নিরে নাও।’

মোৱগ তবু চুপ করে বসে রইল। তাই শেয়াল আৰ একটা গান ধৱল:

‘ছেলেমেয়েৱা এ পথ দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে,
দৌড়ে যেতে গমগুলো সব ছাড়িয়ে পড়েছে।
মূৱগীৰ দল খুঁটে খুঁটে খেতে লেগেছে,
মূৱগীৰ দল মোৱগদেৱ বাদ দিয়েছে...’

তবু চুপটি করে বসে রইল মোৱগটি। শেয়াল তাই ফের গান ধৱল:

‘লোকজনৱা এ পথ দিয়ে চলে গিয়েছে,
যেতে যেতে বাদামগুলো ছাড়িয়ে পড়েছে।
মূৱগীৰ দল খুঁটে খুঁটে খেতে লেগেছে,
মূৱগীৰ দল মোৱগদেৱ বাদ দিয়েছে...’

মোরগ তাম্ভে ভানলা দিয়ে মুখ বের করে বলল:

‘কক্ কুক্ কক্ ! বাদ দেবে কেন ?’

বাস্তু ! অমনি শেয়াল খাঁক করে ধরে গহন বনের পারে, খর নদীর ধারে, খাড়া পাহাড় ঘৰে নিজের গতে নিয়ে গোল ওকে ...

মোরগ যত ডাকে যত চেঁচায়, শালিক আর বেড়াল কিন্তু কিছু শুনতে পায় না। যখন বাড়ী ফিরল তখন দেখে মোরগ নেই।

শালিক আর বেড়াল তখন চলল শেয়ালের পারের দাগ ধরে ধরে। বেড়াল মাটিতে ছোটে, শালিক বাতাসে ওড়ে ... শেষকালে তো শেয়ালের গতে পেঁচল ওরা। বেড়াল বাজনা বাজিয়ে গান আরস্ত করল:

‘গিম্ গিম বাজনদার,
বোল তুলেছে সোনার তার ...
শেয়াল-বোন কি আছে ঘরে
গুটি সুটি কোটির জুড়ে ?’

গান শুনে শেয়াল ভাবল, “কে রে এত ভাল বাজনা বাজায়, এমন মিষ্টি করে গায় ! দেখ তো !”

গত ছেড়ে বাইরে এল শেয়াল। অমনি শালিক আর বেড়াল শেয়ালকে ধরে একেবারে মারণ আর ঠোকন। শেয়ালও ডেঁ ডেঁ দোড়।

শালিক আর বেড়াল তখন মোরগকে চুপড়ির মধ্যে বসিয়ে বয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে।

তারপর থেকে তারা সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল, এখনো করছে।



শেয়াল আর নেকড়ে

এক ছিল বৃক্ষে আর এক বৃক্ষী। একদিন বৃক্ষে বৃক্ষীকে বলল: ‘বৃক্ষী, কটা পিঠে করে দে। আমি ততক্ষণ ঘোড়া স্লেজে জুতে ফেলি। মাছ ধরতে যাব।’

অনেক মাছ ধরল বৃক্ষে। একেবারে মাছে ভরা স্লেজ। বাড়ী ফেরার পথে হঠাত দেখে এক শেয়াল: পুর্টালির মতো গুটিয়ে রাঙ্গায় শুয়ে।

স্লেজ থেকে নেমে বৃক্ষে গেল শেয়ালের কাছে, শেয়াল কিন্তু একটুও নড়ে না, মড়ার মত পড়ে রইল।

“কপাল ভালো! বৃক্ষীর গরম কোটের কলার করা যাবে নোসা।”

এই ভেবে বৃক্ষে শেয়ালটাকে স্লেজে চাপাল, নিজে ছালি আগে আগে।

শেয়াল দেখল এই সূযোগ। চুঁপচুঁপি স্লেজ থেকে একটি একটি করে মাছ ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। একটার পর একটা, ফেলে আর ফেলে।

সব মাছ ফেলা হয়ে গেল। শেয়ালও সুট্টি করে নেমে গেল।

বাড়ীতে পৌঁছেই বৃক্ষে চীৎকার করে বৃক্ষকে ডাকল:

‘বৃক্ষো, তোর কোটের কলারের জন্যে চমৎকার একটা জিনিস এনেছি! ’

বৃক্ষী তো দ্লেজের কাছে গিয়ে দেখে—কিছুই নেই, মাছ না, কলার না, একেবারে ফাঁকা। বৃক্ষীর সে কী বরুনি!

‘ওরে আহাম্বক, ওরে মুখপোড়া, আমাকে নিয়ে রংগড়ি! ’

বৃক্ষের তখন খেয়াল হল শেয়ালটা তো তাহলে মরা ছিল না। ভারি আফশোস হল, কিন্তু কী আর করে! যা হিবার সে তো হয়ে গেছে।

এদিকে শেয়াল তো তার বাস্তুর সব কটা মাছ একসঙ্গে জড় করে ভোজে বসেছে।

এমন সময় এক নেকড়ে এসে হাজির।

‘এই যে দাদা, খেতে বসেছ দেখছি, অতিথি বরণ করো! ’

‘আমি খাচ্ছি আমার, ভাগ নেই তোমার। ’

‘দাও না একটা মাছ! ’

‘নিজে ধরে খাও গে। ’

‘কিন্তু আমি যে মাছ ধরতে জানি না! ’

‘ফুঁ! আমি পারলে, তুমিও নিশ্চয়ই পারবে। নদীতে চলে যাও দাদা, বরফের গতে লেজ দুর্কিয়ে বসে বলবে: “এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়! এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়!” অর্থাৎ মাছও তোমার লেজ চেপে ধরবে। যত বসে থাকবে তত মাছ পাবে। ’

নেকড়ে চলল নদীর পাড়ে। বরফের গতে লেজ দুর্কিয়ে জাঁকিয়ে বসে কেবলি বলতে থাকল:

‘এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়! ’

এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়! ’

আর শেয়াল নেকড়ের চারপাশে ঘোরে আর মস্তুল পড়ে:

‘আকাশে শিটোচ্চিটে তারা তাকিয়ে,
নেকড়ের লেজখানা দে না জমিয়ে !’

নেকড়ে শেয়ালকে জিজ্ঞেস করল:

‘কী বিড়াবিড় করছো, দায় ?’

‘তোমার জন্মেই করছি, লেজে অনেক মাছ উঠিবে !’

এই বলে শেয়াল আবার ধূরো ধরল:

‘আকাশে শিটোচ্চিটে তারা তাকিয়ে,
নেকড়ের লেজখানা দে না জমিয়ে !’

সারা রাত অম্বিনি বসে রাইল নেকড়ে। লেজও ওর বরফে জমে গেল। ভোর
নাগাদ নেকড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে শাগাল, কিস্তু লেজ আর নড়ে না। ভাবল,
“দ্যাখো, কত হাছই না ধরেছি — টেনে তোলাই দায় !”

এখন সময় একটি ঘেঁয়ে নদীতে এল জল নিতে। নেকড়ে দেখেই সে চৌৎকার
জুড়ল:

‘নেকড়ে, নেকড়ে ! কে আছ, মারবে এস !’

নেকড়ে এদিক ঘোরে, ওদিক ঘোরে, তার লেজ কিস্তু ওঠে না। ঘেঁয়েটি তখন
বাল্পিত ফেলে রেখে বাঁকটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মার মার নেকড়েকে,
নেকড়ে মার খায় আর হাঁসফাঁস করে। করতে করতে যেই তার লেজটি খে
গেল, অম্বিনি ভৰ্তী দোড়।

মনে মনে নেকড়ে ভাবে, “দেখাচ্ছ দাঁড়াও শেয়াল ভায়া, এর প্রতিফল
পাবে !”

শেয়াল এদিকে চুঁপচুঁপি গিয়ে চুকেছিল ঐ ঘেঁয়েটির কুঁজেরে। বারকোশে
কিছু ময়দা ঠাসা ছিল। পেট প্রদরে তা সব খেয়ে, মাথায় কিছুটা মেথে শেয়াল
গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল রাস্তায়। পড়ে পড়ে কোঁথায়।

নেকড়ে তাকে দেখে বলল:

‘শেয়াল, ভায়া, বেশ মাছ ধরা শিখিয়েছিলে যা হোক! এই দেখ আমার
সারা গাঁথো কাল্পনিকে পড়ে গেছে...’

শেয়াল বলল:

‘আরে দাদা, তোমার জেজটা না ই঱্স নাই রইল, মাথাটা তো আছে। কিন্তু
আমার যে বাথোটা একেবারে গঁড়িয়ে দিয়েছে। এই দ্যাখো, পিটিয়ে পিটিয়ে
ঘিল়ু বার করে দিয়েছে কেমন। হামাগুড়ি পর্সন্ড দিতে পারছি না।’

নেকড়ে বলল:

‘তাই তো দেখছি ভায়া, আহা বেচারী! আমার পিঠে চড়ো, কোথায় যাবে
আমি যেয়ে নিয়ে যাই।’

শেয়াল তো তাই নেকড়ের পিঠে চেপে বসল। নেকড়ে তাকে বয়ে নিয়ে যাও।
নেকড়ের পিঠে চেপে চলেছে শেয়াল, আর গুনগুণিয়ে গাইছে:

‘তাগড়া শেয়াল জাঁকয়ে বসে
লেজ কাটাটোর পিঠে।’

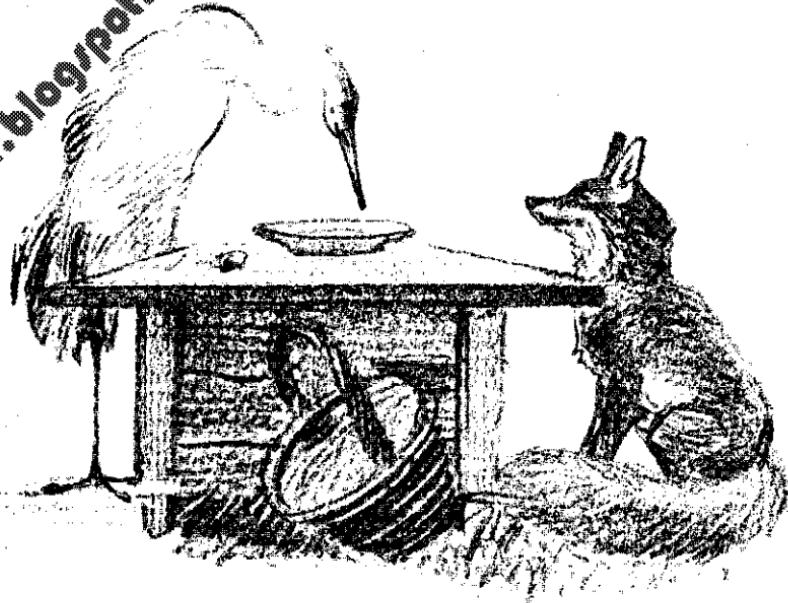
‘গুনগুন করে কী বলছ, ভায়া?’ নেকড়ে জিজেস করল।

শেয়াল বলল:

‘ও কিছু নয়। মন্তর পড়ছি। তোমার সব ব্যথা সেরে যাবে।’

এই বলে শেয়াল আবার গান ধরল:

‘তাগড়া শেয়াল জাঁকয়ে বসে
লেজ কাটাটোর পিঠে।’



শেঘাল আৱ সাৱস

শেঘাল আৱ সাৱস খুব ভাৱ।

একদিন শেঘাল ভাৱল সাৱসকে নেমন্তন্ত্ৰ কৰা যাক।

বলল, ‘এসো সই, এসো আমাৱ বাড়ীতে, নেমন্তন্ত্ৰ রইল।’

সাৱস তো নেমন্তন্ত্ৰ খেতে গৈল। শেঘাল কৱল কি, সৰজিৱ পৰিস রাখা
কৰে রেকাবে ঢেলে যত্ব কৰে অৰ্তিথকে খেতে দিল:

‘খেয়ে নাও সই, বক্ষ আমাৱ, নিজে হাতে রাখা কৱেছি।

সাৱস লম্বা ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে কেবলি ঠোকৰ মুখ, কিছুই আৱ গলায়
ওঠে না।

ইতিমধ্যে চেটেপুটে সব পার্শ্বে নিজেই শেষ করে দিল শেয়াল।

খেঁড়ে দেয়ে বলল:

‘কিছু মনে করো না সই, পাতে দেবার মতো আর কিছু নেই।’

সারস জবাব দিল:

‘ঠিক আছে। চের খেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। এবার তুমি এসো আমার বাড়ী,
একসঙ্গে খাওয়া যাবে।’

পরদিন শেয়াল গেল সারসের বাড়ী। সারস চমৎকার ঝোল রান্না করেছিল।
লম্বা সরু মুখ একটা কলসিতে করে তা খেতে দিল শেয়ালকে:

‘খাও সই, খেয়ে নাও! এই সব, আর কিন্তু কিছু নেই।’

কলসির মধ্যে শেয়াল মুখ ঢেকাতে চেষ্টা করল। এদিক থেকে এগোয়,
ওদিক থেকে এগোয়, একবার ঢাটে, একবার শৌকে, কিন্তু এক ঢোকও থেকে পারল
না: কলসির মধ্যে মাথা আর ঢোকে না।

ঠোঁট চূর্ণিয়ে সারস কিন্তু সব খেয়ে শেষ করে দিল।

বলল, ‘কিছু মনে করো না সই, পাতে দেবার মতো আর কিছু নেই।’

শেয়াল দুঃখে ঘরে। ভেবেছিল সাতদিনের খাওয়া খেয়ে নেবে, তার বদলে
ঘরে ফিরল থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। যেমন কর্ম তেমন ফল!

সেই থেকে শেয়াল সারসের বন্ধু ঘুচে গেল।



কেঠো পা ভালুক

এক ছিল বৃক্ষো আৰ ছিল এক বৃড়ী।

বৃক্ষোবৃড়ী কিছু শালগম লাগিয়েছিল। ভালুক এসে তা চুরি কৰে থেত।
বৃক্ষো ক্ষেত দেখতে গিয়ে দেখে, কে যেন শালগম উপড়ে চারিদিকে ছাড়িয়ে
যাবেছে।

বৃক্ষো বাড়ী এসে বৃড়ীকে সব বলল। বৃড়ী বলল:

‘কিন্তু কে একাজ কৱলৈ? মানুষ ইলে শালগমগুলো উপড়ে নিয়ে পালাব।
যত নষ্টের গোড়া ঐ ভালুকটারই কাজ। যা বৃক্ষো, চোৱেৱ ওপৰে নজৰ
যাখিস।’

বৃক্ষো একটা কুড়ুল নিয়ে চলল, সাবা রাজ পাহারা দেৰে বেড়াৰ পাশে
পৰ্যটি কৱে পড়ে রইল বৃক্ষো। হঠাতে দেখে, একটা ভালুক এসে শালগমগুলো
উপড়তে লাগল। তাৰপৰ বোঝা কৱে শালগম নিয়ে বেড়া টপকাতে
যাবে...

অমিন বুড়ো লাফয়ে উঠে কুড়ুল ছব্দে ভালুকের একটা ঠ্যাং কেটে নিয়ে
লুকিয়ে পড়া।

ভালুকটা ডাক ছেড়ে তিন পায়ে খণ্ডিয়ে খণ্ডিয়ে বনের দিকে চলে
গেল।

কাটা ঠ্যাংটা নিয়ে বুড়ো চলে এল বাড়ীতে। বলল:

‘এই নে বৰো, রান্না কৱিস।’

বৃড়ী সেটার ছাল ছাড়িয়ে সিক বসিয়ে দিল। তারপর ছাল থেকে
লোম ছাড়িয়ে নিয়ে ছালটা পেতে বসে, লোম পার্কিয়ে পশম বানাতে
লাগল।

বৃড়ী পশম বোনে আর ভালুকটা এবিদকে একটা কাঠের পা তৈরী করে
বুড়োবৃড়ীর ওপর শোধ তুলবে বলে বেরিয়ে পড়ল।

ভালুক হাঁটে, কাঠের পা খট্খটায়, নিজের মনে গজগজায়:

‘গৱ্ৰ, গৱ্ৰ, গৱ্ৰক,
আমি কেঠো পা ভালুক।
চাৰিদিকে সবে ঘুময়ে,
আমি চলি শুধু খণ্ডিয়ে।
বৃড়ী হোথা ঢ়ি জাগছে,
আমার গায়ের ছাল পেতে বসে
লোম দিয়ে সুতো কাটছে!
স্পধা দেখছ বৃড়ীটাৰ!
আমাৰ পায়ের মাংস রাঁধছে,
বসে বসে খাবে বুড়ো তাৰ।’

বৃড়ী শুনতে পেয়ে বলে:

‘বুড়ো, ও বুড়ো, দোৱটা দিয়ে দে। ভালুক আসছে ...’

ভালুকটা কিন্তু ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে। দৰজা বলে গৱ্ৰ, গৱ্ৰ
করে বলল:

‘গৱ্ৰ গৱ্ৰ গুৱৰক,
আমি কেঠো পা ভালুক।
চাৰিদিকে সবে ঘৰ্ময়ে,
আমি চলি শৃথ খণ্ডিয়ে।
বৃড়ী হোথা এই জাগছে,
আমাৰ গায়ের ছাল পেতে বসে
লোম দিয়ে সুতো কাটছে!
স্পৰ্ধা দেখছ বৃড়ীটাৰ !
আমাৰ পায়েৰ মাংস রাঁধছে,
বসে বসে খাবে বুড়ো তাৰ !’

বুড়োবৃড়ী তো ভয়ে মৰে। বুড়ো মাচাৰ ওপৰে গামলাৰ তলায় গিয়ে
লুকিয়ে রইল। বৃড়ী চুল্লিৰ ওপৰ।

ভালুকটা ঘৰে চুকে এখান খৌজে সেখান খৌজে। খৌজতে খৌজতে পা
ফসকে একেবাৰে তলকুঠিৱতে।

তখন পাড়াপড়শী সব দৌড়ে এসে মেৰে ফেলল ভালুকটাকে।



ଚାଷୀ ଆର ଭାଲୁକ

ଏକ ଚାଷୀ ଏକଦିନ ବନେ ଗେଲ ଶାଲଗମ ବୁନତେ । ଚାଷୀ ଲାଞ୍ଚିଲ ଚାଲାଛେ, ଏମନ ସମୟ ଏକ ଭାଲୁକ ଏମେ ହାଜିର ।

‘ଚାଷୀ, ଆୟି ତୋର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିଯେ ଦିଇ ।’

‘ନା ଭାଲୁକଦାଦା, ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିଯେ ଦିଓ ନା । ତାର ଚେଯେ ବରଂ ଏମୋ ଆମବା ଜୁଜନେ ମିଳେ ଶାଲଗମ ବୁନି । ଆୟି କେବଳ ଗୋଡ଼ାଟା ନେବ, ତୋମାଯ ଡଗାଟା ଦେଇ ।’

ଭାଲୁକ ବଲଲ, ‘ତା ବେଶ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ର ସଦି ଠକାଓ, ତାହଲେ ଆମାର ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲେ ଆର ନିଷ୍ଠାର ପାବେ ନା ।’

ଏହି ବଲେ ଭାଲୁକ ଚଲେ ଗେଲ ସନ ବନେର ମଧ୍ୟେ ।

ଏଦିକେ ଶାଲଗମଗୁଲୋ ବଡ଼ ହଲ । ଶରଙ୍କାଳ, ଚାଷୀ ଚଲିଲ ଶାଲଗମ ତୁଲତେ । ଭାଲୁକଟାଓ ଅର୍ମାନ ସନ ବନ ଥିକେ ବେରିଯେ ଏଲ । ବୁନ୍ଦିଲ୍:

‘শালগম ভুলা করো চাষী, আমার পাওনা দাও।’

‘ঠিক আছে, ভালুকদাদা, গোড়া আমার, ডগা তোমার।’

চাষী ভালুককে কেবল পাতাগুলো দিল। আর নিজে শালগমগুলো গাঢ়ী
যোঝাই করে নিয়ে সহরে গেল বেচতে।

পথে ভালুকের সঙ্গে দেখা।

‘কোথায় যাচ্ছ চাষী?’

‘এই সহরে যাচ্ছি ভাই, গোড়াগুলো বেচতে।’

‘দোখ, তোমার গোড়াগুলো থেতে কেমন?’

চাষী একটা শালগম দিল। ভালুক শালগমটা মুখে দিয়েই গজ্জন করে উঠল:

‘এ্যাঁ, তুমি দেখছি আমায় ঠকিয়েছ! গোড়াগুলো তোমার বেশী মিষ্টি।
আমার বনে যদি আর কোনোদিন জবালানি কাঠ নিতে আসো রক্ষে রাখব না,
হাড় গুঁড়িয়ে দেব।’

পরের বছর চাষী আবার ঠিক সেই জাহাঙ্গাতেই চাষ করল। এবার শালগম
নয়, রাই। রাই কাটার সময় হয়েছে। চাষী মাঠে গিয়ে দেখে ভালুক ঠিক হাজির।

বলল, ‘এবার বাপু, আর আমায় ঠকাতে পারছ না! ভাগ দাও আমার।’

চাষী বলল:

‘যো হুকুম। তুমি, ভালুকদাদা, তাহলে গোড়াগুলোই নাও, আর্মি নেব
কেবল ডগাটুকু।’

দৃঢ়নে মিলে ফসল তুলল ওরা। গোড়াগুলো সব চাষী দিয়ে দিল
ভালুককে। নিজে গাঢ়ী ভরে রাই নিয়ে গেল বাড়ীতে।

ভালুক গোড়াগুলো চিবোয় আর চিবোয়, কিন্তু বাগে আর আমতে
পারে না।

চাষীর ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেল ভালুক। সেই থেকে ভালুক আর
চাষীর বনে না।



শীতের বাসা

এক ছিল বুড়ো আর বুড়ী। তাদের একটা ষাঁড়, একটা ভেড়া, একটা হাঁস,
একটা মোরগ আর একটা শূয়োর।

বুড়ো একদিন বুড়ীকে বলল:

‘মোরগ পৃথ্বে কী আর লাভ হবে, বৌ? তার চেয়ে একটা গরুরের দিন দেখে
দিই জবাই করে!’

বুড়ী বলল, ‘ভাল কথা, তাই করা ষাক।’

মোরগ কিন্তু শুনতে পেয়েছিল। তাই রাত হতেই মোরগ খালয়ে গেল
বনে। পরদিন সকালে বুড়ো অর্তিপাঁতি করে সব খঙ্গে। মোরগের
চিহ্নও নেই।

সন্ধ্যাবেলা বুড়ো বুড়ীকে আবার বলল:

‘দেখ বৌ, মোরগ তো পেলুম না; শূয়োরটাই মারি! ’

বুড়ী বললি, ‘তা শুয়োরটাই মার।’

শুয়োর শূন্তে পেয়েছিল। রাত হতেই পালিয়ে গেল বনে।

বুড়ো আঁতপাঁতি করে সব খুজল। শুয়োরের চিহ্নও নেই।

বলল, ‘ভেড়াটাকেই কাটতে হবে দেখছি।’

‘তাই কাট।’

ভেড়া সব শূনে হাঁসকে বলল:

‘চল, আমরা দুজনেই বনে পালাই। নয়ত তোকেও কাটবে, আমাকেও কাটবে।’

ভেড়া আর হাঁস দুজনেই চলে গেল বনে।

বুড়ো উঠেনে এসে দেখে ভেড়াও নেই হাঁসও নেই। বুড়ো আঁতপাঁতি করে সব খুজল। কোথাও পেল না।

‘কী অস্তুত, সব ক’টা জন্মু পালিয়েছে, ষাঁড়টা কেবল বাঁক। শেষ অবধি ওটাকেই কাটতে হবে।’

‘কী আর করা, তাই কাট।’

শূনে ষাঁড়ও পালিয়ে গেল বনে।

গ্রীষ্মকালে বনে থাকা তো বেশ সুবিধা। পলাতকরা বেশ আরামেই রইল।
কিন্তু গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শীত এল।

ষাঁড় গিয়ে ভেড়াকে বলল:

‘কী বল ভায়া, শীতকাল তো এসে পড়ল। কাঠের একটা বাড়ী
বানাতে হয়।’

ভেড়া জবাব দিল:

‘আমার গায়েই তো পশমের কোর্টা আছে। শীতে আমার কিছুই ঝুঁত না।’

শুয়োরের কাছে গেল ষাঁড়।

‘চল শুয়োর, একটা কাঠের বাড়ী বানিয়ে ফেলি।’

শুয়োর বলল, ‘আরে ধ্যৎ, পড়ুক না শীত কত পজ্জতি পারে — আমি
পরোয়া করি না। মাটি খুঁড়ে তলায় দুকব; ব্যস্, বাড়ী ছাড়াই বেশ চলে যাবে।’
হাঁসের কাছে গেল ষাঁড়।

‘হাঁস, ও হাঁস, চল একটা কাঠের বাড়ী বানাই !’

‘বাড়ীতে আমার কাজ নেই ! এক ডানা পেতে শোবো, আরেক ডানায় গাঢ়াব। হাজির বরফেও ঠাণ্ডা লাগবে না !’

ষাঁড় গেল মোরগের কাছে।

‘আয় একটা কাঠের বাড়ী বানাই !’

‘বাড়ীতে কী হবে, ফার গাছের তলায় বসেই শীতটা বেশ কেটে যাবে !’

ষাঁড় দেখল, গতিক খারাপ, নিজের পথ তার নিজেকেই দেখতে হয়।

‘তোদের ইচ্ছে না থাকে তো বেশ, আমি নিজেই ঘর তুলব।’

ষাঁড় একাই কাঠ দিয়ে বাড়ী বানাল। চুল্লী জেবলে আগুন পোহায়, আরাম করে।

সে বছর ভয়ানক শীত পড়ল। শীতে শরীর জমে যায়। ভেড়া খট্টখট্ট করে ঘোরে, কিন্তু শরীর আর কিছুতেই গরম হয় না। শেষ পর্যন্ত গেল ষাঁড়ের কাছে।

‘ব্যা ! .. ব্যা ! .. দরজা খোল, ঘরে চুর্কি !’

‘না হে বাপু, সেটি হচ্ছে না, যখন তোকে সাহায্য করতে বলেছিলুম তখন বলেছিলি, গায়ে পশমের কোর্টা আছে, শীতকে পরোয়া করিস না !’

‘চুকতে দে বলছি ! নয়ত চুঁ মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেলব, তাহলে তুইও ঠাণ্ডায় জমে যাবি !’

ষাঁড় ভাবে আর ভাবে: “চুকতেই দিই, নইলে জামিয়ে মারবে !”

বলল, ‘বেশ, ভেতরেই আয়।’

ভেড়াটা ঘরে চুকে চুল্লীর সামনে একটা বেঁশতে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই দৌড়তে দৌড়তে শুয়োর এসে হাজির।

‘ঘোঁত ! ঘোঁত ! ও ষাঁড়, ঘরে গিয়ে একটু গরম হয়ে নিই !’

‘না হে বাপু, সেটি হচ্ছে না, যখন তোকে ঘর তুলতে ডেকেছিলুম তখন বলেছিলি, যতই শীত পড়ুক না, মাটি খুঁড়ে তলায় চুর্কিব।’

‘চুকতে দে বলছি ! নয়ত কোণগুলো সব খুঁড়ে খুঁড়ে বাড়ীটি তোর ধূলিসাং করে ছাড়ব।’

ষাঁড় ভাবে আৱ ভাবে: “বাড়ীটা দেখছি ধূলিসাং করে দেবে!”
বনল, ‘আ ভেতৰেই আয়।’

শয়ের দৌড়ে চুকে সোজা মাটিৰ নীচেৰ গৃদামঘৰে গিয়ে আৱাম করে
জাঁকিয়ে বসল।

তাৰপৰ এল হাঁস।

‘প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক! ষাঁড়, ও ষাঁড়, ঘৰে চুকে একটু গৱম হয়ে নিই।’

‘না হে বাপ, চুকতে দেব না! তোৱ দৰ’দৰটো ডালা। একটায় পেতে শো,
একটায় গা ঢাকা দে। বাড়ী ছাড়াই তোৱ বেশ চলে যাবে।’

‘চুকতে না দিলে কাঠেৰ ফাঁকে ফাঁকে যে শেওলা আছে সব টেনে ফেলে
দেব। ফুটো দিয়ে হুহু করে তখন শীত চুকবে।’

ষাঁড় ভেবে ভেবে শেষপৰ্যন্ত হাঁসকেও চুকতে দিল। হাঁসটা ঘৰে চুকে গিয়ে
বসল দাঁড়ে।

একটু পৱেই মোৱগ এল ধৈয়ে।

‘কোঁকৰ-কোঁ! ও ষাঁড়, দৱজা খোল, চুকতে দে।’

‘না খুলব না, যা না ফাৱ গাছেৰ তলায় তোৱ কোটৱে।’

‘চুকতে দে বলছি! নয়ত চালেৰ ওপৰ চেপে টুকৱে টুকৱে গত’ করে দেব।
হুহু করে শীত চুকবে তখন।’

মোৱগকেও চুকতে দিল ষাঁড়। মোৱগটা উড়ে গিয়ে বসল একটা
কণ্ঠিকাঠেৰ ওপৰ।

ৱাইল ওৱা একসঙ্গেই। পাঁচটিতে মিলে দিন কাটায়। নেকড়ে আৱ ভালুককেৰ
কানে গেল সে কথা। বলে:

‘চল, আমৱা গিয়ে সব কটাকে খেয়ে ফেলি, তাৰপৰ আমৱাই থক্কিৰ ঐ
ধৰটায়।’

এই বলে ৱাওনা হল। নেকড়ে ভালুককে বলল:

‘তোৱ গায়ে জোৱ অনেক, তুই আগে ঢোক।’

‘না রে, আৰম বড়ো চিলেটালা, তুই চটপটে, বৱণ্ণ তুই আগে ঢোক।’

নেকড়েই চুক্তি বাড়ীর মধ্যে। ঢোকা মাঝই সাঁড়টা দুই শিঙের মধ্যে তাকে আটকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল। ভেড়াটা দোড়ে এসে তুঁ মারে — দমাস্, দমাস্! আর মাটির নাচের গুদামঘর থেকে শূয়োরটা হাঁকে:

‘ছুরিতে কুড়ুলে শান পড়ে,
জ্যাঞ্জি খাব নেকড়েরে!’

হাঁস এসে চিমটি লাগায় নেকড়ের গায়ে, আর মোরগটা দাঁড়ে নেচে নেচে চাঁচায়:

‘সে আবার কী, রাখ ইয়ার্কি,
এইখানে দে আমায়,
ছুড়িও হেথা, দাড়িও হেথা ...
বুলিয়ে করি জবাই!’

হাঁকডাক শুনে ভালুক একেবারে চম্পট। নেকড়ে এদিকে ফেঁসে, ওদিকে ফেঁসে, কোনো রকমে শিং ফসকে পালিয়ে বাঁচে। ভালুককে গিয়ে বলে:

‘বাববাঃ, যা বিপদে পড়েছিলাম! খুব জোর বেঁচে গেছি! পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিল ... কালো কোট পরা একটা লোক আমায় মন্ত সাঁড়াশ দিয়ে ঠেসে ধরে দেওয়ালের সঙ্গে। তারপর ছাই রঙের কোট পরা বেঁটে একটা লোক এসে কুড়ুলের ভোঁতা দিক দিয়ে কী পিটুনি পিটলে। তারপর এল সাদা কোট পরা আরো বেঁটে একটা লোক। এসেই সাঁড়াশ দিয়ে চিমটি কাটতে লেগে গেল। আর দলের সবচেয়ে ক্ষুদ্রেটা টক্টকে লাল জামা পরে কাঁড়িকাঠের প্রশংস্য চাঁচাতে লাগল:

‘সে আবার কী, রাখ ইয়ার্কি,
এইখানে দে আমায়,
ছুরিও হেথা, দাড়িও হেথা ...
বুলিয়ে করি জবাই!’

আর তুম্হারি থেকে কে ষেন হাঁক দিলে:

“ছুরিতে কুড়লে শান পড়ে,
জ্যান্ত খাব নেকড়েবে !”

তারপর থেকে নেকড়ে আর ভালুক কাঠের বাঢ়ীর দিসৈমানায় ঘায়নি।

আর ষাঁড়, ভেড়া, শ্ৰেণোৱ, হাঁস আৱ মোৱগ বাস কৱে বাড়ীটায়, মনেৱ
আনন্দে দিন কাটায়।



ମେଘାଲା ଚାଷୀ

ଏକ ସେ ଛିଲ ବୁଢ଼ୀ । ତାର ଦ୍ଵାଇ ଛେଲେ । ବଡ଼ ଛେଲେ ମାରା ଗିଯାଇଛି । ଛୋଟ ଛେଲେଓ ଚଲେ ଗେଲ ଦୂର ଦେଶେ । ତାରପର ତିନ ଦିନଓ ହୟନ ଏକ ସୈନିକ ଏମେ ହାଜିର ହଲ ବୁଢ଼ୀର କାହେ । ବଲଲ :

‘ଆଜ ରାତଟାର ମତ ଥାକତେ ଦେବେ, ଠାକୁମା ?’

‘ଏମୋ ବାଛା, ଏମୋ । ତା କୋଥା ଥେକେ ଆସା ଇଚ୍ଛେ ?’

‘ଆମ ହଲୁମ ନିର୍ଖୋଜ । ଆସାଇ ଠାକୁମା, ସେଇ ପରଲୋକ ଥେକେ ।

‘ଦ୍ୟାଖୋ ଦିକ୍ ଚାଁଦ ଆମାର, କୌ ଆର ବଳି, ଆମାର ଛେଲେଟିଙ୍ଗ ମାରା ଗେଛେ । ଦେଖା ହୟନ ତାର ସଙ୍ଗେ ?’

‘ଦେଖିନ ଆବାର ? ଆମ ଆର ଓ ତୋ ଏକଇ ସବେ ହଲୁମ !’

‘ବଲୋ କୀ ?’

‘ছেলে তোমার পরলোকে সারস চরায়, ঠাকুমা !’

‘আহা যে, বেচারা ! খুবই কষ্টের কাজ বোধ হয় !’

‘তুমি আবার নয়, সারসগুলো যে কেবল কট্টা ঝোপেই ঘূরে বেড়ায়,
ঠাকুমা !’

‘জামাকাপড়ের টানাটানি নেই তো ?’

‘টানাটানি নেই আবার ! একেবারে ছশছাড়া অবস্থা !’

‘শোনো বাছা, আমার কাছে চল্লিশ হাত কাপড় আর দশটি রূবল্ আছে,
তুমি নিয়ে যাও, ছেলেকে দিও !’

‘তা দেব, ঠাকুমা !’

দিন যায়, বৃক্ষীর ছোট ছেলে ফিরে এল।

‘কেমন আছো মা ?’

‘তুই যখন বিদেশে ছিলি, তখন পরলোক থেকে নির্খোঁজ এসেছিল আমার
কাছে। তোর দাদার কথা কত বলল। একই ঘরে ছিল ওরা। ওর হাত দিয়ে
আমি এক থান কাপড় আর দশটি রূবল পাঠিয়েছি।’

ছেলে বলে, ‘এই যখন ব্যাপার, তখন আমি চললুম ! সারা প্রথিবী
ঘূরে তোমার চেয়েও বোকা যদি কোনাদিন পাই, তবেই ফিরব। নয়ত আর
ফিরব না !’

এই বলে পথে নামল ছেলে।

এল সে জর্মিদারদের গাঁয়ে, থামল জর্মিদার বাড়ীর সামনে। উঠোনে একটা
শুয়োর তার কাছাবাছা নিয়ে চরছে। তাই দেখে চাষী হাঁটু গেড়ে শুয়োরের
সামনে কুনির্ণ করতে লাগল। জর্মিদার-গীর্ণী ব্যাপারটা জানলা দিয়ে ক্লিয়েতে
পেয়ে দাসীকে ডেকে বলল:

‘মা তো, জিঞ্জেস করে আয়, চাষী কেন কুনির্ণ করছে !’

দাসী গিয়ে জিঞ্জেস করল:

‘ও চাষী, তুমি হাঁটু গেড়ে বসেছ কেন ? আয় শুয়োরকে কেন
কুনির্ণ করছ ?’

‘মনিব-শিল্পীকে গিয়ে বল মা, তোমাদের এই শূয়োরটি হলেন আমার শালী, কালৈ আমার ছেলের বিয়ে, নেমস্তন করতে এসেছি। শূয়োরটি হবেন বরকর্ত্তা, বাচ্চাগুলো বরষাত্রী, গিন্নীমা যেন অনুমতি দেন।’

জামিদার-গিন্নী শুনে বলল:

‘আচ্ছা বোকা তো, শূয়োর আর তার ছেলেপুলেকে কিনা নেমস্তন করছে বিয়েতে! ভালই হবে, সবাই হাসাহাসি করবে। এক কাজ কর, শূয়োরটাকে আমার লোম-দেওয়া কোটটা পরিয়ে দে। আর দুটো ঘোড়া ঘৃততে বলে দে গাড়ীতে! জাঁকিয়ে বিয়ের আসরে যেতে হবে তো।’

দুটো ঘোড়াকে লাগাম পরিয়ে গাড়ীতে যোতা হল। কাঢ়াবাঢ়া সমেত শূয়োর নিয়ে গাড়ীতে বয়ে দেওয়া হল চাষীকে। অর্মান চাষীও উঠে বসে ঘরমুখো গাড়ী হাঁকাল।

জামিদারমশাই শিকারে গিয়েছিল, বাড়ী ফিরে দেখে গিন্নী একেবারে হেসে আটখানা।

‘ওগো, শোনো শোনো, সে এক মজার ব্যাপার, তুমি দেখতে পেলে না। এক চাষী এসে আমাদের শূয়োরটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করছিল। বলে কিনা তোমাদের শূয়োরটি আমার শালী, তাই আমি এসেছি ওকে ছেলের বিয়েতে নেমস্তন করতে। শূয়োর নাকি হবে বরকর্ত্তা আর বাচ্চারা হবে বরষাত্রী! ’

জামিদার বলল, ‘হ্যাঁ, বুরোচি! শূয়োরটা দিয়ে দিয়েছো তো?’

‘হ্যাঁ গো, যেতে দিলাম শূয়োরটাকে, আমার লোম-দেওয়া কোটটা পরিয়ে গাড়ীতে দুটো ঘোড়া ঘৃতে পাঠিয়েছি।’

‘তা কোথায় থাকে চাষীটা?’

‘তা তো জানি না।’

‘দেখা যাচ্ছে তুমই আস্ত বোকা, চাষীটা নয়।’

বৌ বোকা বনেছে দেখে জামিদারবাবু ভীষণ রেগে ঘোল। তক্ষণ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে চাষীর পিছনে ধাওয়া করল। চাষীর কানে এল, পিছন পিছন কে যেন আসছে। অর্মান গাড়ীটা ঘূরিয়ে ঘন বনের

ମଧ୍ୟେ ନିଯେ ଗଲେ ରେଖେ ଏଳ । ତାରପର ଟୁପ୍ଟା ଖୁଲେ ମାଟିତେ ପେତେ ନିଜେ ବସେ
ରହିଲ ତାର ପାଶେ ।

‘ଓହଁ ଦାଡ଼ିଓଯାଲା, ଏକ ଚାଷୀକେ ଏ ପଥେ ସେତେ ଦେଖେଛୋ ? ସଙ୍ଗେ ତାର ଜୋଡ଼ା
ଘୋଡ଼ାଯ ଟାନା ଗାଡ଼ୀ, ଆର ତାତେ ଶ୍ରୋର ଆର ତାର ଛାନାପୋନା ବସେ,’
ଜୀମିଦାରମଶାଇ ଚାଂକାର କରେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ ଚାଷୀକେ ।

‘ଦେଖିନ ଆବାର, ମେ ତୋ ଅନେକକ୍ଷଣ ପେରିରେ ଗେଛେ ।’

‘କୋନ ଦିକେ ଗେଛେ ବଲତେ ପାରୋ ? ଧରତେ ଚାଇ ଏକବାର ଲୋକଟାକେ ।’

‘ଧରା କଠିନ । ନାନା ମୋଡ଼, ନାନା ବାଁକ । ପଥ ହାରିଯେ ଫେଲବେ ଗୋ ! ଏଦିକକାର
ପଥସାଟ ବୋଧ ହୟ ତେମନ ଚେନା ନେଇ ନା ?’

‘ଦେଖୋ ହେ ଭାଙ୍ଗା, ତୁମିଇ ନା ହୟ ଆମାର ହୟେ ଚାଷୀଟାକେ ଧରେ ଏନେ ଦାଓ ।’

‘ନା ବାବୁ, ତା ହୟ ନା । ଆମାର ଟୁପ୍ଟାର ନୀଚେ ଏକଟା ବାଜପାଖି ଆଛେ ଯେ !’

‘ଆମ ନା ହୟ ବାଜପାଖିଟା ଦେଖବ ।’

‘ନା ଗୋ, ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ବସବେ, ଦାମୀ ପାଖି । ମନିବ ଆମାର ଖେଯେ ଫେଲବେ ।’

‘ଦାମ କତ ପାଖିଟାର ?’

‘ତା ଶ’ ତିନେକ ରୁବଲ୍ ହବେ ।’

‘ବେଶ, ଉଡ଼େ ଗେଲେ ଦାମ ଦିଯେ ଦେବ ।’

‘ନା ବାବୁ, ଏଥନ ତୋ ବଲଛୋ, ପରେ କୀ ହବେ କେ ଜାନେ ।’

‘ବିଶେଷ ହଜ୍ଜେ ନା; ବେଶ, ଏହି ନାଓ ତିନ ଶ’ ରୁବଲ୍, ଏବାର ତୋ ଆର
ଭୟ ନେଇ ?’

ଟାକାଟି ନିଯେ ବାବୁର ଘୋଡ଼ାଯ ଚେପେ ବନେର ଭିତର ତୁକେ ଗେଲ ଚାଷୀ ଆର
ଜୀମିଦାର ବସେ ବସେ ଚାଷୀର ଶୁଣ୍ୟ ଟୁପ୍ଟା ପାହାରା ଦିତେ ଲାଗଲ । ଜୀମିଦାର ବସେ
ଆଛେ ତୋ ଆଛେଇ । ଅନେକକ୍ଷଣ କେଟେ ଗେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତ ଯାଏ, ତିନୁ ଚାଷୀର
ଆର ଦେଖା ନେଇ ।

‘ଦେଖ ତୋ ଏକବାର ଟୁପ୍ଟା ତୁଲେ, ସତାଇ ପାଧି ଆଛେ କିନା । ଯଦି
ଥାକେ, ତବେ ଲୋକଟା ଫିରେ ଆସବେ, ଆର ସଦି ନାଟି ଥାକେ ତୋ ଅପେକ୍ଷା
କରା ବ୍ୟଥା !’

এই ভেবে জৰিদারমশাই টুপি তুলে দেখে ভোঁ ভাঁ। কোথায় বাজপার্থি? কিছু নেই।

‘হত্তোমা! তাহলে এই চাষীটাই নিশ্চয়ই আমার গিম্বীকেও বোকা বাঁচিয়েছে!’

রেগে মেগে থুথু করতে করতে জৰিদারমশাই পারে হেঁটেই বাড়ীমুখো শোনা দিল। চাষী এদিকে বহু আগেই নিজের বাড়ী পেঁচে গিয়েছিল। মাকে ডেকে বলল:

‘শোনো মা, তোমার কাছেই ফিরে এলাম। দুর্নিয়ায় তোমার চেয়েও বোকা আছে। দেখো, এমনি এমনি মুক্তে পেয়ে গেলাম তিনটে ঘোড়া, একটা গাড়ী, তিন শ’ রুবল্ আর ছানাপোনাশুল্ক একটা শূরোর।’



মাত-বচুরে

দুই ভাই যাচ্ছে। একজন গরীব আর একজন ধনী। দুজনেরই একটা করে ঘোড়া। গরীব ভাইরের মাদী ঘোড়া আর ধনী ভাইরের মন্দা। এক জায়গার
থামল রাত কাটাতে।

রাতে গরীব ভাইরের ঘোড়া বাচ্চা দিল। বাচ্চাটা গড়িয়ে ধনী ভাইরের
গাড়ীর নীচে চলে গেল। সকালে ধনী ভাই গরীব ভাইকে ঘূম আঙ্গয়ে বলে:

‘ওঠ, ওঠ, দেখ, আমার গাড়ীটা কাল রাত্তিরে বাচ্চা দিলেছে।’

গরীব ভাই উঠে বলে:

‘গাড়ীর আবার বাচ্চা হবে কী? এ আমার ঘোড়াটির বাচ্চা।’

‘তাহলে তো বাচ্চাটা তোর ঘোড়ার পাশেই শুয়ে থাকত।’

ব্যস্ত, লেগে গেল ঝগড়া। ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। ধনী ভাই ঘৃষ দিয়ে খিসরকদের হাত করে নিল। আর গরীব বেচারা কী করে—সত্য কথাই তার একমাত্র সম্বল।

শেষ পর্যন্ত কথাটা রাজার কানে গেল।

রাজা দ্বাই ভাইকে ডেকে পাঠালেন আর চারটে ধাঁধা দিলেন।

‘প্রথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী কী, সবচেয়ে মোটা কী, সবচেয়ে নরম কী, আর সবচেয়ে মধুর কী?’

তিনিদিন সময় দিলেন ভাবতে।

রাজা বললেন, ‘চতুর্থ দিনে এসে উত্তর জানিয়ে যেও।’

ধনী ভাই ভাবে ভাবে, তারপর সহিয়ের কথা মনে পড়তে তার কাছে গেল উপদেশ নিতে।

সহী তাকে আদর করে ডেকে টেরিবলে বসাল। এটা ওটা খেতে দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল:

‘এত মন খারাপ কেন গো?’

‘আর বলো কেন, রাজা চারটি ধাঁধা দিয়েছেন; তিনিদিন মোটে সময়; চারাদিনের দিন উত্তর চাই।’

‘শুন কী ধাঁধা?’

‘প্রথমটা হল প্রথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী কী?’

‘এ আবার একটা ধাঁধা হল! আমার স্বামীর এক বাদামী ঘোড়া আছে, এর চেয়ে জোরে চলে এমন কিছু সারা প্রথিবীতেই নেই। এক চাবুক লাগাও দেখবে দৌড়ে খরগোস পাকড়ে আনবে।’

‘এইবার দ্বিতীয়টা, প্রথিবীতে সবচেয়ে মোটা কী?’

‘দ্বি’বছর বয়সের যে শূয়োরটাকে পালাই সেইটা। শূয়োরটা এখনই এত মোটা, যে পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না।’

‘এবার তবে তৃতীয়টা। প্রথিবীতে সবচেয়ে নরম কী?’

‘এ তো জানা কথা, পালকের বিছানা। এর চেয়ে নরম কী আর কিছু ভাবতে পারো?’

‘এবার তবে শেষটা। প্রথিবীতে সবচেয়ে মধুর কী?’

‘আমার মাত ইভানুশ্কা।’

‘ভগবান তোমার মঙ্গল করুন সই, খুব বৃদ্ধি দিয়েছ, জীবনে ভুলব না।’

আর গরীব ভাইটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ীর দরজায় তার সাত বছরের মেয়েটি তার জন্যে দাঁড়িয়ে। সংসারে গরীব ভাইয়ের ঐ মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই।

‘কী হয়েছে বাবা, দৃঢ় করছ কেন, কাঁছ কেন?’

‘দৃঢ় না করে কী করি মা, না কেঁদে কী করি? রাজা আমায় চারটে ধাঁধা দিয়েছেন, সারাজীবনেও তার উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।’

‘কী ধাঁধা বলো না?’

‘তবে শেনো মা, প্রথিবীতে কোন জিনিস সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী; সবচেয়ে মোটা কী? সবচেয়ে নরম কী? সবচেয়ে মধুর কী?’

‘বাবা, তুমি রাজাকে গিয়ে বলো সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী হল বাতাস। সবচেয়ে মোটা হল মাটি: যার বাড় আছে, যার প্রাণ আছে সবকিছুই আহার পাই মাটি থেকে। সবচেয়ে নরম হল হাত: লোকে যার ওপরেই শয়ে থাক না কেন, সবসময় তার মাথার নীচে হাতটি রাখা চাই। আর ঘুমের চেয়ে মধুর কিছু প্রথিবীতে নেই।’

ধনী গরীব দ্রুত ভাই এল রাজার কাছে। রাজা দ্রুজনের উত্তরটাই শুনলেন। তারপর গরীব ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘উত্তরগুলো তুমি নিজেই বের করেছো? না কেউ বলেছে?’

গরীব ভাই উত্তর দিল:

‘ঝারাজ, আমার একটি সাত বছরের মেয়ে আছে। সেই আমাকে বলেছে।’

‘তোমার মেয়ের যদি এতই বুদ্ধি, তবে এই রেশমের সুতোটা নিয়ে গিয়ে তাকে দাও। কাল সকালের মধ্যেই আমায় যেন একটা নক্ষা তোয়ালে বুনে দেয়।’

গরীব লোকটি সেই ছোট রেশমের সুতোটা নিয়ে মনের দৃঢ়খে বাড়ী ফিরে গেল।

বলে, ‘বিপদ হয়েছে মা, রাজা হৃকুম করেছেন এই ছোট রেশমের স্তুতোটা
দিয়ে তোমার একটা তোষালে বুনে দিতে হবে।’

সাত-বছুরে বলে, ‘দৃঢ় করো না, বাবা।’

একটা ঝাঁটার কাঠি ভেঙ্গে নিয়ে বাবাকে দিয়ে বলে:

‘রাজাকে গিয়ে বলো যেন ছুতোরমিস্ত্রী ডেকে এই কাঠিটা দিয়ে একটা
তাঁত তৈরী করিয়ে দেন। সেই তাঁতে আমি রাজার তোষালে বুনব।’

গরীব ভাই রাজার কাছে গিয়ে সে কথা জানাল। রাজা তখন তাকে দেড়শটা
ডিম দিয়ে বললেন:

‘তোমার মেরেকে গিয়ে বলো, কাল সকালের মধ্যেই বাচ্চা ফুটিয়ে
দিতে হবে।’

আগের চেয়েও মন খারাপ করে বাড়ী ফিরে এল গরীব লোকটি।

‘হায় হায়, মা, এক বিপদ যায় তো আর এক বিপদ আসে।’

সাত-বছুরে বলল, ‘দৃঢ় করো না, বাবা।’

ডিমগূলো সে দিনের খাবার, রাতের খাবার জন্যে রেখে রাখল। আর
বাবাকে পাঠাল রাজার কাছে।

‘রাজাকে গিয়ে বলো মুরগীর ছানাগুলোর জন্যে একদিনের তৈরী গম
চাই: একদিনের মধ্যে মাঠ চষে, বীজ বুনে, ফসল কেটে, মাড়াই করে তৈরী
করা চাই। নয়ত ছানারা ঠেঁটিও ঠেকাবে না।’

রাজামশাই সব কথা শুনে বললেন:

‘তোমার মেয়ের যদি এতই বৃদ্ধি, তবে তাকে বলো, কাল সকালে এখানে
আসা চাই: আসবে কিন্তু পায়ে হেঁটেও না, ঘোড়ায় চড়েও না, খাল গায়েও নয়,
জামা পরেও নয়, কিছু দিতেও পারবে না, বিনা উপহারেও আসতে পারবে না।’

চাষীটি ভাবে, “ওরে বাবা! এ কাজ করার বৃদ্ধি আমার মেয়ের মেই। সব
গেল এবার!”

কিন্তু সাত-বছুরে বলল:

‘মন খারাপ করো না বাবা, শিকারীর কাছে যাও, একটা জ্যান্ত খরগোস
আর জ্যান্ত একটা কোয়েল এনে দাও।’

গরীব লোকটি খরগোস আর কোয়েল কিনে নিয়ে এল।

পরদিন জ্বার বেলা সাত-বছুরে জামাকাপড় ছেড়ে মাছ ধরার জাল পরল।
তারপর স্থুতে কোয়েলটা নিয়ে খরগোসের পিঠে চড়ে চলল রাজবাড়ীতে।

রাজবাড়ীর ফটকের কাছে রাজার সঙ্গে দেখা। সাত-বছুরে রাজাকে কুর্নিশ
বাবে বলল:

‘এই নাও রাজা উপহার!’ বলে পাঁখিটা বাড়িয়ে ধরল। রাজা হাত
বাড়াতেই—ফুড়-ৎ করে উড়ে পালাল পাঁখিটা।

‘খাসা! আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই করেছ। এবার বলো তো, বাপ
তোমার খুবই গরীব, কী করে তোমাদের দিন চলে।’

‘বাবা আমার জাল ফেলে না জলে, শুক্নো ডাঙায় মাছ ধরে, সেই মাছ
আমি কোঁচড়ে করে এনে ঘোল বানাই।’

‘দ্রু বোকা যেয়ে! শুক্নো ডাঙায় কি মাছ থাকে? মাছ থাকে জলে!
‘আর তুমই বা কেমন বৃক্ষিমান, গাড়ীর কখনো বাঢ়া হয়? বাঢ়া হয়
ঘোড়ার।’

রাজা আজ্ঞা দিলেন ঘোড়ার বাঢ়াটা গরীব ভাইকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক।



କୁଣ୍ଡଲେର ଜ୍ଞାନ

ଛଟିତେ ବାଡୀ ସାହେ ଏକ ବୃଦ୍ଧୋ ସୈନିକ । ହେଟେ ହେଟେ ପା ଟାଟାଛେ ; କିନ୍ତୁ ଦେଉ ପେଯେଛେ । ଏକ ଗ୍ରାମେ ପେଂଛେଇ ସେ ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଟୋର ଦରଜାୟ ଟୋକା ଦିଲ ।

‘ଦରଜା ଖୋଲୋ ଗୋ, ପଥେର ଲୋକ ଜିରିଯେ ନେବେ ।’

ଦରଜା ଥିଲାଲ ଏକ ବୃଦ୍ଧୀ । ବଳନ୍ତ :

‘ଏସୋ, ଏସୋ ସୈନିକ ।’

‘ଦ୍ୱାଚି ମୁଖେ ତୋଲାର ମତୋ କିଛି ଆଛେ ଗିନ୍ଧିମା ?’

ବୃଦ୍ଧୀର ସବଇ ଛିଲ କିନ୍ତୁ ସୈନିକକେ ଖାଓଯାତେ ଘନ ଉଠିଲ ନା, ଭାନ କରିଲ ଯେନ ଅନାଥା ଅଭାଗା ।

‘କୀ ଆର ବଲ ଭାଲୋ ମାନ୍ଦିଶେର ପୋ, ଆମ ନିଜେଇ ଆଜି ଏଥିନୋ କିଛି ମୁଖେ ତୁଳିନି । କିଛିଇ ନେଇ ସରେ ।’

ସୈନିକ ବଲେ, ‘ନେଇ ସଥନ, ନେଇ ! କୀ ଆର କରା ।’

হঠাতে তার চোখে পড়ল বেণিংর তলায় একটা হাতল ভাঙা কুড়ুল।
বলল, ‘আর কিছু যখন নেই তখন ঐ কুড়ুলটা দিয়েই জাউ বানান যাক।’
বৃদ্ধী হাঁ করে তাকি঱ে রইল। বলল:

‘কুড়ুল দিয়ে জাউ, সে আবার কেমন?’
‘দেখোই না! একটা পাত্র দাও তো।’

পাত্র নিয়ে এল বৃদ্ধী। সৈনিকটি কুড়ুলটা বেশ করে ধূয়ে পাত্রটায় রাখল।
তারপর জল দিয়ে উন্ননে চাপিয়ে দিল।

বৃদ্ধীর চোখ একেবারে ছানাবড়া।

একটা চামচে নিয়ে ঘটঘট করে নাড়তে লাগল সৈনিক। চেখে দেখল।

বলল, ‘এক্ষণ্ট হয়ে যাবে। ইস্ত একটু নুন যাদি থাকত।’

‘তা নুন বাপু, আমার আছে,’ বৃদ্ধী বলল, ‘এই নাও।’

নুন দিয়ে আবার চেখে বলল:

‘ইস্ত, এর মধ্যে এক মুঠো ক্ষুদ্র যাদি পড়ত, তাহলে আর দেখতে হত না।’
বৃদ্ধী ভাঁড়ার থেকে ছোট একটা থলে ভর্ত করে ক্ষুদ্র এনে দিল।

‘তা নাও, যেমনটি দরকার তেমনি করেই রাঁধো।’

সৈনিকটি রাঁধছে তো রাঁধছেই। খালি চামচে নাড়ছে আর থেকে থেকেই
চাখছে।

বৃদ্ধী আর সৌদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

‘আহ, দিব্য হয়েছে জাউ। শুধু এই সঙ্গে একটু ঘি যাদি পড়ত না, তাহলে
তোফা হত।’

বৃদ্ধী ঘি জোগাড় করে আনল।

তৈরি হল জাউ।

‘নাও খেতে শুরু করো, গিমৰ্মা।’

দুজনে মিলে খায়, প্রশংসা আর ধরে না।

‘দ্যাখো দিকি, ভাবতেই পারিনি যে কুড়ুল দিয়ে আবার এমন খাসা জাউ
রাঁধা যায়,’ অবাক হয় বৃদ্ধি।

সৈনিকটি থেরেই চলে আর মিটিমিটি হাসে।



যমরাজ আর সৈনিক

পর্চিশ বছর কাজ করলে সৈনিক, তারপর বেকার হয়ে পথে নামল।
‘যতদিন মেয়াদ ছিল কাজ করেছ, এবার যেখানে খুশী যাবে যাও।’
বেঁধে ছেঁদে রওনা দিলে সৈনিক, মনে মনে ভাবে: “পর্চিশ বছর রাজাৰ
কাজ কৱলুম, কিন্তু পৰিশৰ্টা শালগমও প্ৰস্কাৱ মিলল না। শুভেমো রুটিৰ
তিনটি টুকুৱো কেবল দিয়েছে পথে খাবাৰ জন্যে। এখন কী কৰি? মাথাই বা
গুঁজি কোথায়। যাই, দেশেৰ বাড়ীতেই যাই। বাবামাৰ সঙ্গে দেখা হবে। যদি
বেঁচে নাও থাকে তবু তো কবৱেৰ পাশে দৃঢ়’দণ্ড বলে জিৱোতে পারব।”

এই ভেবে সৈনিক পথে নামল। চলেছে, চলেছে, চলেছে। শুকনো রুটির দুটো টুকরো খেয়ে ফেলল। রাইল কেবল একটি বার্ক, অথচ এখনও বহুদূর রাস্তা।

অমন সময় এক ভিখারীর সঙ্গে দেখা। ভিখারী বলল:

‘বৃড়ো অথর্বকে কিছু দাও না সৈনিক!’

সৈনিকটি তার শেষ রুটির টুকরোটি বের করে বৃড়ো ভিখারীটিকে দিয়ে দিল। ভাবল, “আমি যা হোক্ করে চালিয়ে নেব, হাজার হোক সৈনিক, কিন্তু অথর্ব বৃড়ো ভিখারী, কীই বা ওর উপায়।”

পাইপটা আবার জবালিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পথে চলে সৈনিক।

যায়, যায়, দেখে পথের পাশেই একটা হৃদ। পারের কাছেই সব বুনো হাঁস সাঁতার কাটছে। সৈনিকটি পা টিপে এগিয়ে গেল। তারপর সংযোগ বুরে তিনটে হাঁস মারল।

“যাক কিছু খাওয়ার যোগাড় হল!”

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈনিকটি এসে পেঁচল সহরে। একটা সরাইখানা খুঁজে বের করে, সরাইওয়ালাকে তিনটে হাঁস দিয়ে বলল:

‘এই নাও তিনটে হাঁস। একটা আমায় ভেজে দাও। তুমও নিও একটা। আর এই তিন নম্বর হাঁসটার বদলে কিছু মদ দিও।’

সাজসরঞ্জাম সব নামিয়ে রেখে আরাম করে বসতে না বসতেই খাবার তৈরী।

ভাজা হাঁসটা আর এক বোতল মদ নিয়ে সৈনিকটি খেতে বসল। এক এক ঢোক মদ তারপর এক এক কাঘড় মাংস, ঘন্দ আর কী।

সৈনিক খেতে লাগল ধীরে সুস্থে। খেতে খেতে সরাইওয়ালাকে জিজেস করল:

‘আচ্ছা, বলতে পার, রাস্তা পেরিয়ে ঐ নতুন বিরাট বাড়ীটা কোথা?’

সরাইওয়ালা জবাব দিল:

‘সহরের সবচেয়ে ধনী সওদাগর ওটা নিজে থাকবাব জন্যে বানিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই আর ওখানে থাকা হয়ে উঠছে না।’

‘তার মানে?’

‘ওটা ভৃত্যে বাড়ী। শয়তানের আস্তা—রাষ্ট্রে লাফালাফি চেঁচামেচি করে নরক গুলজ্জন করে। সঙ্কের পর লোকে বাড়ীটার কাছে যেতেও ভয় পায়।’

সওদাগরটির ঠিক-ঠিকানা জেনে নিলে সৈনিকটি। বলল:

‘দেখা করে দৃঢ়’চারটে কথা বলতে চাই। হয়ত তার কিছু সাহায্যেও লাগতে পারিব।’

থাবার পর সৈনিক একটু ঘূর্ম দিয়ে নিল। তারপর অঙ্ককার হয়ে আসছে দেখে বেরিয়ে পড়ল সৈনিক। খুঁজে বার করল সওদাগরকে। সওদাগর বলল:

‘কী চাও সৈনিক, বলো।’

‘আমি এক যাত্রী। তোমার নতুন বাড়ীটায় রাতটা কাটাতে দাও, ওটা তো খালিই পড়ে আছে।’

‘বলছ কী! নির্বাণ মরণের পথ নেবার কী দরকার? বরং অন্য কোথাও থাকবার জায়গা দেখো। সহবে বাড়ী তো কম নয়। আমার নতুন বাড়ীটা যেদিন থেকে করেছি সেদিন থেকেই ওখানে শয়তানেরা ডেরা বেঁধেছে। কারো সাধ্য নেই যে ওদের নড়ায়।’

‘দেখা ধাক, শয়তানগুলোকে তাড়াতে পারি কিনা। কে জানে, ভৃতগুলো হয়তবা বুঢ়ো সৈনিকের ইন্দুর মানতেও পারে।’

‘তোমার মতো সাহসী লোকেরাও চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কোনো উপায় নেই। এক পর্যটক এসেছিল গত বছর, তোমার মতো সেও বাড়ীটা থেকে ভৃত তাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে পাওয়া গিয়েছিল কেবল কয়েকটা হাড়। ভৃতের হাতে মারা পড়েছিল লোকটা।’

‘রুশী সৈনিক আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। পর্চিশ বছর কাজ করেছি আমি, লড়াই করেছি, ঘূর্দা করেছি, তবু বেঁচে আছি। শয়তানগুলোর হাত থেকেও বাঁচব, হার মানব না।’

‘বেশ, যা ভালো বোবো। ভয় না পেলে যাও। যদি সত্যই শয়তানগুলোকে তাড়াতে পার, তবে প্রস্ত্রকার দিতে ভুলব না।’

সৈনিকটি বলল, ‘আমাকে কয়েকটা মোমবার্তি, কিছু ভাজা বাদাম, আর বড়ো সড়ো একটা শালগম্বুজ সেৱক করে দাও।’

‘এমো বাপ্ৰি তুমি দোকানে, যা দৰকাৰ সব দেখে শুনে নাও।’

সৈনিকটি দোকানে গেল। গোটা দশেক মোমবার্তি, দেড় সেৱ ভাজা বাদাম মিয়ে সওদাগৱেৰ রান্নাঘৰ থেকে সবচেয়ে বড়ো শালগম্বুজ তুলে নিয়ে নতুন বাড়ীৰ দিকে চলে গেল।

ঠিক মাঝ রাতে হঠাৎ প্ৰচণ্ড তাৰ্ডৰ সূৰ্ৰ হল। দড়াম্ দড়াম্ কৱতে লাগল দৰজা, ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল কাঠেৰ মেৰো, সূৰ্ৰ হল পাগলোৱ মত চেঁচাৰ্মেচি লাফালাফি। কানে একেবাৱে তালা লাগে। তোলপাড় লেগে গেল সারা বাড়ীটায়।

সৈনিকটা কিস্তু শাস্তিভাবে বসে বাদাম ভাঙে আৱ পাইপে টান দেয়।

হঠাৎ দৰজাটা খুলে গেল। একটা বাচ্চা শয়তান মাথা চুকিৱে সৈনিককে দেখেই চীৎকাৰ কৱে উঠল:

‘একটা মানুষ যে রে! চলে আয় সব! জ্যাস্ত খাওয়া যাবে।’

দূমদাম কৱে এসে জটিল সবকটা শয়তান। দৰজার কাছে ভিড় কৱে তাৱা উঁকি মেৰে সৈনিককে দেখে আৱ এ ওকে ঠেলা মেৰে চেঁচিয়ে বলে:

‘ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব।’

সৈনিক বলে, ‘বড়াই থামা। জীবনে অমন তেৱে দেখেছি। পিটিলৈ ঠাণ্ডা কৱতে হয়েছে কম নয়। ভালোয় ভালোয় সৱে পড়।’

এই শুনে একটা শয়তান ঠেলেঠুলে এৰ্গয়ে এসে বলল:

‘হয়ে যাক্ শক্তি পৱীক্ষা।’

সৈনিক বলল, ‘ঠিক আছে। হাতে কৱে পাথৰ নিঞ্জড়ে রস কে বাব কৱতে পাৰিস তোৱা?’

গোদা-শয়তান রাস্তা থেকে একটা পাথৰ আনবাৰ হৰুম দিল। একটা শয়তান তক্ষণ দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল। সৈনিকেৰ হাতে পাথৰটা দিয়ে বলল, ‘নাও, রস বাব কৱো দৈখি।’

‘আমি পৱে, আগে দৈখি তোদেৱ মধ্যে কেউ পাইল কিনা।’

গোদা-শয়তান্টা পাথরটা বাঁগয়ে ধরে এবন জোর চাপ দিল যে তক্ষণি ওটা
গুঁড়িয়ে এক ঝুঁটো বালি হয়ে গেল।

‘দেখেছিস তো !’ সৈনিক খোলার ভিতর থেকে বের করল শালগমটা।

‘দেখ, আমার পাথরটা তোর চেয়ে তের বড়,’ এই বলে সৈনিক শালগমটা
চিপে চিপে রস ঝরাতে লাগল।

‘দেখল তো !’

হাঁ হয়ে গেল শয়তানরা। মুখে আর কথা নেই। পরে জিজেস করল:

‘কী তুমি খাচ্ছো অনবরত ?’

‘বাদাম ! কিন্তু আমার বাদাম ভাঙবার সাধ্য তোদের নেই !’

সৈনিক গোদা-শয়তানের হাতে দিল একটা বুলেট।

‘খেয়ে দেখ একবার সৈনিকের বাদাম !’

শয়তানটা ওটা কপ্ট করে মুখে পুরে দিল। চিবোতে চিবোতে বুলেটটা
চ্যাপ্টা হয়ে গেল, কিন্তু ভাঙতে আর পারে না। এবিকে সৈনিক কিন্তু একটা করে
বাদাম মুখে দেয় আর খায়, মুখে দেয় আর খায়।

ঠাণ্ডা হয়ে এল শয়তানেরা, শাস্ত হয়ে এল, এপায়ে ভর দিয়ে ওপায়ে ভর
দিয়ে উপর দিয়ে দেখতে লাগল সৈনিককে।

সৈনিক বলল, ‘শুনেছি তোরা নাকি অনেক রকম ভাল ভাল কায়দা দেখাতে
পারিস। ছোট থেকে বড়, আবার বড় থেকে ছোট হয়ে যেতে পারিস, সর, ফাটল
দিয়ে দিবিয় গলে যেতে পারিস।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, একাজটা আমরা সবাই পারি !’ চেঁচিয়ে উঠল শয়তানগুলো।

‘আচ্ছা, দোখ তো তোরা যতকটা আছিস সবাই কেমন গুঁড়ি মেরে আমার
খোলার মধ্যে চুকে যেতে পারিস !’

শয়তানগুলো অর্মানি এ ওকে গুঁতো দিয়ে, ধাক্কা মেরে ছুটল খোলার
দিকে। একমিনিটের মধ্যেই বাড়ী খালি। সবকটা খোলার মধ্যে

সৈনিক অর্মানি খোলার মুখ বন্ধ করে, আড়াআড়ি ঝুঁটি দিয়ে শক্ত করে
বকলস আটকে দিল।

‘এবার একটু ঘূর্মিয়ে নেওয়া যাক !’ বলে শুয়ে পড়ল ফৌজী কাল্যান্দায় —
কোট দিয়েই বিছানা, কোট দিয়েই কম্বল।

পরামর্শ সকালে সওদাগর তার চাকরকে পাঠিয়ে দিল।

‘মা দেখে আয়, সৈনিক বেঁচে আছে কি না ? যদি মরে গিয়ে থাকে তবে
অস্তত হাড়গুলো নিয়ে আসিস !’

চাকররা যখন এসে পৌঁছল, ততক্ষণে সৈনিক জেগে উঠে ঘরের মধ্যে
পায়চারী করছে আর পাইপ টানছে।

‘নমস্কার, সৈনিক ! ভাবিইনি তোমায় জলজ্যাঞ্জ দেখব, বাক্স নিয়ে
এসেছিলাম, তোমার হাড় নিয়ে যাব বলে !’

সৈনিকটি হাসল।

‘আমায় কবর দিতে এখনো দেরি আছে। তার চেয়ে বরং একটু হাত লাগাও
তো কামারের কাছে এই ঝোলাটা নিয়ে যাব, কামারবাড়ী কত দূরে ?’

ওয়া বলল, ‘না, দূর নয় !’

তারপর ওয়া সবাই মিলে ঝোলাটা নিয়ে চলল কামারবাড়ী। সেখানে গিয়ে
সৈনিক কামারকে বলল :

‘তা কামার-ভাই, নেহাই’-এ চাপিয়ে এই ঝোলাটাকে আচ্ছা করে পেটাও
তো !’

কামার আর তার সাগরেদ দৃজনে মিলে কামারে হাতুড়ি নিয়ে লেগে গেল
পিটতে।

শয়তানগুলোর যা অবস্থা সে আর কী বলব। সমস্বরে চেঁচাতে লাগল:
‘দয়া করো সৈনিক, ছেড়ে দাও !’

কিন্তু কামাররা আর থামে না, সৈনিকও কেবল তাতায় :

‘জোরে, আরো জোরে ! লোকের উপর উপদ্রব করার মজা বনুক এবার !’

শয়তানগুলো চেঁচায়, ‘আর করব না, জীবন থাকতে ঐ বাড়ীর ছায়া মাড়াব
না। অন্যদেরও বলে দেব এ সহরে যেন না আসে। অন্যেক পুরুষকার দেব
তোমাকে! কেবল প্রাণে মেরো না !’

‘এতক্ষণে কথা বৈরয়েছে। রূশী সৈনিকের সঙ্গে লাগতে হলে বুবো শুনে এগোবি !’

কামারদের থামতে বলল সৈনিক। তারপর বোলার মুখটা আলগা করে শয়তানগুলোকে একটার পর একটা ছেড়ে দিল, শুধু গোদা-শয়তানকে ছাড়ল না।

‘যতক্ষণ না পুরুষকার আনন্দস ততক্ষণ ওকে ছাড়ছি না।’

পাইপটা তখনও শেষ হয়নি, সৈনিক দেখে কি, একটা বাচ্চা শয়তান হনহন্ক করে ফিরে আসছে, হাতে একটা পুরনো থলি।

‘এই নাও তোমার পুরুষকার !’

সৈনিক হাতে নিয়ে দেখল নেহাত হলকা। খুলে দেখে ফাঁকা। সৈনিক শয়তানটাকে ধমকে উঠল:

‘আমায় বৃক্ষ বানাবার চেষ্টা ? দাঁড়া, তোদের গোদাটাকে দুটো হাতুড়ি দিয়ে আচ্ছা করে শিক্ষা দেব !’

এই না শুনে গোদাটা বোলার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল:

‘মেরো না সৈনিক, পিটিও না, শোনো বলি, থলিটা সাধারণ নয়। ওটা যাদু-থলি। প্রথিবীতে একটাই আছে। মনে মনে কিছু ইচ্ছে করে থলি খুলে দেখবে, যা ইচ্ছে করেছিলে এসে গেছে। পাখী চাও, যা খুশী চাও, থলিটা দূর্লভয়ে কেবল তিনটি কথা বলবে: “থলির ভিতর আয় !” — বাস, অঘনি যা চাইবে থলিতে এসে হাঁজির হবে।’

‘বটে, বটে, তাহলে একবার পরীক্ষা করা যাক, সত্যি বলছিস কিনা !’ আবু মনে মনে ভাবল: “তিনটে মদের বোতল চাই।” মনে করতে না করতেই সৈনিক দেখল থলিটা দ্রুতে ভারি হয়ে উঠেছে। খুলে দেখে, সত্যই তিন তিনটে মদের বোতল ! সৈনিক বোতল তিনটে কামারদের দিয়ে দিল।

‘থাও, ভাই তোমরা !’

তারপর সৈনিক বাইরে গিয়ে দেখে, এক বাড়ীর ছান্নে একটা চড়াই বসে আছে। সৈনিক থলি দূর্লভয়ে বলল:

‘থলির ভিত্তি আয় !’

কথা শেষ হতে না হতেই চূড়াইটা সোজা এসে দুকল থলিতে।

সৈনিক কামারের বাড়ীতে ফিরে এসে বলল:

‘প্রাপ্তকই বলেছিস। আমাকে ঠকাসনি। বৃক্ষে সৈনিকের খবর কাজে লাগবে থলিটা !’

এই বলে বোলা খুলে গোদা-শয়তানকে বের করে দিল।

‘পালা এবার, কিন্তু মনে রাখিস, ফের চোখে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।’

গোদা-শয়তান, বাচ্চা শয়তান সব এক নিমেষে পালিয়ে গেল। সৈনিক যোলা আর থলি নিয়ে কামারদের বিদায় জানিয়ে সওদাগরের বাড়ী চলে গেল।
বলল:

‘এবার যাও, তোমার নতুন বাড়ীতে বাস করো। আর কেউ তোমায় বিরত করবে না।’

সওদাগর সৈনিকের দিকে তাকায়, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

‘সত্যাই দেখছি রূশ সৈনিক আগন্মে পোড়ে না, জলে ঢোবে না। বলো তো শুনি কী করে তুমি শয়তানগুলোর হাত এড়িয়ে ফিরে এলে ? জলজ্যান্ত বেঁচে রইলে ?’

যা যা ঘটেছিল সৈনিক সব বলল। চাকররা সায় দিল। সওদাগর ভাবল: “দু’চারদিন বরণ দেখি। যাচাই করে নিই সত্যাই বাড়ীটা শাস্তি কিনা, শয়তানগুলো ফেরে কিনা !”

সকালে সেদিন সৈনিকটির সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তাদেরকে সওদাগর বলল সৈনিকটির সঙ্গে যেতে।

‘রাত কাটিয়ে দেখ, যদি কিছু হয় সৈনিক আছে, বাঁচবে !’

সারা রাত নির্বিবাদেই কাটল। পরদিন সকালে নিরাপদে, খুশী মনে সব ফিরে এল।

তৃতীয় রাত্রে সওদাগর নিজেই ভরসা করে গেল রাত কাটাতে। সেদিনও রাত্তটা বেশ ভালভাবেই কাটল। সবাই শাস্তিতে ঘূরল। সওদাগর হুকুম দিলে ধর দোর পরিষ্কার করতে। শূরু হল গহপ্রবেশের তোড়জোড়। ভাজা হল,

ରାଧା ହଲ, ଦେଖିଲ ହଲ ସବକିଛୁ । ଅର୍ତ୍ତିଥିବା ଏବଂ, ଥାବାରେ ଭାବେ ଟେବଳ ପ୍ରାସାର ଭେଟେ ପଡ଼େ । ଏକେବାରେ ଦୀଯତାଂ ଭୁଜ୍ୟତାଂ !

ସନ୍ଦଗ୍ଧର ସୈନିକଙ୍କେ ସବଚେଯେ ଭାଲୋ ଆସନ୍ତିଟିତେ ସମାନ କରେ ବସିଯେ ଥିବା କରେ ଜୀବନ୍ୟାନ କରତେ ଲାଗଲ ।

‘ଥାଓ ସୈନିକ, ଥାଓ, ତୋମାର ଉପକାର ଆମି ଜୀବନେ ଭୁଲବ ନା !’

ଥାଓୟା-ଦାୟା ଚଲି ଏକେବାରେ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସ୍ଵର୍ଗ ଥିକେ ଉଠେ ସୈନିକ ବଲଲ ଏବାର ଦେ ବାଢ଼ୀ ଯାବେ । ସନ୍ଦଗ୍ଧର ତାକେ ଥାକବାର ଜନ୍ୟ ପେଡ଼ାପୀର୍ଣ୍ଣି କରତେ ଲାଗଲ ।

‘ଏତ ତାଡା କିମେର ? ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଆର ଏକଟା ସମ୍ପାଦ ଅନ୍ତ ଥିକେ ଯାଓ ।’

‘ନା ଭାଇ, ଏମାନିତେଇ ଦେରୀ ହରେ ଗେଛେ । ଏବାର ବାଢ଼ୀ ଯେତେଇ ହବେ ।’

ସନ୍ଦଗ୍ଧର ସୈନିକଙ୍କେ ବୋଲାଟା ରୂପୋ ଦିଯେ ବୋବାଇ କରେ ଦିଯେ ବଲଲ, ‘ଏଇ ନାଓ ତୋମାର ଯୌତୁକ ।’

କିନ୍ତୁ ସୈନିକ ବଲଲ :

‘ତୋମାର ରୂପୋ ଆମି ଚାଇ ନା । ଆମି ଏକଳା ମାନ୍ୟ, ଗତର ଆଛେ । ନିଜେଇ ନିଜେରଟା ଚାଲାବ ।’

ସନ୍ଦଗ୍ଧର କାହିଁ ଥିକେ ବିଦାୟ ନିଯେ ଶଳ୍ଯ ବୋଲା ଆର ଯାଦ୍ୱ-ସିଲଟା କାଂଧେ ଝୁଲିଯେ ରଣନ୍ତି ହଲ ସୈନିକ ।

ଗେଲ ସେ ଅନେକ ଦିନ ନାର୍କି ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଅନେକ ପଥ ନାର୍କି ଅଳ୍ପ ପଥ, କେ ଜାନେ । ଶେଷକାଳେ ନିଜେର ଦେଶେ ଏସେ ପୌଛିଲ ସେ । ପାହାଡ଼ର ପାଶ ଥିକେ ଗ୍ରାମଟା ଚୋଖେ ପଡ଼ିତେଇ ଥିଲା ଆର ତାର ଧରେ ନା । ଦୂରପାଶେ ତାକାତେ ତାକାତେ ଦୂର ପା ଚାଲାଲ ସୈନିକ ।

“କୀ ସଂଦର ! କୀ ଶୋଭା ! କତ ଦେଶ ସ୍ଥରେଇ, କତ ସହର, ଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ, କିନ୍ତୁ ସାରା ପ୍ରଥିବୀତେ ନିଜେର ଦେଶଟିର ଭତୋ ଏମନଟି ଆର ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ ନା ।”

ସୈନିକ ନିଜେର କୁଠେଘରେର କାହେ ଏସେ ଦାଓୟାଯ ଉଠେ ଦରଜାଯ ଟୋକା ଦିଲ । ଦରଜା ଥିଲେ ଦିଲ ଏକ ଥିଥିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ । ସୈନିକଟି ବୁଢ଼ୀକେ ଜର୍ଜିଯେ ଧରେ ଆଦର କରତେ ଲାଗଲ ।

ଛେଲେକେ ଚିନତେ ପେରେ ବୁଢ଼ୀ ଆନନ୍ଦେ ସତ ହାସେ ଭୁବ କାଂଦେ ।

‘ব্যক্তি তোর কথা খুব বলত রে, কিন্তু কপাল আমার, আজকের দিনটা
সে আর ধৈয়ে ঘেতে পারল না। পাঁচবছর হল তাকে গোর দিয়েছি।’ তারপর
হংশ হল বুড়ীর, কাজকম্ভে লেগে গেল। সৈনিক তাকে সান্ত্বনা দেয়:

‘খোস্ত হয়ে না, মা। এখন থেকে আর্মই তোমার সুখ সুবিধে দেখব।’

এই বলে সৈনিক যাদু-র্থলি বের করে নানা রকম খাবার-দ্বাবার চাইল।
তারপর র্থলি থেকে সব বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে মা’কে বলল:

‘নাও, যত পারো খাও।’

পরদিন সৈনিক আবার যাদু-র্থলির কাছে গিয়ে রূপো চাইল। তারপর
কাজে হাত দিল। নতুন বাড়ী তুলল সে, গরু কিনল ঘোড়া কিনল, সংসারে যা
দরকার সব জোগাড় করলে। তারপর একটি কলে দেখল, বিয়ে করে ঘর সংসার
করতে লাগল। বুড়ীমা তো নাতিনাতনীদের দেখাশোনা করতে পেয়ে ভারি
খুস্তী।

এই ভাবে ছ’সাত বছর কেটে গেছে। অসুখ হল সৈনিকের। তিনদিন
বিছানায় পড়ে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। অবস্থা খারাপ হতে লাগল। তৃতীয়
দিনে সৈনিক দেখল যমরাজ তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খাঁড়ায় শান দিচ্ছে
আর ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছে।

যমরাজ বলল, ‘তৈরি হও সৈনিক, তোমার জনোই এসেছি। প্রাণ নেব
তোমার।’

সৈনিক বলল, ‘এত তাড়া কিসের? আরও তিরিশ বছর বাঁচতে দাও।
ছেলেপুলেদের মানুষ করি, বিয়ে দিই, নাতিনাতনীর মুখ দোখ, তারপর মু
হয় এসো। এক্ষণ্ট যে আমার মরা চলবে না।’

‘নাহে, সৈনিক, তিনটি ঘণ্টাও আর পরমারু নেই তোমার।’

‘বেশ, যদি তিরিশ বছর না হয়, অন্তত তিন বছর সময় দাও। কাজ তো
আমার কম নয়, সব গুচ্ছিয়ে ঘেতে হবে।’

যমরাজ বলল, ‘তিন মিনিটও নয়।’

সৈনিক আর অনুরোধ করল না, কিন্তু মরবার তাৰ একটুও ইচ্ছে ছিল না।
অতি কষ্টে বালিশের তল থেকে যাদু-র্থলিটা বের করে দুলিয়ে সে বলল:

‘থালির ভিত্তি আয় !’

বলতে নাইলতেই সৈনিক একটু স্ন্যস্ত বোধ করতে লাগল। যম যেখানে দাঁড়িয়েছিল তাকিয়ে দেখে সেখানে কেউ নেই। থালির মধ্যে তাকিয়ে দেখে কি, স্বরং প্রমাণিত বসে।

থালিটা এঁটে বাঁধতেই সৈনিক বেশ স্ন্যস্ত হয়ে গেল, ক্ষিদেও ফিরে এল।

বিছানা থেকে নেমে এক টুকরো রুটি কেটে নুন দিয়ে খেয়ে ফেলল সৈনিক। তারপর এক জাগ ক্রসাস খেতেই একেবারে সেরে গেল।

‘ভালো কথার মানুষ নও, নাককাটা কোথাকার, রুশ সৈনিকের সঙ্গে লাগতে আসার মজাটা এবার টের পাবে।’

‘কী করতে চাও আঘাত নিয়ে?’ থালির ভিত্তির থেকে আওয়াজ এল।

সৈনিক উত্তর দিল:

‘থালিটার জন্যে মায়া হচ্ছে, কিন্তু কী আর করা যায়! বিসর্জনই দিতে হবে। তোমাকে পানা পুরুরে ডুবিয়ে দেব। সারা জীবনেও থালির বাইরে আসতে পারবে না।’

‘ছেড়ে দাও, সৈনিক, আরও তিনবছর পরমায়ণ দেব।’

‘উহঁ, আর ছাড়িছি না।’

‘দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও, তোমার কথাই রইল, আরো তিরিশ বছরই না হয় বাঁচতে দেব।’

‘বেশ, ছেড়ে দেব শুধু একটি সতে—এই তিরিশ বছরের মধ্যে তুমি কারও প্রাণ নিতে পারবে না।’

যম বলল, ‘সে হয় না। কারও প্রাণ নেব না তো খাব কী?’

‘এই তিরিশ বছর গাছের ফলমূল, ছাল, পাথর খেয়ে কাটবে।’

যম কোনো উত্তর দিল না। কাজেই সৈনিক জামা জুতো পরে ঝেরী হয়ে বলল:

‘রাজী যখন হলে না তখন চলো তোমাকে পানা পুরুরে দিয়ে আসি।’

বলে থালিটা তুলে নিল কাঁধে।

যম তখন বলে উঠল :

‘বেশ তাই হোক, তিরিশ বছরের মধ্যে আমি কারও প্রাণ নেব না। কেবল ফলমূল, ছাল, পাথর খেয়ে মাঠে মাঠে কাটাব। এখন আমায় ছেড়ে দাও।’

‘স্মাধান, ঠকাবার চেষ্টা করো না যেন।’

সৈনিক যমকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে থলিটা খুলে ছেড়ে দিল। বলল :
‘যাও, আমার মত বদলাবার আগেই পালাও।’

যম খাঁড়াটা তুলে নিয়েই বনের মধ্যে দৌড়। মাঠে মাঠে ফলমূল, ছাল, পাথর খুঁজে বেড়াতে লাগল সেখানে। খুঁজে আর কামড়ায়। তাছাড়া আর উপায় কী ?

আর লোকদের তখন আর আনন্দ ধরে না। কারও অস্থ নেই, কেউ মারা যায় না !

এই ভাবে তিরিশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে সৈনিকের ছেলেপুলেরা বড় হয়ে উঠল, ছেলেদের বৌ জুটল, মেয়েদের স্বামী। বড়ো হয়ে উঠল সংসার। কারও দরকার সাহায্য, কারও প্রয়োজন উপদেশ, কাউকে বা বুঝি দিতে হয়, সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ দিতে হয়।

সৈনিকের তাই ভাবি কাজ। ভীষণ খুসী। সব দিকেই সৈনিকের ভাগ্য খুলে গেল। গড়গড়িয়ে চলল জীবন। কাজ নিয়েই মেতে আছে সে, মরণের কথা ভাবার সময় কোথায় ?

একদিন কিন্তু সত্যাই এসে হাজির হল যম।

‘আজ তিরিশ বছর পৃণ’ হল। দিন ফুরিয়েছে, সৈনিক। তৈরি হও, আমি তোমাকে নিতেই এসেছি।’

সৈনিক আর তর্ক করল না।

‘আমি সৈনিক, এক ডাকেই খাড়া। দিন যদি ফুরিয়ে থাকে তো বেশ কর্ফন নিয়ে এসো।’

যমরাজ এনে হাজির করল একটা ওক কাঠের কর্ফন। তাতে লোহার হুড়কো লাগান।

ডালা খুলে বলল, ‘চুকে পড়ো, সৈনিক।’

সৈনিক একেবারে রেগে আগুন। চেঁচিয়ে উঠল:

‘সে কী! নিয়মকানুন কিছু জানো না দেখছি! প্রতিনো সৈনিক হট্
করেই নিজে থেকে কিছু করে বসবে, এ নিয়ম কোথায় পেলে? সৈন্যদলে নতুন
কিছু শেখাতে হলে হাবিলদার আগে নিজে করে দেখায়, তারপরে হস্ফুম করে।
তেজোরও ঠিক তেজীন করা উচিত। আগে দোখিয়ে দাও কী করতে হবে, তারপর
কুম করো!’

কফিনে শূল ঘঢ়াজ।

‘এই দেখো সৈনিক, এই ভাবে শোবে, পা টান করে মেলে দেবে, হাতদুটো
মড়ে রাখবে বুকের ওপর।’

সৈনিকও ঠিক এইটেই চাইছিল। দড়াম করে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে
হড়কো এঁটে দিল।

বলল, ‘নিজেই শূরে থাক ওখানেই, আগু এখানে দিব্যি আরামে আছি।’

গাড়ীর ওপর চাপিয়ে নদীর খাড়া পাড়ে নিয়ে গিয়ে কফিনটা সে ফেলে
দিল নদীতে।

নদী কফিনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমৃদ্ধে। তারপর বছরের পর বছর
ধরে সমৃদ্ধে ভেসে বেড়াতে লাগল ঘঢ়াজ।

আবার স্বৰ্ণবচ্ছিন্দে ভরে উঠল মানুষ। সৈনিকের জয়গান করতে লাগল
তারা। সৈনিকও আর বুঢ়ো হয় না। নাতিনাতনীদের বিয়ে দিল সৈনিক,
তারপর নাতিনাতনীর ছেলেমেয়েদেরও শেখাতে পড়াতে লাগল। বাড়ীয়র, ক্ষেত
খামার নিয়ে বুঢ়ো সারাদিন ভারি ব্যস্ত, কিছুতেই যেন বুঢ়োর ঝাঁসি নেই।

একদিন হয়েছে কি, সমৃদ্ধে ভীষণ বড় উঠল। চেউয়ের ধাক্কায় পাহাড়ে
গায়ে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কফিনটা। মরোঘরো হয়ে কোনরকমে তারে
এসে পেঁচল যম। বাতাসের কাপটে টলে টলে পড়ে।

তারপর সমৃদ্ধতারে শূরে, একটু জিরিয়ে কোনোদ্বয়ে গিয়ে পেঁচল
সৈনিকের গ্রামে। গিয়ে খামারে লুকিয়ে রইল। ওৎ পেতে বেল্লি কখন সৈনিক
বেরয়।

এদিকে মাঝে বীজ বুনতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সৈনিক। বীজ নেবার জন্যে একটা খালি বস্তা নিয়ে গোলাঘরে গিয়ে পোঁছতেই যম বেরিয়ে এল।

‘বীজ আর আমার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছ না!’ হেসে উঠল যম।

সৈনিক দেখল সততই বিপদ! ভাবল:

“যা হবার তা হবেই। নাককাটাটার হাত থেকে যদি নেহাত ছাড়া নাই পাই,
তবু কিছুটা ভয় দেখাতে পারব তো!”

এক বাটকায় খালি বস্তাটা কোটের তল থেকে বের করে নিয়ে সে চেঁচিয়ে
উঠল:

‘ফের চুকতে সাধ হয়েছে থলিটায়, তাই না! আবার পানা পদ্ধুরে চুবুনি
খাবার ইচ্ছে হয়েছে, নার্কি?’

সৈনিকের হাতের ফাঁকা বস্তাটাকে যাদু-থর্লি মনে করে যম তখন ভীষণ
ভয় পেয়ে দে ছুট, দে ছুট। সৈনিকের চোখে পড়তে সে আর রাজী নয়। সেই
থেকেই লোকের প্রাণ নিতে যম আসে খুব চুপিসারে। ভাবে, “সৈনিকের চোখে
যেন না পাড়ি। দেখতে পেলেই পানা পদ্ধুরে চুবুনি না খাইয়ে ছাড়বে না।”

সৈনিক বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল, লোকে বলে, এখনও সে
বেঁচে, মৃখে তার হাসি লেগেই আছে।



গঞ্জী-বৌ

এক ছিল চাষী আর তার বৌ। বৌটা ভারি গম্পী ছিল, কেনো কথা পেটে থাকত না। কানে তার কেনো কথা পের্য়েছলেই অম্বনি সেটা সারা গ্রামে রাণ্ট্র হয়ে যেত।

একদিন চাষী তো বনে গেল। বনের মধ্যে নেকড়ে ধরার গর্ত খুড়তে গিয়ে হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে গেল। চাষী ভাবল, “এখন কী কর? আমার বৈঁ তো গুপ্তধনের কথা শুনলেই সারা পাড়ায় রঁটিয়ে দেবে। জমিদারের কানে কথাটা যাবে — বাস — টাকাও আর পেতে হবে না। জমিদারই সবটা গান্ধের করবে।”

ভাবতে ভাবতে একটা বৃক্ষ মাথায় এল। গুপ্তধনটা অন্দরীয় পাংতে রেখে জায়গাটা চিহ্ন দিয়ে ফিরে গেল। নদীর কাছে আসতে ভুলের দিকে তাকিয়ে দেখে, জালের মধ্যে মাছ ছটফট করছে। মাছটা বের করে নিয়ে চাষী আবার

চলল। একটু পরেই তারই পাতা একটা ফাঁদের কাছে এসে দেখে একটা খরগোস তাতে আঁকড়ে পড়েছে।

চাষী খরগোসটা বের করে নিয়ে ঘাছটা সেই জায়গায় রাখল। তারপর খরগোসটা জড়লে জালের মধ্যে।

বাড়ী ফিরল দেশ রাত হয়ে যাবার পর।

‘উন্নন জেবলে বেশ কিছু সরু চার্কলি বানাও তো, তাতিয়ানা!’

‘সে কী? সন্ধ্যার পর কেউ কখনো উন্নন ধরায় নাকি? এত রাতে কেই বা আবার সরু চার্কলি তৈরী করে! খেয়াল দেখো!’

‘যা বলছি করো! তক’ করো না। গৃহস্থন পেঁয়েছি আমি, আজ রাতেই বাড়ী নিয়ে আসব।’

চাষীর বৌয়ের তো আর খুশি ধরে না। এক নিমেষে উন্নন ধারয়ে সরু চার্কলি বানাতে বসে গেল সে।

বলল, ‘গরম, গরম খাও গো।’

চাষী একটা করে সরু চার্কলি খায় আর বৌয়ের অজান্তে গোটা দু’চার করে থলিতে পোরে, একটা করে খায়, আর গোটা দুই করে রাখে।

চাষীর বৌ বলল, ‘আজ যে দোথি তুমি গোগ্যাসে গিলছো, আমি যে ভেজে উঠতেই পারছি না।’

‘বহুদুর যেতে হবে গো, গৃহস্থনটাও খুব ভারি, তাই পেট পূরে খেয়ে নিছি।’

সরু চার্কলি দিয়ে থলিটা ভরে নিয়ে চাষী বলল:

‘আমার পেট ভরেছে, এবার তুমি কিছু খেয়ে নাও আর চলো বেরিয়ে পড়ি, তাড়াতাড়ি করো।’

খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল বৌ, তারপর দৃঢ়নে বেরিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে বেশ রাত হয়ে গেছে। চাষী আগে আগে যায় আর থলি থেকে একটা একটা করে সরু চার্কলি বার করে গাছের ডালে বাঁজিয়ে দেয়।

সরু চার্কলিগুলো চোখে পড়ল চাষী বৌয়ের।

‘দেখো দেখো, সরু চার্কলি হয়ে রয়েছে গাছে।’

‘এ আর এমনটি কি? এই মাছ দেখলে না সর, চাকলি বৃংজিট হচ্ছিল।’

‘না, কই দেখিন তো! আমি মাটিতে চোখ রেখে হাঁটছিলাম, যাতে গাছের শিকড়ে পুরবেখে হুমকি খেয়ে না পাড়ি।’

চাষী বলল, ‘এইখানে একটা খরগোস ধরা ফাঁদ পেতেছিলাম। একবার দেখে আসি চলো তো।’

ফাঁদের কাছে গিয়ে চাষী একটা মাছ বের করে আনল।

‘আরে! মাছ এসে কী করে এই ফাঁদে চুকল?’ চাষীর বৌ জিজেস করল।

‘তাও জানো না? জলের মাছের মতো ডাঙার মাছও যে আছে!’

‘জানতাম না তো! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না।’

তারপর ওরা এল নদীর ধারে। চাষীর বৌ বলল:

‘এখানেই নিশ্চয়ই কোথাও তোমার জাল পাতা আছে। চলো একবার দেখে আস।’

ওরা যেই জালটা টেনে তুলেছে, দেখে একটা খরগোস।

‘মা গো! কী কাণ্ড!’ চাষীর বৌ গালে হাত দিল। ‘কী সব হচ্ছে আজ। খরগোস কিনা আটকা পড়ল মাছ-ধরা জালে।’

চাষী বলল, ‘এতে অবাক হবার কী আছে? জীবনে যেন জল-খরগোস দেখোনি।’

‘সত্য দেখিন তো।’ ইতিমধ্যে যেখানে গুপ্তধন পৌঁতা রঞ্জেছে সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছল ওরা। চাষী ঝুঁড়ে ঝুঁড়ে টাকার পাশ বের করে আনল, তারপর ঘতটা করে পারে টাকাটা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলল বাড়ী।

রাস্তাটা আবার জমিদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে। বাড়ীটার কাছে যেতেই ওরা শোনে: ‘ব্যা... ব্যা... এ্যা...’ করে একটা ভেড়া ডাকছে।

চাষীর বৌ ফিসফিস করে বলল, ‘ও বাবা, ওটা কী গো! ভীষণ করছে আমার।’

‘দোড়ে চলো শৈগ়গির! জমিদার বাবুকে গলা টিকে মারছে ভূতে। আমাদের যেন ওরা দেখতে না পায়।’

দুজনেই ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে এক দোড়ে বাড়ী।

টাকা লড়কিয়ে রেখে দুজনে ঘূমতে গেল।

চাষী বলল, ‘দেখো, তাতিয়ানা, গৃস্থনের কথা আবার কাউকে বলে
বেড়িয়ে না যেন। তাহলে বিপদে পড়তে হবে।’

‘কো যে বলো, ঘূমকরেও কাউকে বলব না।’

পরদিন ওরা ঘূম থেকে উঠল দেরী করে।

চাষীর বৌ উন্মনে আগুন দিয়ে, বালতি নিয়ে গেল জল আনতে।

কুয়োর কাছে পাড়াপড়শীরা জিজেস করল, ‘ও তাতিয়ানা, আজ এত
দেরীতে উন্মনে অঁচ পড়ল ষে?’

‘আর বোলো না, কাল সারারাত বাইরে ছিলাম কিনা, ঘূম ভেঙেছে দেরী
করে।’

‘কেন, রাতে গিয়েছিলে কোথায়?’

‘আমার স্বামী গৃস্থন খাঁজে পেয়েছে ষে, রাতে গিয়েছিলাম টাকা আনতে।’

ব্যস, সারাদিন প্রায়ে শুধু এই এক আলোচনা: “তাতিয়ানা আর তার স্বামী
গৃস্থন পেয়েছে। দু’বন্ধা ভাতি” করে টাকা এনেছে।”

সক্যাবেলাতেই কথাটা কানে উঠল জমিদারের। জমিদার ডেকে পাঠাল
চাষীকে।

‘গৃস্থন পেয়েছো, আমায় জানাওনি কেন?’

চাষী বলল, ‘গৃস্থন? জীবনে কোনোদিন কথাটা কানেও শুনিনি, বাবু।’

জমিদার চীৎকার করে উঠল, ‘বাজে কথা রাখো! আমি সব জানি, তোমার
বৌই তো সবাইকে বলে বেড়িয়েছে।’

‘ওর মাথার ঠিক নেই, বাবু। এমন সব কথা বলে যার মাথামুক্ত নেই।’

‘বেশ, পরীক্ষা করে দেখছি, দাঁড়াও।’

জমিদার চাষীর বৌকে ডেকে পাঠাল।

‘তোমার স্বামী কি গৃস্থন পেয়েছে?’

‘আজে হ্যাঁ বাবু, পেয়েছে।’

‘তোমরা দু’জনে টাকা আনতে বেরিয়েছিলে রাতিরবেলা।’

‘আজে হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম।’

‘সব কথা বলে তো দোখি, কী হয়েছিল।’

‘প্রথমে তো আমরা বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, দোখি কী, পাছে গাছে সরু চাকলি ফেলে রয়েছে।’

‘সরু চাকলি?’

আজ্জে হ্যাঁ, সরু চাকলি বৃষ্টি হচ্ছিল কিনা। তারপর খরগোস ধরা ফাঁদে দোখি একটা মাছ আটকে রয়েছে। মাছটা আমরা বের করে নিয়ে আবার চলতে লাগলাম। নদীর ধারে এসে জালটা টেনে তুলে দেখি, জালে পড়েছে একটা খরগোস! খরগোসটাও নিয়ে নিলাম। তারপর নদী থেকে ধানিকটা দূরে জামি খুঁড়ে আমার স্বামী গুপ্তধন বের করল। আর আমরা দু'র্থালি ভর্তি টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম। আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে আমরা যখন পেরিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তখনই তো হৃজুরের গলা টিপে ধরেছিল ভূতে।’

এই না শুনে জমিদার তো ভীষণ রেগে, মাটিতে পা টুকে চীৎকার করে বলল:

‘বেরিয়ে যাও এখন থেকে, হাঁদা মেয়ে কোথাকার!’

চাষী বলল, ‘দেখলেন তো, আমার বৌঝের কোনো কথাই বিশ্বাস করা চলে না। এইভাবেই জীবন কাটাচ্ছি ওকে নিয়ে, অশান্তির শেষ নেই।’

‘খুব বুঝতে পারছি, এবার তুমি বাড়ী যেতে পারো,’ জমিদার হাত নেড়ে বলল।

বাড়ী চলে গেল চাষী। সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকমা করতে লাগল। এখনো পর্যন্ত সে বেঁচে আছে, আর জমিদার বাবুর কথা ভেবে মনে হাসে।



জমিদারের সঙ্গে কাঙালের ভোজন

রাবিবারের এক চমৎকার দিন। জনকয়েক চাষী দাওয়ায় বসে গম্প করছিল।
গ্রামের দোকানদারও এসে জুটল সেখানে। এসেই হেন করেছে, তেন
করেছে, বড়াই সুরু করে দিল, বলল সে নাকি জমিদারের খাস-কামরাতেও
গিয়েছে।

দলের সবচেয়ে কাঙাল চাষীটি কিন্তু বসে বসে হাসে।

‘ভারি তো ব্যাপার — না, জমিদারের খাস-কামরায় গোছি! আমি ইচ্ছে
কালে জমিদার বাবুর সঙ্গে একাসনে খেয়েও আসতে পারি।’

‘কী, জমিদার বাবুর সঙ্গে ভোজন? সারা জীবনেও পারবে না হে?’
পয়সাওয়ালাটা বলল চীৎকার করে।

‘বলছি খেয়ে দোখঘে দেব!’

‘কিছুতেই পারবে না!’

তর্ক লেগে গেল ওদের। শেষকালে কাঞ্চল বলল:

‘আচ্ছা, এক হাত বাজি হয়ে যাক। ষণ্ঠি জমিদার বাবুর সঙ্গে বসে খেতে
পারি তবে তোমার কালো ঘোড়াটা, বাদামী ঘোড়াটা, দুই আমার। আর ষণ্ঠি
না পারি তবে তিনি বছর বিনা পয়সায় তোমার কাছে খাটবে।’

দোকানদার তো ভারি খুশী।

‘ঠিক আছে, আমার কালো ঘোড়াটা, বাদামী ঘোড়াটা বাজি, তার সঙ্গে
একটা বাছুরও ফাট রাইল! তোমরা সব সাক্ষী!’

সাক্ষীদের সামনে হাতে হাতে চাপড় মেরে বাজি ধরা হল।

তারপর কাঞ্চল গেল জমিদার বাবুর কাছে।

‘কিছু কথা আছে হুজুর, গোপনে জিজেস করতে চাই — একটা সোনার
তাল, ধরনুন এই আমার টুপির ঘতো, কত দাম হবে?’

জমিদার বাবুর মুখে আর রা নেই। হাততালি দিয়ে ডেকে বলল:

‘ওহে, কে আছো হে, আমাদের জন্যে কিছু মদ পাঠিয়ে দাও শীগ্ৰিৱ!
থাবার টোবারও সব দিয়ে যাও! বসো, বসো, লজ্জা করো না, যাও, দাও, যা মন
চায় নাও।’

কাঞ্চলের সে কৰ্ণি আদর আপ্যায়ন, যেন এক সম্মানিত অতিৰিথি, আর মনে
মনে ছুটফট করে জমিদার। কেবল চিন্তা কতক্ষণে ওই সোনার তালটি হস্তগত
করবে।

‘এবার তাহলে যাও তো বাপু, দোড়ে সোনার তালটি নিয়ে আসো। তার
বদলে আমি এক পুদ্র* ময়দা আর একটি আধুলি দেব তোমায়।’

* পুদ্র — আয় ঘোল সের ওজনের রূপীয় মাপ।

‘କିନ୍ତୁ ସୋନାର ତାଳ ତୋ ଆମାର କାଛେ ନେଇ । ଆମ କେବଳ ଜିଜ୍ଞେସ
କରିଛିଲୁମ୍ ଆମାର ଟୁପର ମତୋ ଏକ ତାଳ ସୋନାର ଦାଘ କତ ହବେ ।’

ଜଗମନ୍ତର ବାବୁ ତୋ ଏକେବାରେ ରେଗେ କାହିଁ :

‘କୁରିଯେ ଥା, ହତଭାଗା ! ହାଁଦା କୋଥାକାର !’

ବାରେ, ହାଁଦା କୋଥାଯ, ଦେଖିନ ନା, ଆପଣି ନିଜେଇ ଆମାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିର
ତ ଆପ୍ୟାଯନ କରଲେନ । ତାତେ ଆମାର ଏହି ଖାଓଯାର ଜନୋଇ ଦୋକାନଦାରଙ୍କ ଆମାର
ଦକ୍ଟୋ ଘୋଡ଼ା ଆର ଏକଟା ବାଚ୍ଚର ଦେବେ ।’

ଏହି ବଲେ ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଫିରେ ଗେଲ ଚାଷୀ ।



ଆଭାବ

এক গাঁয়ে ছিল দুই ভাই চাষী। একজন গরীব আর একজন ধনী। ধনী চাষী প্রাম ছেড়ে সহরে গিয়ে ঘন্ট একটা বাড়ী তৈরী করে বিবাট ব্যবসা ফেঁদে বসল। ওদিকে গরীব চাষীর বাড়ীতে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হত যে একটুকরো রুটিও থাকত না। চাষীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সারাক্ষণ খিদেয় কাঁদত। সকাল থেকে রাত অবধি চাষী খেটে খেটে হয়রান, জলের জলের মাছগুলো যেমন বরফে মাথা কুটে মরে, চাষীরও সেই দশা। শত জেষ্টাতেও কোন ফল হত না।

একদিন চাষী তার বৌকে বলল:

‘যাই, সহরে গিয়ে দাদাকে বালি, হয়ত কিছু সাহায্য করবে।’

এই ভেবে চাষী গেল ধনী দাদার কাছে।

বলল, ‘দোহাই’ দাদা, কিছু সাহায্য করো। বড় অভাব। একটু রুটিও নেই
যে স্বীপুলের মতখে দিই। দিনের পর দিন ওরা না খেয়ে থাকে।’

‘এ, সপ্তাহটা আমার কাছে কাজ করো, তাহলে দেব।’

গরীব চাষী কী আর করে? কাজেই লেগে গেল। জবালানি কাঠ কাটে, জল
তোলে, ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করে, আর উঠোন ঝাঁট দেয়।

সপ্তাহের শেষে বড়লোক দাদা চাষীকে একটা রুটি দিল।

বলল, ‘এই নাও তোমার কাজের মজুরি।’

‘তা যা দিলে তার জন্মেই ধন্যবাদ।’ এই বলে চাষী বেরিয়ে যাবে, এমন
সময় ধনী দাদা আবার ডাকল:

‘দাঁড়াও দাঁড়াও! কাল আমার বাড়ী তোমাদের নেমন্তন্ত্র। তোমার বৌকেও
এনো। কাল আমার জন্মদিন জানো তো?’

‘না ভাই, তা কী করে হয়। তুমি নিজেই জানো, কত বড় বড় সওদাগরেরা
নেমন্তন্ত্রে আসবেন ভাল ভাল জুতো, লোঘ-দেওয়া কোট পরে, আর আমার
পায়ে লাপ্তি*, গায়ে ছেঁড়া জামা।’

‘আরে, তাতে কিছু হবে না! চলে এসো, জামগা একটা করে দেব,’
দাদা বলল।

চাষী বলল, ‘বেশ, তাহলে আসব।’

গরীব চাষী বাড়ী ফিরে বৌকে রুটিটা দিয়ে বলল:

‘শূনছো বৌ, কাল আমাদের নেমন্তন্ত্র।’

‘তার মানে? কে করলে নেমন্তন্ত্র?’

‘দাদা নেমন্তন্ত্র করেছে, কাল দাদার জন্মদিন।’

‘তা বেশ, যাব।’

পরদিন সকালে উঠে ওরা তো সহরে গেল। ধনী দাদার বাড়ীতে পৌঁছে,
শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা বেঁগিতে বসে পড়ল। বহু ধনী অর্তিপ্রাপ্তির মধ্যেই
টেবিলে বসে গেছে, প্রচুর পরিমাণ আয়োজন করেছে বাড়ীর বুক্তা। সকলকেই

* লাপ্তি — গাছের ছাল বনে তৈরী করা জুতো, সাধারণত সেকালের রাশিয়ায়
গরীব চাষীরা পরত।

ମୁକ୍ତହଞ୍ଜେ ଦିଛେ । କିନ୍ତୁ ଗରୀବ ଭାଇ ଆର ଭାଇୟେର ବୌଯେର କଥା ଏକବାରଓ ମନେ ପଡ଼ିଲ ନା ତାର, କିନ୍ତୁ ଖେତେଓ ଦିଲ ନା । କାଜେଇ ସମେ ସମେ ଓରା ଶୁଧି ଅନ୍ୟେର ଥାଓଯା ଦେଖେ ଗେଲ ।

ଭେଦ୍ଭେ ଶେଷ ହଲ । କର୍ତ୍ତାଗମୀକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଯେ ସବାଇ ଟେବିଲ ଛେଡେ ଉଠିତେ ଲାଗିଲା । ଗରୀବ ଭାଇଓ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ିରେ ବିନୀତ ଅଭିବାଦନ କରଲ । ଧନୀ ଅର୍ତ୍ତିଥିର ଦଳେ ନେଶା କରେ, ଫୁର୍ତ୍ତ କରେ, କଲରବ କରେ ଗାନ କରତେ କରତେ ଗାଡ଼ୀ ଚଢ଼େ ବାଡ଼ୀ ଗେଲ ।

ଆର ଗରୀବ ଭାଇ ଫିରେ ଚଲି ଥାଲି ପେଟେ ହେଟେ ହେଟେ ।

ବୌକେ ବଲଲ, ‘ଆମରାଓ ଏକଟା ଗାନ ଧରି, କେମନ ?’

‘ବୋକାର ମତୋ କରୋ ନା । ଓରା ପେଟପୂରେ ଥେରେଛେ ତାଇ ଗାନ କରଛେ ! ତୁମି ଗାନ ଗାଇତେ ସାବେ କେନ ?’

‘ସାଇ ହୋକ ଭାଇୟେର ଜମାଦିନ, ଗାନ ନା ଗେରେ ବାଡ଼ୀ ଫେରା ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଗାନ କରଲେ ଲୋକେ ଭାବବେ ସବାର ମତ ଆମାକେଓ ସଙ୍ଗ ଆର୍ତ୍ତି କରରେଛେ ...’

‘ତା, ଇଚ୍ଛେ ହୁଯ ଗାନ ଧରୋ, କିନ୍ତୁ ଆମି ବାପ୍ଦ ଗାଇଛି ନେ ।’

ଚାଷୀ ଗାନ ଧରି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହଲ ଯେନ ଦ୍ଵାଟେ ଗଲା ଶୁଣିତେ ପାଛେ । ତାଇ ଗାନ ଥାମିଯେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ :

‘ଓ ବୌ, ତୁମିଓ ବୁଝି ସରି ଗଲାଯ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଗାନ ଧରେଇଲେ ?’

‘ତୋମାର ହରେଛେ କୀ ବଲୋ ତୋ ? ଗାନ ଗାଇତେ ଆମାର ବସେ ଗେଛେ ।’

‘ତାହଲେ କେ ଗାଇଲ ?’

‘ଆମି କୀ ଜାନି ? ଆଜ୍ଞା, ଆବାର ଗାଓ ତୋ ଏବାର ଆମି ଶୁନିବ,’ ଚାଷୀର ବୌ ଉତ୍ସର ଦିଲ ।

ଚାଷୀ ଆବାର ଗାଇତେ ସ୍ଵର୍ଗ କରଲ । ଗାଇଛେ ଏକଜନ, କିନ୍ତୁ ଶୋନା ଯାଇଁ ଦୁଇଟେ ଗଲା । ଚାଷୀ ଥେମେ ଗିଯେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ :

‘ଅଭାବ, ଓ ଅଭାବ ! ତୁମିଇ ଗାନ ଧରଛୋ ବୁଝି !’

ଅଭାବ ବଲଲ, ‘ହଁଁ ମାଲିକ, ଆମିଇ ।’

‘ତାହଲେ ଏସୋ, ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଚଲୋ ।’

‘ତାଇ ସାବ ମାଲିକ, କଥନଓ ତୋମାଯ ଛେଡେ ସାବ ନା ।’

বাড়ী এল জাষী, আর অভাব তাকে শৃঙ্খলায় ঘাবার জন্যে ডাকতে
লাগল। চাষী বলল:

‘উহুু, আমার টাকাকড়ি নেই, যাব না।’

কেন, টাকার কী দরকার? তোমার ভেড়ার চামড়ার কোটটা দেখছো না?
ওটার কী দরকার? প্রাণিকাল এসে গেছে। আর তো ওটা পরবে না! তার
চেয়ে চলো ওটার বদলে কিছু মদ খেয়ে আসা ধাক...’

চাষী আর অভাব তাই শৃঙ্খলায় গিয়ে কোটটার বদলে মদ খেল।

পরদিন সকালে অভাব মাথার ঘন্টায় “বাবারে মারে” করতে লাগল। গত
বাত্রের ফল। তারপর সেদিনও আবার মালিককে মদ খেতে ঘাবার জন্যে
টানাটানি করতে লাগল অভাব।

চাষী বলল, ‘টাকা নেই।’

অভাব বলল, ‘টাকার কী দরকার? তোমার গাড়ীটা আর সেজটা নিয়ে
চলো, যতেই হয়ে যাবে।’

কোন উপায় নেই — অভাবের হাত থেকে রেহাই নেই চাষীর। কাজেই
গাড়ী আর সেজ টেনে নিয়ে চলল শৃঙ্খলার দিকে। সেখানে গিয়ে সেগুলো
বেচে মদ খেল।

পরদিন অভাব মাথার ঘন্টায় আরও কাহিল। চাষীকে ডাকে মদ খেয়ে
ঘন্টা সারাতে। চাষী আর কী করে! সেদিনও মই আর লাঙল বেচে মদ
খাওয়া হল। একমাসের মধ্যেই চাষী সব কিছু উড়িয়ে দিল। এমনকি
বসতবাড়ীটাও প্রতিবেশীর কাছে বাঁধা রেখে সেই টাকা দিয়ে মদ খাওয়া হল।

কিন্তু তবু অভাব ছাড়ে না। পেড়াপৌর্ণি করে, চলো ধাই, চলো ধাই
শৃঙ্খলায়।

‘না অভাব, যতেই বলো, আর কিছুই নেই যাব বদলে মদ খাওয়া চলতে
পারে।’

‘কিছু নেই মানে? তোমার বৌঝের দুটো সারাফান* রয়েছে না? একটা
ওর থাক। অন্যটা নিয়ে চলো ধাই, মদ খেয়ে আস।’

* সারাফান — হাতকাটা লম্বা ঢোলা মেঝেদের পোষাক।

চাষী সারাফান্ট বিছি করে ঘদ খেল, তারপর ভাবল:

“এবার একেবারে পরিষ্কার, চাল নেই, চুলো নেই। গায়ে দেবার জামা নেই, আমারও বাহ্যিকায়েরও না।”

অভ্যন্তর সকালে উঠে দেখে মালিকের কাছে চাইবার মতো আর কিছুই নেই।

ভাবল, ‘মালিক !’

‘কী অভাব, কী চাও ?’

‘শোনো বলল, তোমার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে গাড়ীটা আর বলদজোড়া চেয়ে আনো।’

চাষী তাই প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বলল:

‘তোমার গাড়ীটা আর বলদজোড়া আমায় দেবে ? তাহলে আমি সপ্তাহ তোমার হয়ে থাটব ?’

প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করল, ‘কেন ? কী দরকার বলো তো ?’

‘জঙ্গল থেকে কিছু জবালানি কাঠ আনব।’

‘তা নিয়ে যাও, তবে বেশী বোঝা চাপও না।’

‘না, না, কী যে বলো, অনন্দাতা !’

চাষী বলদ আর গাড়ীটা নিয়ে এল। তারপর চাষী আর অভাব তাতে চড়ে চলে গেল খোলা মাঠে।

অভাব জিজ্ঞেস করল, ‘মাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথরটা কোথায় জানো ?’

‘তা আর জানব না কেন !’

‘তাহলে সিধে ওটার কাছে চলো।’

পাথরটার কাছে পেঁচে চাষী গাড়ী থামাল। গাড়ী থেকে নেমে অভাব চাষীকে পাথরটা তুলতে বলল। চাষী হাঁপায়, অভাব কাঁধ দেয়। পাথরটা তুলেই দেখে একটা গর্ত, সোনায় ভর্তি।

‘হাঁ করে দেখছো কি, চট্টপট্ট গাড়ীতে তোলো !’

চাষী লেগে গেল কাজে। সোনা দিয়ে গাড়ীটাকে বোঝাই করে ফেলল। একটা মোহরও আর গর্তে পড়ে রাইল না। গর্তটা খালি দেখে চাষী অভাবকে দেকে বলল:

‘দ্যাখো তো অভাব, মোহর কিছু পড়ে রইল কি না?’

অভাব বাকে দেখে বলল:

‘কোথায়? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছ না!’

‘এই যে কোগে, চক্চক করছে!’

‘না তো, দেখতে পাচ্ছ না।’

‘গর্তের ভিতরে নামো, তাহলে ঠিক দেখতে পাবে।’

অভাব তো গর্তে নামল। আর যেই না নেমেছে, অমনি চাষী পাথরটা দিয়ে মুখটা বক্স করে দিল।

বলল, ‘এই বরং ভাল, সঙ্গে নিয়ে গেলে সব টাকা তুমি আজ না হোক কাল মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতে, ইতভাগা অভাব।’

তারপর চাষী বাড়ী ফিরল। মাটির নৌচের গুদামঘরে সব টাকা জমা করে, প্রতিবেশীর বলদ গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে চাষী ভাবতে লাগল কী করে একটু গুছিয়ে বসা যাব। কিছু কাঠ কিনে একটা সুন্দর বাড়ী বানাল সে, তারপর দাদার চেয়ে বিগৃহ সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

একাদিন ঘায়, দ্বিদিন ঘায়, চাষী একদিন সহরে গিয়ে ধনী দাদা বৌদিকে নিজের জন্মদিনে নেমন্তন্ত্র করে এল।

দাদা বলল, ‘বলছো কী তুমি? নিজেরই তোমার খাবার কিছু নেই, জন্মদিন পালন করার শখ?’

‘আগে সত্তাই কিছু ছিল না দাদা, কিন্তু এখন আছে। ভগবানের কৃপায় তোমার চেয়ে কিছু কম নয়। গিয়ে নয় দেখে এসো।’

‘বেশ, যাব।’

পরদিন সকালে ধনী ভাই আর তার বৌ ভাইয়ের বাড়ী জন্মদিনের নেমন্তন্ত্র গেল। কপর্দিকহীন ভাইয়ের বিরাট সুন্দর বাড়ী দেখে তো ওরা অবাক। সহরের বড় বড় সওদাগরেরও অমন বাড়ী নেই। চাষী ভাইকে বৌদিকে আদর যত্ন করে চৰ্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়াল।

খাওয়া দাওয়ার পর ধনী দাদা ভাইকে জিজেস করল:

‘বলো তো শুনি, এত ধনদৌলত পেলে কী করে?’

গৱাব চাষী সুবিকথা খুলে বলল। কেমন করে হতভাগা অভাব জৰুটোছিল তার সঙ্গে, কেন্দ্ৰীয় করে অভাবের পীড়নে সৰকিছু বেচে শৰ্দুলীখানায় ছুটতে হত। যখন কৈবল প্রাণটুকু শুধু সম্বল, তখন কেমন করে অভাব মাঠের মধ্যে লুকায়ে ধনদৌলতের সঞ্চাল দেয়, কী করে অভাবের হাত থেকে রক্ষা পেল।

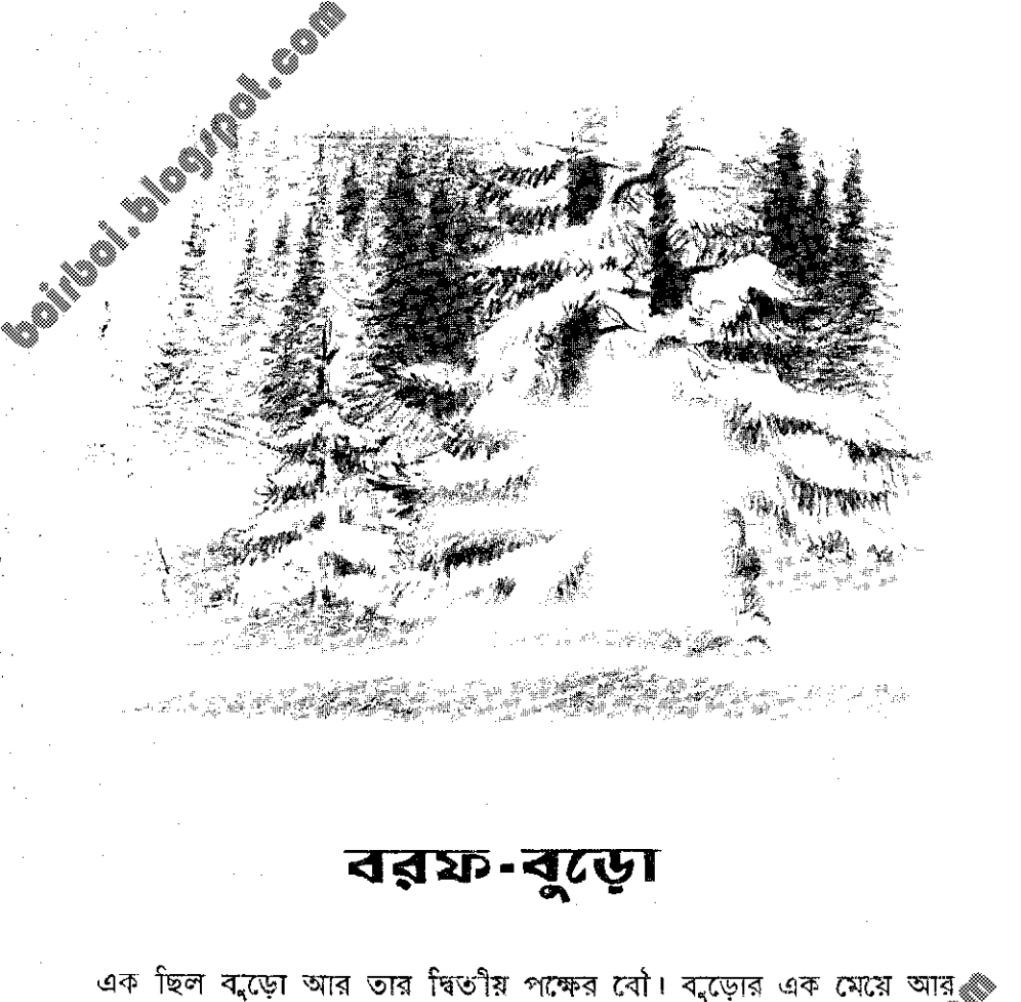
খনী দাদা এদিকে হিংসেয় বাঁচে না। মনে মনে ভাবল, “যাই গিয়ে খোলা মাঠে পাথৰটা তুলে অভাবকে বাৰ কৰে দিই, ভাইটাকে আবাৰ সে সৰ্বস্বান্ত কৰে দিক, জীবনেও যেন আৱ আমাৰ সঙ্গে দৌলতেৰ বড়াই কৱতে না আসে।” তাই সে বোকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলল মাঠের দিকে। গতৰ্টাৰ কাছে এসে, মৃখ থেকে পাথৰটা একটামে পাশে সৰিয়ে বলল:

‘যাও অভাব আমাৰ ভাইয়েৰ কাছে, ভাইটাকে একেবাৰে সৰ্বস্বান্ত কৰে দিও।’

অভাব বলল:

‘উহঁ, আমি বৱং তোমাৰ কাছেই থাকব। ওৱ কাছে যাব না। তোমাৰ দ্যামায় আছে, আমায় ছেড়ে দিলে। আৱ ঐ হতভাগা আমায় কিনা আটকে রেখেছিল।’

কিছুদিনের মধ্যেই হিংসুক দাদা সৰ্বস্বান্ত হল। বড়লোকি রইল না, হয়ে গেল কপৰ্দকহীন কাঙাল।



বরফ-বুড়ো

এক ছিল বুড়ো আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বোঁ। বুড়োর এক মেঝে আর দ্বিতীয় পক্ষের বৌঘের নিজের এক মেঝে।

সৎমায়েরা কেমন সে তো সবাই জানে। ভাল কাজ করলেও লাখি মেটা, মণ্ড কাজ করলেও লাখি ঝাঁটা। নিজের মেয়েটির বেলায় কিন্তু অন্ধকার—সে যাই করে তাই ভাল: সবেতেই তার আদর।

স্বর্ণ ওঠার আগেই সৎমেয়েটি ওঠে, গরুবাছুরকে খাওয়ার, জবালানি কাঠ আর জল আনে, উন্দনে আগন্তুন দেয়, ঘর ঝাঁট দেয়। কিন্তু বুড়ীর আর মন ওঠে না, সবই তার খারাপ, সবই ঠিক তেমনটি নয়।

বুড় উঠলে বুড়িগু শাস্ত হয়ে যায়, কিন্তু বুড়ীমেয়ের রাগ একবার উঠলে আর শাস্ত নেই। মেয়া ঠিক করল সংমেয়েটাকে দূনিয়া থেকেই সরাতে হবে।

বুড়েজে বলে, ‘মেয়েটাকে এখান থেকে সরা বাপ্ত। যেখানে খৃশি দিয়ে আয় চোখে যেন না দেখতে হয়! বনে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আয় শীতের মধ্যে।’

বুড়ো মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। কিন্তু জানে কোনো উপায় নেই। বুড়ীকে টেলানো যাবে না। কাজেই লাগাম পরিয়ে ঘোড়া যুক্ত মেয়েকে ডাকল:
‘আয় মা, স্লেজে ওঠ।’

অভাগ মেয়েটিকে দূরে বনে নিয়ে বড় ফার গাছের নীচে একটা বরফের শূলের মধ্যে ফেলে রেখে ফিরে এল বুড়ো।

সৌদিন ভীষণ ঠাণ্ডা। মেয়েটি ফার গাছতলায় বসে বসে কাঁপছে, ঠকঠক করছে। ইঠাঁ শোনে আশেপাশের গাছের ডালে চড়বড় আওয়াজ তুলে এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে বরফ-বুড়ো। চোখের পলকেই বরফ-বুড়ো মেয়েটি যে গাছতলায় বসেছিল সেই গাছে এসে হাজির।

ওপর থেকে জিজেস করল:

‘বাছা, তোর শীত লাগছে না তো?’

মেয়েটি নরম করে উত্তর দিল:

‘না, শীতবাবাজি, শীত করছে না।’

বরফ-বুড়ো তখন আরও নিচে নেমে এল। চড়বড় আওয়াজ উঠল আরও জোরে।

‘শীত করছে না, মেয়ে? সাত্যি শীত করছে না, কন্যে?’

মেয়েটি নিংশাস নিতে পারছিল না, তবু বলল:

‘না, শীতবাবাজি, ঠাণ্ডা লাগছে না।’

বরফ-বুড়ো আরও নিচে নেমে এল। বরফ পড়ার চড়বড় শব্দ হৈড়ে উঠল ভয়ানক।

জিজেস করল, ‘শীত লাগছে না, মেয়ে? এখনো শীত করছে না, কন্যে? শীত লাগছে না তোর, সুন্দরী?’

মেয়েটি তখন প্রায় জমে অবশ্য। জিভও যেন নড়ে না। কোনোরকমে বলল:
‘না, শীতোষ্ণার্জি, শীত করছে না।’

বৃক্ষের দ্বার তখন দয়া হল। মেয়েটিকে সে ফোলা ফোলা নরম লোমওয়ালা
কোটি আর গরম লেপের পোষাক দিয়ে জড়িয়ে দিল।

এদিকে তো সৎমা মেয়েটির শ্রাদ্ধের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছে। সরু
চাকলি ভাজে আর বুড়োকে বলে:

‘এই মিনসে, যা বনে ধা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়, কবর দেব।’

বুড়ো বনে গিয়ে দেখে ঠিক যে জায়গাটায় রেখে গিয়েছিল সেই বড়ো ফার
গাছটির নিচে বসে আছে মেয়েট। দেখাচ্ছে ভারি খুশী খুশী, লাল টুকুক
করছে মুখটি। গারে তার একটা লোমের কোটি, সর্বাঙ্গে সোনা রংপোর গহনা।
পাশেই একটা মন্ত্র সিন্দুক দাঢ়ী দাঢ়ী উপহারে ভরা।

বুড়ো আহন্দে আটখানা। মেয়েকে সেলজে বসিয়ে, ধনসম্পদ তুলে নিয়ে
বাড়ী ফিরে এল সে।

এদিকে সৎমা সরু চাকলি ভাজে আর ওদিকে টেবিলের নীচ থেকে কুকুরটা
বলে:

‘ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ীর মেয়ে রইল
পড়ে, হবে না তার বিয়ে।’

বুড়ী কুকুরটাকে একটা সরু চাকলি ছুঁড়ে দিয়ে বলে:

‘ও কথা নয় কুকুর, বল: “বুড়ীর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার,
বুড়োর মেয়ে হতজ্জাড়ি বেঁচে সে নেই আর।”’

কুকুরটা সরু চাকলি থেয়ে ফের শুরু করে:

‘ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ীর মেয়ে
রইল পড়ে, হবে না তার বিয়ে।’

বুড়ী আরো কতগুলো সরু চাকলি কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিল। ঘারল
কুকুরটাকে। তবু কুকুরটার মুখে শুধু এই একই কথা ...

হঠাতে ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল ফটক, দুরজা খুলে গেল। বুড়োর মেয়ে ঘরে
চুকল। জামাকাপড় সোনা রংপো, মণিমাণিক্যে বলমল করছে। পেছন পেছন

বুড়ো তুকল মন্দিরারী সিন্দুকটা নিয়ে। তাকিয়ে দেখেই বুড়ীর হাতদুটো
বুলে পড়ল হাজশে...

‘যা মুখপোড়া বুড়ো, গাড়ী জুতে নে! তারপর তোর মেয়েকে যেখানে
রেখে এসেছিল, আমার মেয়েকেও সেখানে রেখে আয়...’

বুড়ীর মেয়েকে সেজে বসাল বুড়ো, বনে গিয়ে লম্বা ফার গাছটার তলায়
বরফের ঢিপ্পর মধ্যে রেখে দিয়ে এল।

বুড়ীর মেয়ে বসে আছে গাছতলায়। শীতের চোটে দাঁত-কপাটি।

মড়মড়য়ে ঠকঠকিয়ে, এগাছ থেকে ওগাছে লাফাতে লাফাতে বরফ-বুড়ো
এসে হাজির। বুড়ীর মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে:

‘বাছা, তোর শীত করছে না তো?’

বুড়ীর মেয়ে কিন্তু বলে:

‘মা গো, জমে গেছি! দোহাই শীতবাবাজি, অমন মড়মড়য়ো না, ঠকঠকিয়ো
না...’

বরফ-বুড়ো আরও নিচে নেমে এসে আর জোরে জোরে ঠকঠকায়, চড়বড়ায়।

বলল, ‘শীত করছে না, মেঝে? শীত করছে না তো, কন্যে?’

মেয়ে বলল, ‘উহুু রে, হাত পা জমে গেছে! তুমি চলে যাও, শীতবাবাজি...’

আরো নিচে নেমে এল বরফ-বুড়ো, আরো জোরে ঝাপট মারে, ঠকঠকায়,
চড়বড়ায়।

‘শীত করছে না তো, কন্যে? শীত লাগছে না তো, সুন্দরী?’

‘মা গো, একেবারে হাড় জমে গেছে! দূর হ, হতঙ্গাড়া শীত কোথাকার!’

রাগ হয়ে গেল বরফ-বুড়োর, বুড়ীর মেয়েকে জাপটে ধরে জমিয়ে মেঝে
ফেলল।

এদিকে সবে ভোর হয়েছে কি হয়নি, বুড়ী বুড়োকে বলে:

‘তাড়াতাড়ি ওঠ মুখপোড়া বুড়ো, ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে চেঁচ করে যা,
মেয়েকে নিয়ে আয়, সোনায় রূপোয় সাজিয়ে আনা চাই...’

বুড়ো তো ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আর কুকুরছান্তা ওদিকে টেবিলের
তল থেকে বলে:

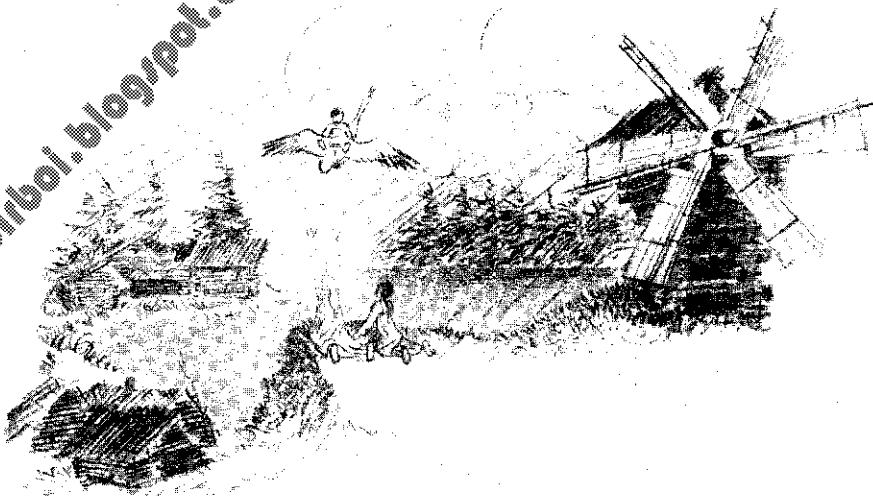
‘ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, বুড়ীর মেয়ে
মরল শীতে, উঠবে নাকো আৱ।’

বুড়ী কুকুরটাকে একটা পিঠে ছুঁড়ে দিয়ে বলে:

“কথা নয়, বল: “বুড়ীর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে...”,
কুকুর কিন্তু আগের মতো বলেই চলল:

‘ভেউ, ভেউ! বুড়ীর মেয়ে মরল শীতে, উঠবে নাকো আৱ ...’

ফটক খোলার আওয়াজ হল। মেয়েকে এগিয়ে আনবার জন্যে বুড়ী ছুঁটল
ইডমড় করে। তারপর ঢাকা সরিয়ে দেখে, স্লেজের ওপর তার মরা মেয়ে শূরৈ।
ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল বুড়ী, কিন্তু আৱ তো উপায় নেই।



ରାଜହାଁସ ଆର ଛୋଟ ମେଘେ

ଏକ ଛିଲ ଚାଷୀ ଆର ତାର ବୌ । ତାଦେର ଏକ ମେଘେ ଆର ଛୋଟ ଏକ ଛେଳେ ।

ଏକଦିନ ମା ବଲଜ :

‘ଶୋନ ଖୁବି, ଆମରା କାଜେ ଯାଇଁଛ, ଛୋଟ ଭାଇଟିକେ ଦେଖିସ । ସବ ଛେଡ଼େ ଯାମନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରେ ଥାକାବି । ତୋକେ ଏକଟା ସ୍ତର ରୂପମାଲ କିନେ ଦେବ ।’

ମା ବାପ ବୈରିଯେ ଘେତେଇ ମେଘେଓ ଭୁଲେ ଗେଲ ମା କୀ ବଲେଛେ । ଛୋଟ ଭାଇକେ ଜାନଲାର ପାଶେ ଘାସେର ଓପର ବସିଯେ ରେଖେ ବନ୍ଧୁଦେର ସଙ୍ଗେ ଖେଳତେ ଚଲେ ଗେଲାଏ

ହଠାତ୍ କୋଥା ଥେକେ ଏକ ଝାଁକ ରାଜହାଁସ ଏସେ ବାଚାଟାକେ ଡାନାଯ ତୁଳେ ମିଯେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ମେଘେଟି ବାଡ଼ୀ ଫିରେ ଦେଖେ ଭାଇ ତୋ ନେଇ । ହାୟ ହାୟ କରେ ମେଦିକେ ଛେଟେ, ମେଦିକେ ଛୋଟେ, କିନ୍ତୁ କୋଥାଓ ନେଇ ।

ଭାଇଯେର ନାହିଁ ଧରେ କତ ଡାକଲ, କତ କାଁଦଲ, କତ କରେ ବଲିଲ ବାବା ମା ବକବେ । କିନ୍ତୁ ଭାଇଯେର କୋନୋ ସାଡା ନେଇ ।

খোলা মাঠে ছুটে গেল মেয়েটি। দেখে, অনেক দূরে অঙ্ককার বন পেরিয়ে
একদল হাঁস উড়ে যাচ্ছে। অম্বিন সে টের পেলে: হাঁসগুলোই তার ভাইকে
নিয়ে গেছে, হাঁসেদের তো চিরকালই ভারি বদনাম; লোকে বলে, ভারি দৃশ্য
ওয়া জলেধরা।

‘হাঁসের পেছন পেছন ছুটল মেয়েটি। ছুটতে ছুটতে দেখে কি, একটা উন্মুক্ত
উন্মুক্ত, ও উন্মুক্ত, বলো না, হাঁসের দল কোন দিকে উড়ে গেছে?’

উন্মুক্ত বলে:

‘আগে আমার একটা কালো পিঠে খাও, তবে বলব।’

‘বয়ে গেছে আমার কালো পিঠে খেতে! বাড়ীতে আমরা শাদা ময়দার
পিঠেই বলে খাই না...’

উন্মুক্ত আর কিছু বলল না। মেয়েটি তখন আরো খাঁনিকটা ছুটে গিয়ে
দেখে একটা আপেল গাছ।

‘আপেল গাছ, আপেল গাছ, বলো না, হাঁসের দল কোন দিকে উড়ে গেছে?’

‘আগে আমার বুনো আপেল একটা খাও, তবে বলব।’

‘বাড়ীর বাগানের ভালো আপেলই বলে আমরা খেতে চাই না...’

আপেল গাছ তাই কিছু বলল না। মেয়েটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে থামল
সৰ্জির পাড়, দূর্ধের নদীর কাছে।

‘দূর্ধের নদী, সৰ্জির পাড়, বলো না, কোথায় হাঁসের দল উড়ে গেছে?’

‘আগে একটু দূর্ধ দিয়ে সৰ্জি খাও, তবে বলব।’

‘বাড়ীতে বলে সরও মুখে তুলি না...’

সারাদিন ধরে মেয়েটি মাঠে বনে ছুটে বেড়াল। সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়ী ফিরে
খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হঠাৎ দেখে মুরগীর পায়ের ওপর এক
গানলার এক কুঁড়ের, ঘূরছে তো ঘূরছেই।

কুঁড়েরের মধ্যে বাবা-ইয়াগা ডাইনী বসে বসে শণ নৃত্তির স্বচ্ছতা কাটছে।
ভাইটি বসে আছে বেশিতে, রূপোর আপেল নিয়ে খেলা করছে।

ঘরে চুকল মেয়েটি।

‘প্রণাম হই, ঠাকুমা!’

‘আয় বাছা, আয়, তা এখানে কেন?’

‘জলায় জল্লায় ঘূরছিলাম, জামাটা ভিজে গেছে, তাই শুকিয়ে নিতে
এসেছি।’

‘সু, তাহলে, একটু শণ ন্দৃতির সুতো কেটে দে।’

মেয়েটির হাতে তকলি দিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা-ইয়াগা। মেয়েটি বসে বসে
সুতো কাটছে, এমন সময় একটা ইংদুর উন্ননের তলা থেকে বেরিয়ে এসে বলল:

‘মেয়ে, ও মেয়ে, আমায় একটু পায়েস দে তো, তবে একটা কথা বলব।’

মেয়েটি একটু পায়েস দিল। পায়েস পেয়ে ইংদুর বলল:

‘বাবা-ইয়াগা চানের ঘরে আগুন জ্বালাতে গেছে। তোকে থোবে পাকলাবে,
উন্ননে ঢ়াবে, ভেজে খাবে। তারপর তোর হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াবে।’

ভরে মেয়েটি তো কেঁপে কেঁপে, কেঁদে কেঁদে সারা। ইংদুর বলল:

‘আর দেরি করিস না, এই ফাঁকে ভাইকে নিয়ে পালা। আমি তোর হয়ে
সুতো কেটে দিছি।’

ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটল মেয়ে। এদিকে বাবা-ইয়াগা থেকে থেকে জানলায়
এসে জিজ্ঞেস করে:

‘সুতো কাট্চিস তো, বাছা?’

ইংদুর উন্নর দেয়:

‘হ্যাঁ ঠাকুমা, কাট্চি...’

তারপরে তো চানের ঘরে আগুন জেবলে মেয়েটিকে নিতে এল বাবা-
ইয়াগা। কিন্তু ঘর ওদিকে খালি!

বাবা-ইয়াগা হাঁসের দলকে ডেকে বলল:

‘শীগ্রগ্র ধৱ্ গয়ে! ভাইকে নিয়ে বোন পালাল।’

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি এসে থামল দুধ-নদীর কাছে। দেখে কী, উড়ে
আসছে হাঁসের দল।

মেয়েটি চেঁচায়ে বলল, ‘ও নদী, যা আমার, লুকিয়ে রাখো।’

‘আমার সুজি আগে খাও।’

খানিকটা সংজ্ঞি খেল মেয়েটি, ধন্যবাদ দিল। দুধ-নদী তখন সংজির পাড়ে
তাদের লুকিয়ে রাখল।

দেখতে না পেয়ে উড়ে চলে গেল হাঁসের দল।

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি আবার দৌড়তে সুরু করল। হাঁসের দল কিন্তু বাঁক
শিরে ফিরে আসছে ততক্ষণে। এই ওদের দেখে ফেলে বুঝি। সর্বনাশ! কী
উপায়? মেয়েটি ছুটল আপেল গাছের কাছে।

‘আপেল গাছ, আপেল গাছ, লুকিয়ে রাখো আমায়!’

‘আগে আমার বুনো আপেল খাও, তবে!’

মেয়েটি তাড়াতাড়ি করে একটা আপেল খেল, ধন্যবাদ দিল। আপেল গাছ
তখন ডাল দিয়ে ঘিরল, পাতা দিয়ে ঢাকল।

দেখতে না পেয়ে উড়ে চলে গেল হাঁসের দল।

ভাইকে কোলে নিয়ে আবার দৌড়তে সুরু করল মেয়েটি। ছোটে, ছোটে,
প্রায় এসে গেছে, এমন সময় ওদের দেখে ফেলল হাঁসেরা। ডাক ছেড়ে ডানা
বাপটে সেঁ করে এসে ছোট ভাইটিকে প্রায় ছিনয়ে নেয় আর কি!

মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তে উন্ননের কাছে গেল।

‘উন্নন, ও উন্নন, লুকিয়ে রাখো আমায়!’

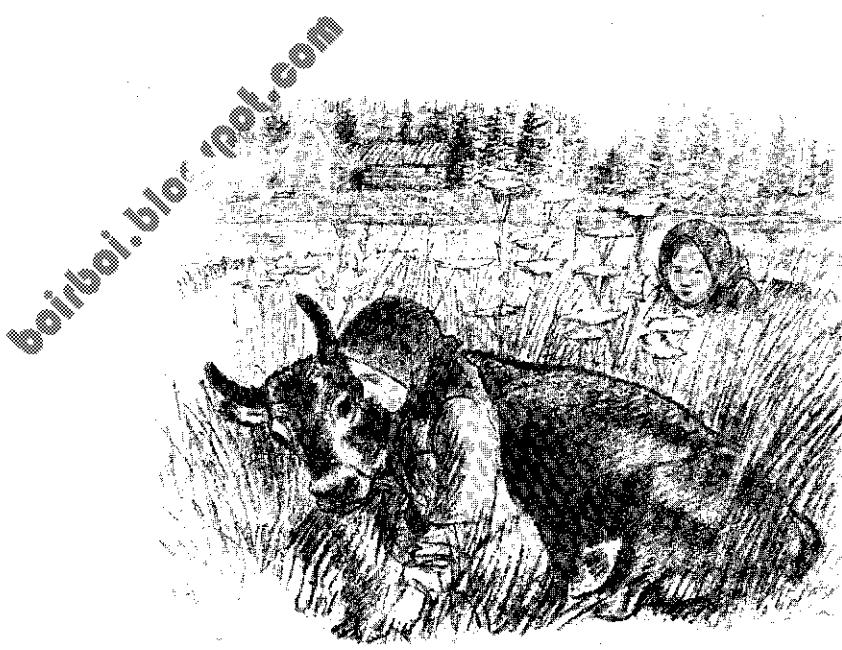
‘আগে আমার কালো পিঠে খাও, তবে।’

তাড়াতাড়ি করে মেয়েটি একটা পিঠে মুখে পুরে ভাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল
উন্ননের পেটের ভিতর।

হাঁসের দল ওড়ে আর ওড়ে, ডাকে আর ডাকে, তারপর খালি হাতেই ফিরে
গেল বাবা-ইয়াগার কাছে।

মেয়েটি উন্ননকে ধন্যবাদ দিয়ে ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটে এল বাড়ীত।

বাবা আর মাও বাড়ী ফিরে এল তখন।



ହାତ୍ତରୋଶେଚ୍‌କା

ପ୍ରଥିବୀତେ କେଉ ଭାଲ କେଉ ମନ୍ଦ । କେଉ ଆବାର ଏତି ଖାରାପ, ସେ ଲଜ୍ଜାଓ ନେଇ ।

ଥୁରୁମର୍ଗ ହାତ୍ତରୋଶେଚ୍‌କା ପଡ଼େଛିଲ ଏହି ରକମ ସବ ଲୋକେର ପାଲ୍ଲାୟ । ହାତ୍ତରୋଶେଚ୍‌କା ଛିଲ ଅନାଥ । ଓରା ତାକେ ନିଯେ ଗିଯେ ପାଲେ ଆର କେବଳ ଖାଟିୟେ ମାରେ । ସ୍ଵତୋ କାଟେ ସେ, କାପଡ଼ ବୋନେ, ସରେର କାଜ କରେ, ସବ କାଜଇ ତାର ଓପରା ।

ବାଡ଼ୀର ଗିନ୍ଧୀର ତିନ ମେଯେ । ବଡ଼ୋଟିର ନାମ ଏକ-ଚୋଖୋ, ମେଜୋର ନାମ ଦୁ-ଚୋଖୋ ଆର ଛୋଟୋଟିର ନାମ ତିନ-ଚୋଖୋ ।

ତିନ ବୋନ ସାରାଦିନ କୁଟୋଟି ନାଡ଼େ ନା । କେବଳ ଫଟକେର ପାଶେ ସିମେ ସିମେ ରାଷ୍ଟାର ଦିକେ ଚେଯେ ଦେଖେ । ଥୁରୁମର୍ଗ ହାତ୍ତରୋଶେଚ୍‌କା ଓଦେର ଜଣ୍ଠେ ଜାମା ସେଲାଇ କରେ, ସ୍ଵତୋ କାଟେ, କାପଡ଼ ବୋନେ । କିନ୍ତୁ ତାର ବଦଳେ ଦୂଟୋ ଝାଇଁଟ କଥାଓ କଥନୋ ଶୁଣନ୍ତେ ପାଯ ନା ।

থৰুমণি হাভ্ৰোশেচ্কা চলে যেত মাঠে। তাৱপৰ নিজেৰ দাগ-ফুটকি
গৱঢ়াৰ গলা জড়িয়ে ধৰে মনেৰ দৃংখ জানাত:

‘গৱঢ় আমাৰ মা-জননী, ওৱা আমাৰ মাৱে, বকে, খেতে দেয় না, কাঁদাও
বারণ। কালকেৰ মধ্যে আমায় পাঁচ পদ শণ পাৰ্কিয়ে সুতো কেটে, ধৰে, শাদা
কৰ্মে গৱঢ়টৈয়ে ঘৰে তুলতে হবে।’

গৱঢ়টি বলে:

‘বলি শোন সুন্দৱী। আমাৰ এক কান দিয়ে চুকে অন্য কান দিয়ে বেৰিৱয়ে
আয়, দেখবি কাজ হয়ে গেছে।’

গৱঢ় যা বলে, তাই হয়। হাভ্ৰোশেচ্কা এক কান দিয়ে চুকে অন্য কান
দিয়ে বেৰিৱয়ে আসে। দেখে সব তৈৱী: বোনা, ধোয়া, গোটানো — সব।

হাভ্ৰোশেচ্কা তখন গাঁঠিৰ নিয়ে গিমৰীৰ কাছে যায়। গিমৰী তাকিয়ে
দেখে ঘোঁ ঘোঁ কৰে সিল্ডুকে তুলে রাখে, তাৱপৰ ফেৱ আৱও কাজ ঘাড়ে
চাপায়।

থৰুমণি হাভ্ৰোশেচকা আবাৰ যায় গৱঢ়টিৰ কাছে। গলা জড়িয়ে আদৱ
কৰে, তাৱপৰ এক কান দিয়ে চুকে অন্য কান দিয়ে বেৰিৱয়ে আসে। তৈৱী
গাঁঠিৰটা তুলে নিয়ে আবাৰ গিমৰীৰ কাছে ফিৱে যায়।

বুড়ী একদিন এক-চোখোকে ডেকে বলল:

‘যা তো আমাৰ সোনা, যা তো আমাৰ মণি, দেখে আয় কে ওৱ কাজ কৰে
দেয়। কে ওৱ কাপড় বোনে, সুতো কাটে, গৱঢ়টৈয়ে দেয়।’

হাভ্ৰোশেচ্কাৰ সঙ্গে বলে গেল এক-চোখো, মাঠে গেল, কিসু মা’ৱ হৰুম
ভুলে গিয়ে সে ঘাসেৰ ওপৰ রোদ পোহাল, গা গড়াল। আৱ হাভ্ৰোশেচ্কা
ফিস্ক্রিফিস কৰে বলে:

‘ঘূমো রে চোখ ! ঘূমো রে চোখ !’

এক-চোখোৰ চোখ বুজে গেল। এক-চোখো ঘূমোৱ আৱ ওঁচুকে গৱঢ় শণ
থেকে সুতো কাটে, কাপড় বোনে, তাৱপৰ ধৰে গৱঢ়টৈয়ে তৈৱী কৰে রাখে।

গিমৰী কিছুই জানতে পাৱল না। তাই পৰদিন মেজো মেয়েকে ডেকে বলল:
'সোনা আমাৰ, মণি আমাৰ, গিয়ে দেখ তো কে এ অন্ধথাটাৰ কাজ কৰে দেয়।'

দুর্চোখে ঘৰ্মো হাভ্ৰোশেচকাৰ সঙ্গে। কিন্তু মা'ৰ হৰুম ভূলে গিয়ে সে ধাসেৰ ওপৰ ঘৰ্মো পোহাল, গা গড়াল। আৱ হাভ্ৰোশেচকা ফিস্ফিস্ কৰে বলে:

‘ঘৰ্মো রে চোখ এটা, ঘৰ্মো রে চোখ ওটা !’

দুর্চোখেৰ চোখ বৃজে গেল। দুর্চোখে ঘৰ্মোৱ আৱ ওদিকে গৱৰুৰ সুতো কাটা, কাপড় বোলা, ধোয়া, গৃঢ়নো শেষ।

বৃড়ী রেগে আগড়ন। তিন দিনেৰ দিন তাৱ ছোট মেয়ে তিন-চোখোকে পাঠাল। আৱ হাভ্ৰোশেচকাৰ ঘাড়ে চাপাল আৱো বেশী কাজ।

তিন-চোখে সাৱাদিন রোদে রোদে লাফালাফি কৰে খেলল। তাৱপৰ রোদ্দুৰে হৱৱান হয়ে ধাসেৰ উপৰ শূন্যে পড়ল।

হাভ্ৰোশেচকা গান ধৰল:

‘ঘৰ্মো রে চোখ এটা, ঘৰ্মো রে চোখ ওটা !’

কিন্তু তিন নম্বৰ চোখটাৰ কথা ওৱ একেবাৱে মনে ছিল না।

তিন চোখেৰ দুর্চোখে ঘৰ্ম এসে গেল। কিন্তু ততীয় চোখটা জেগে জেগে সব দেখতে লাগল। দেখল মেয়েটি গৱৰু এক কান দিয়ে চুকে অন্য কান দিয়ে বেৰিৱৱে এসেই তৈৱী পৌঁটলাটা ভূলে নিল।

তিন-চোখে বাড়ী এসে যা যা দেখেছে মাকে বলল।

বৃড়ী আহ্মাদে আটখানা। পৰাদিনই স্বামীকে গিয়ে বলল:

‘দাগ-ফুটকি গৱৰুটাকে বাপু জবাই কৰো !’

বৃড়ো তো কথা শুনে থ। একথা বলে, ওকথা বলে:

‘বালিস কৰী বৃড়ী, ভীমৱৰ্তি হয়েছে নাকি? বকনা গৱৰু, ভালো গৱৰু !’

‘মেৰে ফেলো, কোনো কথা শুনতে চাই না !’

বৃড়ো কৰী আৱ কৰে! ছৱিৰ শান দিতে বসল। হাভ্ৰোশেচকা সৰ টেৱ পেয়ে দোড়ে মাঠে গিয়ে গৱৰুৰ গলা জড়িয়ে বলে:

‘গৱৰু আমাৰ মা-জননী, তোমায় ওৱা কেটে ফেলবে বলছে।’

গৱৰু বলল:

‘তোকে বলি সুন্দৱী, আমাৰ মাংস খাস না। আমাৰ হাড়গুলো জড়ো কৰে

রূমালে বেঁধে গোর দিস বাগানে। আমায় কোনো দিন ভুলিস না, রোজ জল
দিস সেখানে।

বল্টো গরুটাকে কাটল। গরু যা বলেছিল হাভ-রোশেচকা সব তাই করল।
না যেয়ে কাটাল সে, মাংস মুখে তুলল না। হাড়গুলো রূমালে বেঁধে কবর দিল
বাগানে। রোজ গিয়ে জল দিত।

সে হাড় থেকে হল একটি আপেল গাছ। সে কী গাছ! আপেল তার রসে
রসাল, নৃয়ে আসে রূপোর ডাল, সোনার পাতায় শনশন। পথের লোক থমকে
দাঁড়ায়, কাছের লোক চেয়ে দেখে।

কত দিন যায়। একদিন এক-চোখো, দু-চোখো আর তিন-চোখো বাগানে
বেড়াচ্ছে, এমন সময় ঘোড়ায় চেপে কে আসে, না এক বীর তরুণ — কেঁকড়া
কেঁকড়া চুল, অনেক তার ধনদৌলত। রসে ভরা আপেলগুলো দেখে সে রগড়
করে বলল:

‘সুন্দরীরা শোন, আপেল পেড়ে দেবে যে, আমার কনে হবে সে!’

তিন বোন অর্মানি আর্থালিপাথালি ছুট, এ আগে যায় তা সে আগে ছোটে।

আপেলগুলো ছিল নিচে হাতের নাগালে, হঠাত সেগুলো উঠে গেল উঁচুতে
মাথার ওপরে।

তিন বোন তখন বাঁকিয়ে পাড়তে চায় — ঝুরঝুরয়ে চোখে এসে পড়ে শুধু
পাতা। হাত বাঁড়িয়ে ছিঁড়তে চায় — ডালপালায় আটকে যায় বেণী। যতই
ঝাঁপায় যতই লাফায় — আপেল আর পাড়তে পারে না, ছড়ে যায় শুধু হাত পা।

তখন এগিয়ে গেল খুরুমাণি হাভ-রোশেচকা। নৃয়ে এল ডালপালা, নেমে
এল আপেলগুলো। বীর তরুণটিকে আপেল এনে দিল হাভ-রোশেচকা। তরুণ
তাকে বিয়ে করল। সেদিন থেকে স্থিস্থিতিলো ঘর করতে শোগল
হাভ-রোশেচকা।



ଆଲିଓନୁଶକା ବୋନ ଆର ଇଭାନୁଶକା ଭାଇ

এক ବୁଢ଼ୋ ଆର ବୁଢ଼ୀ । ତାଦେର ଏକଟି ମେଯେ ଆଲିଓନୁଶକା, ଏକଟି ଛେଲେ ଇଭାନୁଶକା ।

ବୁଢ଼ୋବୁଢ଼ୀ ମରୋ ଗେଲ । ସଂସାରେ ଆଲିଓନୁଶକା ଇଭାନୁଶକାର ଆର କେଉ ରାଇଲା ନା ।

ଆଲିଓନୁଶକା ଛୋଟ ଭାଇୟେର ହାତ ଧରେ କାଜେ ବୈରିଯେ ପଡ଼ିଲ । ଚଲେଛେ ତାରୀ ଦୂରେର ପଥ ଧରେ, ମନ୍ତ ମାଠ ପୌରିଯେ; ଭାରି ତେଣ୍ଟା ପେଲ ଇଭାନୁଶକାର ।

‘ବଡ଼ ତେଣ୍ଟା ପେରେଛେ ରେ ଦିଦି !’

‘ଦାଁଡ଼ା ଭାଇଟି, କୁଝୋ ଆସିବି ।’

ଯାଯ, ଯାଯ, ସୁର୍ଯ୍ୟ ମାଥାର ପରେ, କୁଝୋ ଅନେକ ଦୂରେ, କେବଳି ଡାପ ବାଡ଼େ, କେବଳି ଘାମ ବରେ । ଦେଖେ, ଏକଟା ଜଳଭରା ଗରିର ଖୁବି ।

‘এই জলটা খাই দিদি?’

‘না ভাই, খাস্নে, তাহলে বাছুর হয়ে যাবি!’

ইভানুশকা দিদির কথা মেনে নিয়ে চলল এগিয়ে।

সূর্য মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবলি তাপ বাড়ে, কেবলি ঘাম
মেনে। দেখে, একটা জলভরা ঘোড়ার খুর।

‘এই জলটা খাই দিদি?’

‘না ভাই, খাস্নে, ঘোড়ার বাচ্চা হয়ে যাবি!’

নিঃশ্বাস ফেলল ইভানুশকা। আবার চলল এগিয়ে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই, সূর্য মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবলি তাপ
বাড়ে, কেবলি ঘাম ঝরে। দেখে, একটা জলভরা ছাগলের খুর।

ইভানুশকা বলে:

‘আর পারি না দিদি, এই জলটা খাই?’

‘না ভাই, খাস্নে, ছাগলছানা হয়ে যাবি!’

ইভানুশকা এবার আর দিদির কথা না শুনে ছাগলের খুরের জলটা খেয়ে
ফেলল।

খেতেই ছাগলছানা হয়ে গেল ইভানুশকা ...

আলিওনুশকা ভাইকে ডাকে, ভাইয়ের বদলে ছুটে এল এক ধৰল পানা
ছাগলছানা।

আলিওনুশকা কাঁদতে লাগল। খড়ের গাদায় বসে বসে কাঁদে আর
ছাগলছানাটা তার চারপাশে লাফিয়ে বেড়ায়।

ঠিক সেই সময় এক সওদাগর যাচ্ছল ঐ রান্তা দিয়ে।

বলল, ‘কাঁদছ কেন, সুন্দরী কন্যে?’

আলিওনুশকা তার দৃঃখের কথা খুলে বলল।

সওদাগর বলল:

‘তুমি আমায় বিয়ে করো। সোনায় রূপোয় সাঁজিয়ে রাখো, আর ছাগলছানাটি
আমাদের কাছে থাকবে।’

ভেবেচিন্তে সওদাগরকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল আলিওনুশকা।

সুখেস্বচ্ছদন দিন কাটতে লাগল। ছাগলছানাটাও ওদের কাছেই থাকে।
আলিওনুশকার সঙ্গে একই থালা একই বাটি থেকে সব খায়।

একদিন সওদাগর বাড়ী নেই। হঠাতে কোথা থেকে এক ডাইনী এসে হাজির।

আলিওনুশকার জানলার নৌচে দাঁড়িয়ে আদর করে ডাকে, বলে: চল নদীতে
চান করব।

আলিওনুশকাকে নদীতে নিয়ে এল ডাইনী, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, গলায়
একটা বড়ো পাথর বেঁধে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীতে।

তারপর নিজে আলিওনুশকা সাজল, তার জামাকাপড় পরে বাড়ী ফিরে
গেল। কেউ ওকে ডাইনী বলে চিনতেও পারল না। সওদাগর বাড়ী ফিরল, কিন্তু
সেও কিছু ধরতে পারল না।

কেবল ছাগলছানাটা জানত কী হয়েছে। বেচারা মাথা নৌচু করে ঘুরে বেড়ায়,
খায় না, দায় না। সকাল সন্ধ্যায় নদীর পারে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর ডাকে:

‘আলিওনুশকা দিদিরে !

সাঁতরে আয় নদীরে...’

টের পেয়ে ডাইনী রোজ তার স্বামীকে বলে: মার বাপ, মেরে ফেল
ছাগলটাকে ... ছানাটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল সওদাগরের। কিন্তু ডাইনীটা
খালি ঘ্যান্ঘ্যান্ করে, খালি পেড়াপাঁড়ি করে, উপায় কী, তাই শেষপর্যন্ত সে
মায় দিল।

বলল, ‘বেশ, মার ওটাকে ...’

মন্ত্র আগুন জ্বালাল ডাইনী, বড়ো বড়ো কড়াই চাপল, বড়ো বড়ো ছুরিতে
শান পড়ল ...

ছাগলছানাটা দেখল তার মরণ ঘনিষ্ঠে। সওদাগরকে বলল:

‘মরার আগে আমায় একটু ছেড়ে দাও নদীতে জ্বাব, জল খাব, গা
ধোব।’

‘বেশ, যাও।’

ছাগলছানাটো দৌড়ে নদীর ধারে গিয়ে করুণস্বরে কাঁদতে লাগল:

‘আলিওনুশ্কা দিদিরে !
সাঁতরে আয় নদীরে।
আগুন জলে উনানে,
কড়াই চাপে ভিয়ানে,
বন বন বন ছুরি,
বুর্বুরি এবার মরি !’

আলিওনুশ্কা জলের ভিতর থেকে উত্তর দিল:

‘ইভানুশ্কা ভাইটি মোর !
তলায় ঠানে ভারী পাথর,
ঘাসেতে পা চেপে ধরে,
হলুদ বালি বুকের পরে।’

ছাগলছানাটো কোথায় খুঁজে না পেয়ে ডাইনীটা চাকরকে ডেকে বলল:

‘যা শীগুগির, ছাগলছানাটো আমায় খুঁজে এনে দে।’

নদীর কাছে গিয়ে চাকর দেখে, ছাগলছানাটো নদীর পার ধরে দৌড়চ্ছে আর
করুণস্বরে কাঁদছে:

‘আলিওনুশ্কা দিদিরে !
সাঁতরে আয় নদীরে।
আগুন জবলে উনানে,
কড়াই চাপে ভিয়ানে,
বন বন বন ছুরি,
বুর্বুরি এবার মরি !’

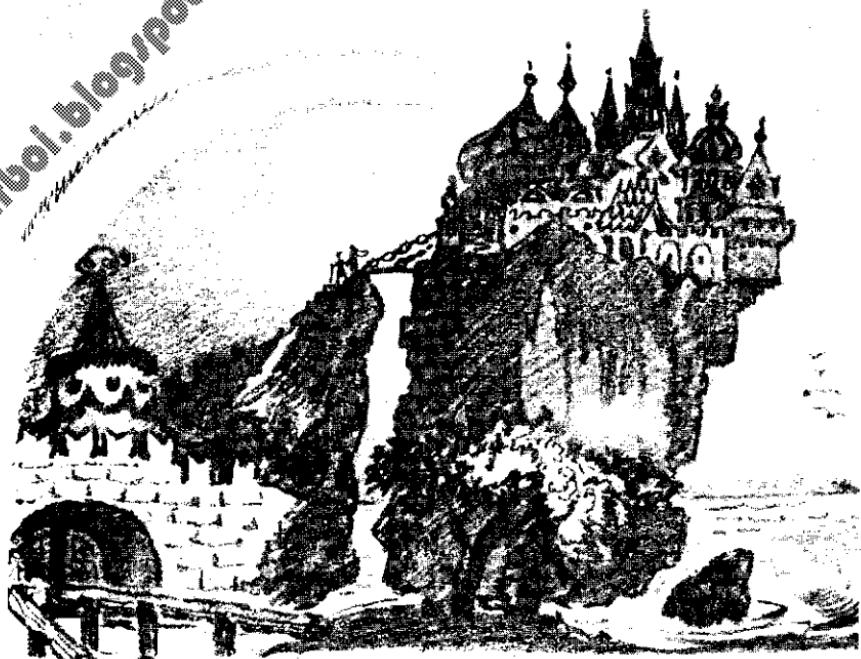
আর নদীর ভিত্তির থেকেও স্বর ভেসে আসছে:

‘ইভানুশকা ভাইটি মোর !
তলায় টানে ভারী পাথর,
ঘাসেতে পা চেপে ধরে,
হল্দ বালি বুকের পরে !’

চাকরটি তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে কী দেখেছে, কী শুনেছে — সব কথা মনিবকে
খুলে বলল। সওদাগর লোকজন জড়ো করে নদীর পারে চলে গেল। তারপর
রেশমের জাল ফেলে টেনে তুলল আলিওনুশকাকে। গলার পাথরটা খুলে,
বরণার জলে চান করিয়ে সুস্নদর করে কাপড় পরিয়ে দিল আলিওনুশকাকে।
জীবন ফিরে পেল আলিওনুশকা, রূপ তার আরো যেন ফুটে বেরুল।

ছাগলছানাটা আনন্দে তিনবার ডিগবাজী খেতেই আবার হয়ে গেল সেই
ছোট্ট খোকন ইভানুশকা।

ডাইনীটাকে তখন একটা বুনো ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে খোলা মাঠে
ছেড়ে দেওয়া হল।



ବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜକୁମାରୀ

ଅନେକଦିନ ଆଗେ ଏକ ରାଜା ଛିଲେନ । ତା'ର ତିନ ଛେଲେ । ସବାଇ ସଥନ ସାବାଲକ
ହଲ ତଥନ ଏକଦିନ ରାଜା ତାଦେର ଡେକେ ବଲଲେନ :

‘ଦେଖୋ ବାହ୍ରା, ଆମି ତୋମାଦେର ବିଯେ ଦିଯେ ଘରବାର ଆଗେ ନାତିନୀର
ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରେ ଯେତେ ଚାଇ ।’

ଛେଲେରା ଉତ୍ତର ଦିଲ, ‘ମେ ତୋ ଭାଲ କଥା ବାବା, ଆଶୀର୍ବାଦ କୁରଣ । ବଲନ,
କାକେ ବିଯେ କରବ ?’

‘ତୋମରା ପ୍ରତୋକେ ଏକ ଏକଟି କରେ ତୀର ନିରେ ଖୋଲୋ ମାଠେ ଗିରେ ଛୁଡିବେ ।
ଯାର ତୀର ଯେଥାନେ ପଡ଼ିବେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ମେଥାନେ ବାଁଧା ।

রাজপুত্রবাবাকে প্রশান্ত করে একটি করে তাঁর নিয়ে খোলা মাঠে চলে গেল। ধনুক টেনে তাঁর ছড়ল।

বড় রাজপুত্রের তাঁর পড়ল এক আমীরের বাড়ীর উঠোনে। আমীরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে। মেজ রাজপুত্রের তাঁর পড়ল এক সওদাগরের বাড়ীর উঠোনে। সওদাগরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে।

কিন্তু ছোট রাজপুত্র ইভানের তাঁর উচুতে উঠে কোথায় যে গেল, কে জানে। তাঁরের খোঁজে রাজপুত্র চলে আর চলে। যেতে যেতে একটা জলার কাছে এসে দেখে একটা ব্যাঙ তাঁরটা মুখে করে বসে আছে।

রাজপুত্র বলল, ‘ব্যাঙ, ও ব্যাঙ, আমার তাঁর ফিরিয়ে দাও।’

আর ব্যাঙ বলে, ‘আগে বিয়ে করো আমায়।’

‘সেকী, একটা ব্যাঙকে বিয়ে করব কী?’

‘বিয়ে করো, সেই যে তোমার ভাগ্য।’

রাজপুত্রের ভীষণ দ্রুত হল। কিন্তু কী আর করে। ব্যাঙটাকে তুলে বাড়ী নিয়ে এল। রাজা তিনটে বিয়ের উৎসব করলেন: বড়জনের বিয়ে দিলেন আমীরের মেয়ের সঙ্গে, মেজজনের সওদাগরের কন্যার সঙ্গে আর বেচারী রাজপুত্র ইভানের বিয়ে হল একটা ব্যাঙের সঙ্গে।

একদিন রাজা ছেলেদের ডেকে বললেন:

‘আমি দেখতে চাই, তোমাদের কোন বৌঝের হাতের কাজ ভালো। কাল সকালের মধ্যেই সবাই একটা করে জামা সেলাই করে দিক।’

ছেলেরা বাবাকে প্রশান্ত করে বেরিয়ে গেল।

রাজপুত্র ইভান বাড়ী গিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। ব্যাঙটা থেক্ষণ্যপূর্ণ করে এসে জিজ্ঞেস করে:

‘কী হল রাজপুত্র, মাথা হেঁট কেন? কোনো বিপদে পড়েছো বুঝি?’

‘বাবা বলেছেন, তোমায় কাল সকালের মধ্যে একটা জামা সেলাই করে দিতে হবে।’

ব্যাঙ বলল:

‘ভাবনা নেই, রাজপুত্র ইভান, বরং ঘৃষিয়ে নাও, রাত পোয়ালে বুঁদি থেলে।’

রাজপুত্র শুতে গেল। আর ব্যাঙ করল কী, থপ্থপ্যে বারান্দায় গিয়ে, বক্সের চামড়া খসিয়ে হয়ে গেল যাদুকরী ভাসিলিসা — রূপবতী সেই, তুলনা তার নেই!

যাদুকরী ভাসিলিসা হাততালি দিয়ে ডেকে বললে:

‘দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! কাল সকালের মধ্যেই আমায় একটা জামা সেলাই করে দেওয়া চাই, ঠিক যেমনটি আমার বাবা পরতেন।’

পরদিন সকালে রাজপুত্র ইভান উঠে দেখে, ব্যাঙ থপ্থপ্য করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টেবিলের ওপর তোয়ালে মোড়া একটি জাম। রাজপুত্রের আর আনন্দ ধরে না। জামাটা নিয়ে সোজা গেল বাপের কাছে। রাজা তখন অন্য ছেলেদের উপহার নিচ্ছেন। বড় ছেলের জামাটা নিয়ে রাজা বললেন:

‘এ জামা পরে দীন দরিদ্রে।’

মেজ রাজপুত্র জামা মেলে ধরতে রাজা বললেন:

‘এটা পরে বাইরে ষাণ্য়া চলে না।’

এবার রাজপুত্র ইভান তার জামাটা মেলে ধরল। সে জামায় সোনায় রূপোয় চমৎকার নক্কা তোলা। চোখ পড়তেই রাজা বললেন:

‘একেই বলে জামা! পালপার্বণে পরার মতো।’

বড় দু’ভাই বাড়ী যেতে যেতে বলাবলি করে:

‘রাজপুত্র ইভানের বৌকে নিয়ে আমাদের হাসাহাসি করা ঠিক হয়নি। ব্যাঙ নয় ও, মাঝাবিনী ...’

আবার রাজা তিন ছেলেকে ডেকে পাঠালেন।

‘তোমাদের বৌদের বলো কাল সকালের মধ্যে আমায় রুটি খালিয়ে দিতে হবে। কে সবচেয়ে ভাল রাঁধে দেখব।’

আবার ছোট রাজপুত্র ইভান মাথা হেঁট করে বাড়ী ফিরে এল। ব্যাঙ বললে:

‘রাজপুত্র, এত মনভার কেন?’

‘রাজামশাই বলেছেন কাল সকালের মধ্যে রুটি বানিয়ে দিতে হবে।’

‘ভাবনা করো না, রাজপুত্র। শুতে যাও, রাত পোষালে বুদ্ধি খোলে।’

অন্য বৌরা ব্যাঙকে নিয়ে আগে হস্যহাসি করেছে। এবার কিন্তু একটা বুড়ী দাসীকে পাঠিয়ে দিল দেখে আসতে, কী করে ব্যাঙ রুটি বানায়।

ব্যাঙ কিন্তু ভারি চালাফ। টের পেয়ে গেল ওদের মতলব। তাই ময়দা মেখে লেচি তৈরী করে নিয়ে চুল্লির উপরটা ভেঙে সবটা লেচি সেই গতে ঢেলে দিল। বুড়ী দাসী দোড়ে গিয়ে রাজবধূদের খবর দিলে। বৌরাও ঠিক তাই করতে লাগল।

তারপর ব্যাঙ কিন্তু ওদিকে লাঁফিয়ে বাইরে গিয়ে ঘাদুকরী ভাসিলসা হয়ে গেল। হাততালি দিয়ে ডেকে বলল:

‘দাসীবাঁদীয়া জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! সকালের মধ্যেই আমায় একটা শাদা ধৰ্মবে নরম রুটি বানিয়ে দিতে হবে, ঠিক যেমনটি আমি বাড়ীতে খেতাম।’

পরদিন সকালে রাজপুত্র উঠে দেখে টেবিলের ওপরে এক রুটি, গায়ে তার নানা রকম নর্মা: চারিপাশে কত শত মৃত্তি, উপরে নগর আর তোরণ।

রাজপুত্র ভারি খুশী। তোয়ালে মুড়ে রুটি নিয়ে গেল বাবার কাছে। রাজা তখন বড় ছেলেদের রুটি নিছিলেন। বুড়ী দাসীর কথা মতো বড় দুই ভাইয়ের বোঁ ময়দাটা সোজা চুল্লির ভিতর ফেলে দিয়েছিল। ফলে যা হল সে এক পোড়া-ধরা এক একটা তাল। রাজা বড় ছেলের হাত থেকে রুটিটা নিয়ে দেখেই পাঠিয়ে দিলেন নোকর মহলে। মেজ রাজপুত্রের রুটিরও সেই একই দশা হল। আর ছেট রাজপুত্র ইভান রাজার হাতে রুটি দিতেই রাজা বলে উঠলেন:

‘একেই বলে রুটি! এই হল পালগার্বণে খাওয়ার মতো।’

রাজা তার পরদিন তিন ছেলেকে বৌ নিয়ে নেমন্তন্ত্রে আসতে বলেছেন।

রাজপুত্র ইভান আবার মুখভার করে বাড়ী ফিরল, দৃঃখ্যে মাথা ছেঁট করল।
ব্যাঙ থপ্থপ্ত করে লাফায়:

‘গ্যাঙের গ্যাঙ, গ্যাঙের গ্যাঙ, রাজপুত্র, মন খারাপ কেন তোমার? বাবা বৰ্বৰ
কিছু মন্দ কথা বলেছেন!’

‘ব্যাঙ বৌ, শ্বাঙ বৌ, মন খারাপ না হয়ে করি কী? বাবা চান তোমাকে নিয়ে আমি নেমস্তন্মে যাই। কিন্তু লোকজনের সামনে তোমায় দেখাই কী করে?’

ব্যাঙ বলে:

‘রাজপুত্র, ভাবনা করো না; একাই ষেও নেমস্তন্মে, আমি পরে থাব। খট্খট্ট দুমদাম শব্দ হলে তয় পেও না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, “ও আমার ব্যাঙ বৌ আসছে কৌটোর চড়ে।”’

রাজপুত্র ইভান তাই একাই গেল। বড় দুই ভাই গেল গাড়ী হাঁকিয়ে, বৌ জাঁকিয়ে। কত বেশ, কত ভূষা, গালে রঙ, চোখে কাজল। সবাই ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

‘সেকী, তোর বৌকে আনলি না যে? একটা রূমালে করেও তো আনতে পারতিস, সাতা, রূপসীকে জোটালি কোথা থেকে? কোন খাল বিল তল্লাশ করে?’

তিন ছেলে নিয়ে, ছেলের বৌ নিয়ে, অর্তিথ অভ্যাগত নিয়ে রাজামশাই বসলেন এক জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে। ভোজ শুরু হবে। হঠাৎ শুরু হল খট্খট্ট দুমদাম আওয়াজ। সে আওয়াজে সারা রাজপুরী কেঁপে উঠল থরথরিয়ে, অর্তিথরা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু রাজপুত্র ইভান বললে:

‘অর্তিথ সজ্জন, ভয় নেই, আমার ব্যাঙ বৌ এল কৌটোর চড়ে।’

ছ’টা শাদা ঘোড়ায় টানা সোনা মোড়া এক জৰুড়ি গাড়ী এসে থামল রাজপুরীর অলিন্দে। গাড়ী থেকে নেমে এল যাদুকরী ভাসিলিসা, আকাশী নৈল পোষাকে তার ঝলমলে তারা, মাথায় জবলজবলে বাঁকা চাঁদ; সে কী রূপ, জানার নয়, বোঝার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়। রাজপুত্রের হাত ধরে নিস্তুরে গেল জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে।

সুরু হল পানভোজন, ফুর্তি। যাদুকরী ভাসিলিসা করম্পুক, গোলাশ থেকে পান করে বাঁকিটুকু ঢেলে দিলে বাঁ হাতার মধ্যে। মরালীর মাংসে কামড় দিয়ে হাড়গুলো রেখে দিল ডান হাতার মধ্যে।

দেখাদেখি বড় বৌ দু’জনও তাই করল।

খাওয়া হল, খাওয়া হল, শব্দে হল নাচ। যাদুকরী ভাসিলিসা রাজপুত্র ইভানের হাত ধরে এগিয়ে গেল। তালে তালে নাচে, ঘৰে ঘৰে নাচে ! সবাই একেবাবে অবাক। নাচতে নাচতে বাঁ হাত দোলালে ভাসিলিসা আর হয়ে গেল একটা সরোবর। ডান হাত দোলালে, অর্মানি শাদা শাদা মরালী জেগে উঠল। বজ্জি আর অর্তিথ অভ্যাগতেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্।

তারপর অন্য বৌরাও নাচতে উঠল। ওরাও এক হাত দোলাল, অর্তিথদের গা ভিজল শুধু। অন্য হাত দোলাল, ছড়িয়ে পড়ল শুধু হাড়। একটা হাড় গিয়ে লাগল একেবাবে রাজার চোখে। রাজা ভয়ানক রেগে তক্ষণি দৃই বৌকে বের করে দিলেন।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র ইভান করেছে কি, লুকিয়ে লুকিয়ে দৌড়ে বাড়ী গিয়ে ব্যাঙের চামড়াটা সোজা একেবাবে উন্মনে।

যাদুকরী ভাসিলিসা বাড়ী এসে ব্যাঙের চামড়া আর খুঁজে পায় না ! মনের দৃশ্যে একটা বেশে বসে রাজপুত্রকে বলল:

‘এ কি করলে রাজপুত্র ! আর যদি তিনিদিন অপেক্ষা করতে তবে আমি চিরদিনের মতো তোমার হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন বিদায়। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন দশের রাজ্য যেখানে অমর-কাশেচই থাকে, সেখানে আমার থেঁজ করো ...’

এই বলে যাদুকরী ভাসিলিসা একটা ধূসর রঙের কোকিল হয়ে উড়ে গেল জানলা দিয়ে। রাজপুত্র কাঁদে কাঁদে, তারপর উন্নৰ দক্ষিণ পূর্ব পর্শিয়ে প্রণাম করে চলে গেল যেদিকে দুচোখ যায়: যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বার করবে। গেল অনেক দূর, নাকি অল্প দূর, অনেক দিন, নাকি অল্প দিন কে জানে, বৃটের গোড়ালি ক্ষয়ে গেল, কাফতানের কলাই ছিঁড়ে গেল, টুপি হল ফাড়া ফাড়া। যেতে যেতে এক থুক্কথুক্কে ক্ষুদ্রে বুড়োর সঙ্গে দেখা।

‘কুশল হোক কুমার, কিসের খোঁজে নেমেছ, কোন পথে চলেছ ?

রাজপুত্র বুড়োকে তার বিপদের কথা খুলে বলল। ক্ষুদ্র বুড়ো বলল:

‘হায়, হায়, ব্যাঙের চামড়াটা পোড়াতে গেলে কেন, রাজপুত্র ? ওটা তোমার পরার নয়, ওটা তোমার খোলারও নয়। যাদুকরী ভাসিলিসা তার বাবার চেয়েও

বেশী যাদ, জ্ঞানের নয়ে জন্মেছিল। তাই ওর বাবা শাপ দিয়ে তিনবছরের জন্যে ওকে ব্যাঙ করে দিয়েছিলেন। যাক, এখন তো আর কোনো উপায় নেই। এই সূতোর গোলা নাও। এটা ঘৰ্দিকে গড়াবে সেদিকে ষেও, ভয় পেয়ো না।’

রাজপুত্র ইভান বৃক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে সূতোর গোলার পেছন পেছন চলল। সূতোর গোলা আগে আগে গাড়িয়ে চলে, আর রাজপুত্র পেছন পেছন যায়। একদিন এক খোলা মাঠে এক ভালুকের সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করে মারতে যাবে, হঠাৎ মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল ভালুক:

‘মেরো না রাজপুত্র, কোন্দিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।’

রাজপুত্র ভালুককে আর মারল না, এগিয়ে চলল। হঠাৎ দেখে একটা হাঁস মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করতেই হাঁসটা মানুষের গলায় বলে উঠল:

‘আমায় মেরো না, রাজপুত্র, কোন্দিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।’

রাজপুত্র হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একটা খরগোস দৌড়ে বেরিয়ে এল। রাজপুত্র ধনুক তুলে মারতে যাবে; খরগোসটা মানুষের মতো গলায় বলে উঠল:

‘আমায় মেরো না রাজপুত্র, কোন্দিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।’

রাজপুত্র খরগোসটাকে আর মারল না, এগিয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে রাজপুত্র নীল সমন্বয়ের ধারে এসে দেখে, একটা মাছ ডাঙার বালিতে পড়ে থাবি যাচ্ছে।

‘রাজপুত্র ইভান, দয়া করো আমায়, নীল সমন্বয়ে ছেড়ে দাও।’

রাজপুত্র মাছটা জলে ছেড়ে দিয়ে সমন্বয়ের তীর ধরে হাঁটতে লাগল। কর্তব্য কে জানে, সূতোর গোলা গড়াতে গড়াতে এল এক বনের কাছে। সেখানে রাজপুত্র দেখে মুরগীর পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর ফুগাগত হয়ে চলেছে।

‘কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও।’

কুংড়েরটা বলের দিকে পিঠ রেখে রাজপুত্রের দিকে ঝুঁথ করে দাঁড়াল।
রাজপুত্র ঘরে ফুকে দেখে, চিমনীর কাছে ন'থাক ইঁটের ওপর শয়ে আছে
ডাইনী, বাবা-ইয়াগা, তার খেঁরাকাঠি পা, দাঁত নেমেছে হেথা, নাক উঠেছে
হোথা। রাজপুত্রকে দেখে ডাইনীটা বলে উঠল, ‘তা আমার কাছে কেন, সজ্জন
কুমার? কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?’

‘ওরে পাজী বড়ী থুবড়ী, আগে খাওয়া দে, দাওয়া দে, চানের জন্যে জল
দে, তারপর শুধোস।’

বাবা-ইয়াগা রাজপুত্রকে গরম জলে চান করালে, খাওয়ালে দাওয়ালে, বিছানা
পেতে শোয়ালে। রাজপুত্র ইভান তখন বাবা-ইয়াগাকে বলল যে সে তার বৌ
যাদুকরী ভাসিলসাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাইনী বলল, ‘জানি, জানি! তোমার বৌ এখন অমর-কাশেই’ এর কবলে।
ওকে ফিরে পাওয়া বাপু মুশ্কিল। কাশেই’ এর সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ নয়।
ওর প্রাণ আছে এক ছঁচের ডগায়, ছঁচ আছে এক ডিমের ভিতর, ডিম আছে
এক হাঁসের পেটে, হাঁস আছে এক খরগোসের পেটে, খরগোস আছে এক পাথরের
সিন্দুকে, ‘সিন্দুক আছে এক লম্বা ওক গাছের মাথায় আর ঐ গাছটা অমর-
কাশেই’ এর চোখের র্মণ, কড়া পাহারা সেখানে।’

রাজপুত্র রাস্তারটা বাবা-ইয়াগার বাড়ীতেই কাটাল। পরদিন সকালে বড়ী
তাকে সেই লম্বা ওক গাছে বাবার পথটা দেখিয়ে দিল। অনেক পথ, নাকি অল্প
পথ, কতদূর রাজপুত্র গেল কে জানে; দেখে, দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা ওক
গাছ। শনশন করছে তার পাতা, সেই গাছের মাথায় একটা পাথরের সিন্দুক।
কিন্তু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

হঠাতে কোথা থেকে সেই ভালুকটা এসে করল কি, শেকড়শুকু উপজে দিলে
গাছটাকে। সিন্দুকটা দূর্ঘ করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চোঁচির। অর্মান সিন্দুক
থেকে একটা খরগোস বেরিয়ে যত জোর পারে দৌড়ে পালাতে গেল। কিন্তু সেই
আগের খরগোসটা ওকে তাড়া করে ধরে টুকুরো টুকুরো করে ছিঁড়ে ফেলল।
অর্মান খরগোসটার পেট থেকে একটা হাঁস বেরিয়ে সাঁকরে আকাশে উঠে গেল।

তখন দেখতে না দেখতে সেই আগের হাঁসটা তাকে ধাওয়া করে বাপটা মারতেই
ডিম পাড়ল হাঁসটা, আর ডিম পড়ল নীল সম্মুদ্রে।

রাজপুত্র তখন ভীষণ কাঁদতে লাগল। সম্মুদ্র থেকে কী করে এখন ডিম
খুঁজে পাবে! হঠাৎ দেখে, সেই মাছটা সাঁতার কেটে পারের দিকে আসছে, মৃথে
হৈছে হাঁসের ডিমটা। রাজপুত্র ডিমটা নিয়ে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভাঙ্গতে
লাগল ছঁচের ডগা। রাজপুত্র ভাঙ্গে আর উথালপাথাল করে অমর-কাশ্চেই,
দাপাদাপি করে। কিন্তু যতই করুক অমর-কাশ্চেই, ছঁচের ডগাটি ভেঙ্গে ফেলল
রাজপুত্র, মরতে হল অমর-কাশ্চেইকে।

রাজপুত্র তখন চলল কাশ্চেই'এর শ্বেতপাথরের পুরীতে। যাদুকরী
ভাসিলিসা ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে, চুমো খেল তার মধ্যালা মৃথে। তারপর
যাদুকরী ভাসিলিসা আর রাজপুত্র ইভান দৃঢ়নে নিজেদের দেশে ফিরে গেল।
সেখানে তারা সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল অনেক বৃংড়ো বয়স অবধি।



যান্ত্ৰকৰী ভাসিলিমাৰ কথা

এক চাষী বীজ বনল, ফসল হল আশ্চর্য, ঘৰে তোলাই দায়। আঁটি তুলে
বাড়াই মাড়াই কৰে ভৱ ভৱন্ত গোলায় তুলন। গোলায় তুলে চাষী ভৱল:
“সুখেম্বচ্ছন্দে দিন কাটবে এবাৰ।”

এদিকে এক ইন্দ্ৰ আৱ এক চড়াই সন্ধ্ৰ কৰল চাষীৰ গোলায় থিয়তায়ত।
দিনে বাব পাঁচেক কৰে আসে; পেট পূৰে খেয়ে চলে যায় — ইন্দ্ৰ যায় তাৱ
গৰ্তে আৱ চড়াই তাৱ বাসায়। এমনি কৱেই মিলেমিশে পতিন বছৰ কাটল
তাদেৱ। গোলাৰ সব দানা শেষ হল, রইল কিছুটা ক্ষুণ্ণকুণ্ডো পড়ে। ইন্দ্ৰ

দেখে ভাঁড়ার তো শেষ হয়-হয়, চড়াইটার ওপর বাটপারি করে একলাই বাকিটুকু দখল করা যাব। এই ভেবে মেঝেতে সিংধ কেটে বাঁক দানা সব মাটির নীচে জমা করল।

কিন্তু কালে চড়াই গোলায় খেতে এসে দেখে, একটা দানাও পড়ে নেই। বেচারা ফিরে নিয়েই ফিরে গেল। ভাবল:

“হতভাগা ইন্দুরটা আমায় ঠকিয়েছে! গিয়ে একবার পশুরাজ সিংহের কাছে নালিশ করি। পশুরাজ নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করবেন।”

এই ভেবে চড়াই উড়ে চলল সিংহের কাছে।

পশুরাজের কাছে গিয়ে চড়াই কুর্নিশ করে বলল, ‘সিংহমশাই, আপনি পশুরাজ! আমি আপনার এক পশু, দেঁতো ইন্দুরের সঙ্গে ছিলাম। গত তিনি বছর ধরে একই গোলা থেকে আমরা খেয়েছি, কোনদিন বাগড়া বিবাদ করিন। কিন্তু খাবার ফুরিয়ে আসতেই ইন্দুর আমাকে ভারি ঠকিয়েছে। গোলার মেঝেয় সিংধ কেটে বাঁক দানাগুলো সব মাটির নীচে চালান করে দিয়েছে। আমি উপোস করে মরছি। ন্যায় মতে আপনি বিচার করে দিন। আর যদি বিচার না করেন, তবে আমি আমাদের রাজা ঈগলমহারাজের কাছে আর্জি করব।’

‘তাই যা বাপু, যেখানে পারিস যা,’ সিংহ বলল।

চড়াই গিয়ে কুর্নিশ করলে ঈগলের কাছে। ইন্দুর কী রকম ঠকিয়েছে, আর পশুরাজই বা কেমন এক-চেথোমি করলেন -- সে সব কথা ঈগলমহারাজকে খুলে বলল।

শুনে ঈগলমহারাজ রেগে লাল। তক্ষণি সিংহের কাছে দ্রুতের হাতে খবর পাঠাল: কাল অম্বুক সময়, অম্বুক মাঠে তোমার সব জন্মজনোয়ার নিয়ে হার্জির থেকে, আর্মি ও আমার পাথীর দল জুটিয়ে তৈরী থাকব। যদ্ক হবে।

পশুরাজ সিংহ তাই চেঁড়া দিলে, পশুদের ডাক পড়ল যুক্তে ভুট্টল তারা কাতারে কাতারে। কিন্তু যেই ওরা খোলা মাঠে এসেছে অম্বিনি-মত ডানাওয়ালা সৈন্য নিয়ে মেঘের মতো ওদের ওপর বাঁপয়ে পড়ল ঈগল। তিনি ষষ্ঠা তিনি মিনিট ধরে যুক্ত চলল। জিত হল ঈগলমহারাজের। সারা মাঠ ভরে উঠল পশুদের লাসে। ঈগল তখন পাথীদের বাড়ী পাঠিয়ে নিজে চলে গেল এক

গহীন বনে, বসল। এক মন্ত্র ওক গাছের মাথায়, সারা গায়ে জখম, ভাবতে লাগল, কী করে আবার আগের শক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

এ স্বরে অনেক পূরোকালের কথা। সেই সময় একলা একলা বাস করত এক সওদাগর আর তার বো। তাদের একটিও ছেলে মেয়ে ছিল না। সকালে উঠে সওদাগর তার বোকে বলল:

‘গিন্ধী, বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, এক মন্ত্র পাখী এসেছে আমাদের কাছে। আস্ত ষাঁড় গিলে থায়, পুরো গামলা চুমুক দেয়। হাত থেকে তার রেহাই নেই, না খাইয়ে উপায় নেই। যাই, বনের মধ্যে গিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি।’

সওদাগর বন্দুক নিয়ে বনে চলে গেল। বনে বনে সে ঘুরলে অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, শেষকালে এল সেই ওক গাছটার কাছে। দেখে, একটা ঈগল, বন্দুক তুলে গুলি করতে যাবে। হঠাত মানুষের ভাষায় কথা কয়ে উঠল পাখী:

‘মেরো না ভালোমানুষের পো, আমায় মেরে তোমার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে আমায় বাড়ী নিয়ে চলো। তিন বছর তিন মাস তিন দিন আমায় খাইয়ো। তোমার ওখানে সেরে উঠিঃ, ডানায় পালক গজাক, গায়ে জোর ফিরুক, তখন তোমার উপকারের শোধ দেব।’

“ঈগল আবার কী দেবে?” এই ভেবে সওদাগর আবার বন্দুক তুলল।

ঈগল ফের সেই কথা বলে। আবার সওদাগর বন্দুক তুলল, বার বার তিনবার। ঈগল ফের বলল:

‘মেরো না ভালোমানুষের পো, তিন বছর তিন মাস তিন দিন আমায় খাইয়ে দাইয়ে তোমার বাড়ীতে রাখো। সেরে উঠিঃ, ডানায় পালক গজাক, গায়ে জোর হোক, তোমার সব উপকার শোধ দেব।’

দয়া হল সওদাগরের, ঈগলকে বয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে। বাড়ী এসেই সওদাগর তক্ষণ একটা ষাঁড় মেরে এক গামলা ভর্তি মধ্যে সরবরাহ করে রাখল। ভাবল এতে ঈগলটার বেশ কিছু দিন চলে যাবে। ঈগল কিছু এক প্রাসেই সব শেষ করে দিল। অনাহত অতিথি নিয়ে খুবই বিশ্বাস হল সওদাগরের, একেবারে নিঃস্মিল হয়ে পড়ল সে। তা দেখে ঈগল সওদাগরকে বলল:

‘শোনো বক্তা, খোলা মাঠটায় চলে যাও, দেখবে সেখানে আহত-নিহত অনেক পশু পড়ে আছে। জঙ্গুগুলোর ছাল ছাড়িয়ে দাঘী ফার নিয়ে সহরে বেচে এসো। প্রচুর টাকা হবে। সে টাকায় আমি থেঁরে, তুমি থেঁরেও বাকি থাকবে।’

সওদাগর খোলা মাঠে গিয়ে দেখে, সত্যিই আহত-নিহত অনেক পশু পড়ে আছে। তা থেকে দাঘী দাঘী চামড়া ছাড়িয়ে, সহরে ফার বেচে সওদাগর অনেক টাকা পেল।

এক বছর কেটে গেল। ঈগল সওদাগরকে বলল: যেখানে বড় বড় ওক গাছ আছে সেখানে আমায় নিয়ে চলো। সওদাগর গাঢ়ীতে ঘোড়া জুতল তারপর ঈগলকে নিয়ে গেল বড় বড় ওক গাছগুলোর কাছে। ঈগল মেঘের চেয়েও উঁচুতে উড়ে গেল। তারপর সৌ করে নেমে এসে যত জোরে সন্তুষ্ট তার ব্ৰক দিয়ে একটা ওক গাছে মারল ধাক্কা। গাছ দ্রুত টুকরো হয়ে গেল।

ঈগল বলল, ‘না সওদাগর, এখনও আমার আগের শক্তি ফিরে পাইনি, আরও পূরো একবছর আমায় খাওয়াতে হবে।’

দ্বিতীয় বছরও কেটে গেল। ঈগল আবার কালো মেঘের মাথার উপর উড়ে গেল, তারপর সৌ করে নেমে এসে ধাক্কা মারল গাছে। কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল গাছ।

‘আরও একবছর খাওয়াতে হবে সওদাগর, ভালোমানুষের পো, আগের শক্তি এখনও আসেনি গায়ে।’

এই ভাবে তিন বছর তিন মাস তিন দিন কেটে যেতেই ঈগল সওদাগরকে বলল:

‘আবার আমাকে সেই বড় বড় ওক গাছের কাছে নিয়ে চলো।’

সওদাগর ঈগলকে ওক গাছগুলোর কাছে নিয়ে গেল। এবার ঈগল আগের চেয়েও উঁচুতে উড়ে গেল, তারপর সবচেয়ে বড় ওক গাছটার পায়ে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। গাছটা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। কেঁপে উঠল সারা বন।

ঈগল বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ তোমায় সওদাগর, ভালোমানুষের পো,

এবার আমি আম্বের শক্তি ফিরে পেয়েছি। ঘোড়া ছেড়ে আমার পিঠে চড়ে
বসো। আমার বাড়ী নিয়ে গিরে তোমার সব উপকারের শোধ দেব।'

সওদাগর টেগলের পিঠে চড়ে বসল। টেগল নীল সমন্বের ওপর দিয়ে উঠে
গেল, একেবারে উঁচুতে। বলল:

'নীল সমন্বয় একবার দেখো তো, কত বড় ?'

সওদাগর উত্তর দিল, 'একটা বড় চাকার মতো।'

তখন মৃত্যুভয় দেখাবার জন্যে সওদাগরকে পিঠ থেকে ফেলে দিল টেগল,
কিন্তু সমন্বে পড়বার আগেই টেগল তাকে ধরে ফেলল। তারপর আরো উঁচুতে
উঠে গেল।

'এবার নীল সমন্বের দিকে তাকিয়ে বলো তো, কত বড় ?'

'মুরগীর ডিমের মতো।'

টেগল আবার এক ঝাঁকুনি দিয়ে সওদাগরকে ফেলে দিল, তারপর সমন্বে
পড়বার আগেই ধরে নিয়ে আরও উঁচুতে উড়ে চলল।

'এবার দেখো তো, নীল সমন্ব কত বড় ?'

'একটা দোপাটির বীচির মতো।'

এবার তৃতীয় বার টেগল এক ঝাঁকুনি দিয়ে সওদাগরকে ফেলে দিল
একেবারে সেই আকাশ থেকে। কিন্তু এবারও সমন্বে পড়ে যাবার আগেই ধরে
ফেলল। বলল:

'কী সওদাগর, ভালোমানুষের পো, এবার বুঝেছো মৃত্যুভয় কাকে বলে ?'

সওদাগর উত্তর দিল, 'বুঝেছি, মনে হয়েছিল এই শেষ।'

'আমার দিকে যখন বল্দুক তুলে তাগ করেছিলে আমারও তাই মনে
হয়েছিল।'

টেগল সওদাগরকে নিয়ে সমন্ব পেরিয়ে সোজা উড়ে চলল তামার পাণ্ডে।

টেগল বলল, 'এখানে আমার বড় বোন থাকে। আমরা তার অন্তর্থ হব। ও
যখন উপহার দিতে চাইবে, কিছু নিও না যেন, কেবল তামার কোটা চাইবে।'

এই বলে টেগল নেমে সোন্দা মাটিতে আছাড় খেতেই একটি সূন্দর তরণ
হয়ে গেল।

মন্ত একটা আঁতো পেরিয়ে চলেছে ওরা, বোন ওদের দেখতে পেয়ে ভারি
থৃশী হয়ে স্বাগত জানাল।

‘ভাটু আমার, সোনা আমার, তুই বেঁচে আছিস ! কোথা হতে এলি ? তিন
বছর তোকে দেখিনি। ভেবেছিলাম বুঁৰু বা গরেই গেছিস। কী তোকে খেতে
ধিই, কী দিয়ে আপ্যায়ন করিব ?’

‘আমায় শুধিরো না দিদি, আমায় জিজ্ঞেস করো না, আমি তো বাড়ীর
লোক। এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করো, একে শুধোও। আমায় তিন বছর খাইয়েছে,
দাইয়েছে, উপোসে রাখেনি !’

মেয়েটি ওদের এক নস্তী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে বসালে, থাওয়ালে,
আপ্যায়ন করলে। তারপর রহস্যভাবে নিম্নে গিয়ে তার অগুর্নতি ধনসম্পদ
দেখিয়ে সওদাগরকে বলল :

‘এই তোমার সোনা, রূপো, মণিমাণিক্য যত নেবে নাও !’

সওদাগর বলল :

‘সোনা চাই না, রূপো চাই না, মণিমাণিক্য চাই না ; আমায় কেবল তামার
কোটাটি দাও !’

‘যতই করো, সেটি হচ্ছে না। বাঁদরের গলায় কি আর মুক্তোর হার ?’

বোনের কথা শুনে ভাই খুব রেগে উঠল, তাই সে আবার ঝিগল হয়ে
সওদাগরকে পিঠে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

দিদি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, ‘ভাই আমার, সোনা আমার, ফিরে আয় ! না
হয় তামার কোটাই দেব, আপ্রতি করব না !’

‘এখন আর হয় না দিদি, দেরি হয়ে গেছে,’ এই বলে ঝিগল আকাশের ভিতর
দিয়ে উড়ে চলল।

ঝিগল বলল, ‘দেখো তো সওদাগর, ভালোমানুষের পো, কী দেখছো সামনে,
কী দেখছো পিছনে ?’

চারদিক দেখে সওদাগর বলে :

‘পিছনে জবলন্ত আগুন আর সামনে ফুটন্ত ফুল !’

‘তার মানে তামার রাজ্য পড়ে যাচ্ছে, আর রূপোর রাজ্য ফুল ফুটছে।

রূপোর রাজ্যে থাকে আমার মেজ বোন। আমরা তার অতিথি হব। সে ঘখন উপহার দিতে চাইবে আর কিছু নিও না, শুধু এই রূপোর কোটা চাইবে।'

পেঁচালু ঈগল, সৌনা মাটিতে আছাড় খেতেই আবার একটি সুন্দর তরুণ হয়ে পেল।

'মেজ বোন বলল, 'ভাই আমার, সৌনা আমার, কোথেকে এলি? কোথায় ছিলি, এতদিন আসিসনি কেন? কী দিয়ে তোর আপ্যায়ন করি?'

'আমায় জিজ্ঞেস করো না দিদি, শুর্খিয়ো না, আমি তো বাঢ়ীর লোক। এই ভালোমানুষের পোকে জিজ্ঞেস করো, এর আপ্যায়ন করো। আমায় পুরো তিন বছর খাইয়েছে, দাইয়েছে, উপোসে রাখেন।'

মেজ বোন ওদের নস্তী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে বসিয়ে খাওয়ালে, আপ্যায়ন করলে। তারপর রহস্যভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে বলল:

'এই রাইল সোনা, রূপো, মণিমাণিক্য যত খুশী সাধ মিটিয়ে নাও।'

'সোনা চাই না আমার, রূপো চাই না, মণিমাণিক্য চাই না; আমায় কেবল রূপোর কোটাটি দাও।'

'না ভালোমানুষের পো, সেটি হচ্ছে না। ও কোটা তোমার গলায় ঠেকে মরবে।'

বোনের কথায় রাগ হয়ে গেল ভাইয়ের, তাই ফের সে পাখী হয়ে সওদাগরকে পিঠে চাপিয়ে উড়ে গেল।

'ফিরে আয় ভাই, ফিরে আয়! না হয় কোটাই দেব, আপত্তি করব না!'

'আর হয় না দিদি, দৰি হয়ে গেছে।'

ঈগল আবার উড়ে চলল আকাশে।

'চেয়ে দেখো সওদাগর, ভালোমানুষের পো, কী দেখছো সামনে, কী দেখছো পিছনে?'

'পিছনে জবলস্ত আগুন, সামনে ফুটস্ত ফুল।'

'তার মানে রূপোর রাজ্য পড়ে যাচ্ছে, আর আমার সবচেয়ে ছোট বোনের সোনার রাজ্যে ফুল ফুটছে। আমরা ওর অতিথি হব। সে ঘখন উপহার দিতে চাইবে কিছু নিও না, শুধু তার সোনার কোটা চাইবে।'

উড়তে উড়তে সোনার রাজ্য পেঁচে ইংগল আবার সেই সূন্দর তরুণ
হয়ে গেল।

ছেটি বোন বলল, ‘ভাই আমার, সোনা আমার, কোথেকে এলি ? কোথায়
দিলি, একদিন আসিসনি কেন ? কী তোকে দিই, কী দিয়ে আপ্যায়ন করি ?’

‘আমায় জিজ্ঞেস করো না দিদি, আমায় আপ্যায়ন কোরো না, আমি তো
বাড়ীর লোক। জিজ্ঞেস করো এই সওদাগরকে। ও আমায় তিনি বছর খাইয়েছে,
দাইয়েছে, উপোসে রাখেনি।’

নস্তী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে বসিয়ে ঘেরেঁটি ওদের খাওয়ালে,
দাওয়ালে। তারপর রজ্জুভাঙ্গারে নিয়ে গিয়ে সওদাগরকে সোনা, রূপো,
মণিমাণিক্য সব দিতে চাইল।

‘কিছু চাই না আমার, কেবল ঐ সোনার কৌটাটি দাও !’

বোন বলল, ‘এই নাও। ভাগ্য ফিরুক তোমার। তুমই আমার ভাইকে তিনি
বছর খাইয়েছো, দাইয়েছো, উপোসে রাখেনি। আমার ভাইয়ের জন্যে তোমায় না
দিতে পারি এমন কিছু নেই।’

তাই সোনার রাজ্যে দিন কাটাল সওদাগর, ভোজ খেল। শেষে একদিন বিদায়
নেবার সময় এল।

ইংগল বলল, ‘বিদায় বন্ধু ! প্রটির কথা ভুলে যেয়ো, আর মনে রেখো, বাড়ী
না পেঁচনো পর্যন্ত কৌটা খুলবে না কিন্তু !’

সওদাগর বাড়ীর দিকে রওনা হল। গেল অনেক দিন, নাকি অল্প দিন,
যাস্ত হয়ে সওদাগর ভাবল একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। থামল সে এক বিড়ুটি
মাঠে, রাজা অদীক্ষিত ললাটের রাজ্যে। সোনার কৌটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে
সওদাগর, শেষে আর পারল না, খুলে ফেলল কৌটা। কৌটা খোলামাত্ত দেখে —
কোথা থেকে জেগে উঠল এক মন্ত রাজপুরী, কত তার সাজসজ্জা। লোকজন
দাসদাসী গিজগিজ করছে।

‘আজ্ঞা করুন হৃজুর, হৃকুম করুন ?’

সওদাগর খেল, দেল, বিছানায় গা এলাল।

রাজা অদীক্ষিত ললাট দেখে, তার রাজ্যে মন্ত এক রাজপুরী। দ্রুতকে
বললে:

‘দেখেছিসো তো, কোন শয়তান আমার রাজ্যে আমার অনুর্ভূতি ছাড়া প্রাসাদ
ভুলেছে। ভালোয় ভালোয় এক্ষণ্ণি যেন রাজ্য ছেড়ে চলে যায়।’

এই শাসান শুনে সওদাগর ভাবতে লাগল কী করে আমার রাজপুরীকে
কোটার ভিতরে ঢোকানো যায়। ভেবে ভেবেও কোন উপায় বের করতে
পারল না।

দ্রুতকে বলল, ‘খুশী হয়েই যেতে রাজি, কিন্তু কী করে যে যাব, সেটাই
জানি না।’

দ্রুত ফিরে গিয়ে রাজাকে সব কথা জানাল।

রাজা বললে, ‘ওর বাড়ীতে অজানা ষেটি আছে সেটি আমায় দিক, তবে
আমি প্রাসাদটা আবার সোনার কোটায় পুরে দেব।’

সওদাগর আর কী করে, প্রতিষ্ঠা করল বাড়ীতে তার অজানা যা আছে
সেটি দেবে রাজাকে। রাজা অদীক্ষিত ললাট তক্ষণ্ণি প্রাসাদটা মুড়ে কোটায়
চুকিয়ে দিল। সওদাগর কোটা নিরে রওনা হল বাড়ীমুখ্যে।

গেল অনেকদিন, নারিক অল্পদিন, এল বাড়ীতে। বৌ বলল:

‘এসো গো, ঘরে এসো ! কোথায় ছিলে ?’

‘যেখানে ছিলাম ছিলাম, এখন তো আর নেই।’

‘তুমি যখন বাড়ীতে ছিলে না, ভগবান তখন একটি খোকা দিয়েছেন
আমাদের।’

“এটাই তাহলে আমার অজানা জিনিস !” মনে মনে ভাবল সওদাগর, দ্রুত
হল তার, শোক হল।

বৌ বলল, ‘তোমার কী হয়েছে ? নারিক বাড়ীতে মন টিকছে না।’

সওদাগর বলল, ‘না, না, সে কথা নয়।’ তারপর সব ঘটনা বললে বলল
বৌকে।

ওরা তখন খুব দুঃখ করে কাঁদতে লাগল, কিন্তু চিরকাল তো আর কেউ
কাঁদে না।

সওদাগর তাই সোনার কোঁচ খুলল। দেখতে দেখতে তৈরী হয়ে গেল একটা
মস্ত জমকালো রাজপুরী, কত তার সাজসজ্জা। স্বীপুণ লিয়ে সওদাগর মনের
মূখে থাকে সেখানে। ধন তাদের উপচে ওঠে।

বেছের দশ পেরিয়ে গেল। রূপবান বৃক্ষিমান হয়ে বেড়ে উঠল সওদাগরপুণ্য,
যেমন রূপ তেমনি গুণ।

একদিন ঘনমরা হয়ে ঘূর্ম ভাঙল ছেলেটির, বাবাকে বলল:

‘রাজা অদীক্ষিত ললাট আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছে বাবা, বলেছে তার কাছে
যেতে। অনেকদিন থেকে নাকি অপেক্ষা করে আছে, আর চলে না।’

চোখের জল ফেললে বাবা মা। তারপর আশীর্বাদ করে ছেলেকে দূর দেশে
পাঠিয়ে দিলে।

ঘায় সে সড়ক বেয়ে, পথ উজিয়ে, শুন্নি কাস্তার, স্তেপের প্রাণ্ড,
পেরিয়ে এল এক গহন বনে। জন নেই, প্রাণী নেই। কেবল একটেরে একটি
কুঁড়ে, বনের দিকে মুখ আর সওদাগরপুণ্য ইভানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে।

‘কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ
করে দাঁড়াও।’

কুঁড়েঘর ইভানের কথামত বনের দিকে পিঠ করে ঘূরে দাঁড়াল।
সওদাগরপুণ্য ইভান ভিতরে চুকে দেখে, খেঁরাকাঠি পা, বাবা-ইয়াগা ডাইনী
শূয়ে। ইভানকে দেখে ডাইনী বলল:

‘রুশী মানুষ যে, না শুনেছি কানে, না হেরেছি নয়নে, আজ দোখ আপনা
থেকেই হাজির। কোথা থেকে আসছো কুমার, কোন পথ ধরেছো?’

‘ধিক তোকে, বৃঙ্গী ডাইনী, অর্তিথির জন্যে খাবার নেই, দাবার নেই শুরু
করেছিস জেরা।’

বাবা-ইয়াগা টেবিল সাজিয়ে খাবার দিলে, দাবার দিলে, ভোজন শেষে শুইয়ে
দিলে। ভোর হতেই জাগিয়ে তুলে শুরু করলে জিঞ্জাসাবাদী সওদাগরপুণ্য
ইভান আদ্যোপাস্ত সব বলে জিজেস করল:

‘বলো দিদিমা, রাজা অদীক্ষিত ললাটের কাছে যাব কী করে?’

‘ভাগো এ পথ’ এসেছিলে, সাক্ষাৎ যমের হাতে পড়তে। রাজার কাছে এতদিন যাওনি বলে সে ভীষণ রেগে আছে। শোনো বাল, এই পথ ধরে যাও, পুকুর পার্শ্ব। গাছের আড়লে লুকিয়ে থেকো। উড়ে আসবে তিনটি কপোত, তিনি সৃন্দরী, রাজার তিনি ঘেঁষে। এসে তারা ডানা খুলে রেখে, পোষাক ছেড়ে পড়ুন নাইবে। একজনের ডানায় দাগ-ফুট্টিক। সূযোগ বৃক্ষে সেই ডানা জোড়াটি ছিঁনিয়ে নিও। তারপর যতক্ষণ না তোমায় বিয়ে করতে রাজি হয় কিছুতেই ফেরত দিও না। ব্যস্ত, সব ঠিক হয়ে থাবে।’

বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইভান তার কথামত পথ ধরে চলতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে এল সেই পুকুরটার কাছে। লুকিয়ে রইল একটা ঝাঁকড়া গাছের আড়লে। কিছুক্ষণ পরে তিনটি কপোত উড়ে এসে নামল, একজনের ডানায় দাগ-ফুট্টিক। মার্টিতে আছাড় খেতেই তিনটি সৃন্দরী ঘেঁষে হয়ে গেল তারা। ডানা খুলে, জামা ছেড়ে তারা নাইতে নামল। ইভান ওদিকে ওঁৎ পেতে ছিল, চুপচুপ গৃটিগৃটি এগিয়ে দাগ-ফুট্টিক ডানা জোড়া চুরি করে নিল। দেখে, কী হয়। সৃন্দরীরা মান শেষ করে জল ছেড়ে উঠে এল পাড়ে। জামাকাপড় পরে ডানা লাঙিয়ে কপোত হয়ে উড়ে চলে গেল দূজন, কিন্তু বার্ক একজন পড়ে রইল, খুঁজতে লাগল হারানো ডানা।

খোঁজে, খোঁজে, আর বলে:

‘সাড়া দাও গো, বলো, কে আমার ডানা নিয়েছো। যদি বৃক্ষে মানুষ হও তবে তোমায় বাবা বলব, যদি মাঝবয়সী হও তবে তোমায় কাকা বলব, কিন্তু যদি রূপবান কমার হও তবে হবে আমার স্বামী।’

এই শুনে গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সওদাগরপুত্র ইভান।

‘এই নাও তোমার ডানা।’

‘বলো কুমার, বাগদত্ত বর আমার, কী তোমার কুল, কী গৈত্রী কোথায় চলেছো?’

‘সওদাগরপুত্র ইভান আমি, চলেছি তোমার বাবা, রাজা সুদীক্ষিত ললাটের কাছে।’

‘আমার নাম যোদ্ধকরী ভাসিলিসা !’

যাদুকরী ভাসিলিসা ছিল বাবার সবচেয়ে আদরের কন্যা। যেমন রূপ তের্মান তার বৃদ্ধি ভাসিলিসা ইভানকে রাজা অদীক্ষিত ললাটের দেশে বাবার পথ বলে দিয়ে নিজে কপোত হয়ে অন্য বোনদের পিছন পিছন উড়ে চলে গেল।

ইভান প্রাসাদে পেঁচলে রাজা তাকে লাগালে রান্নাঘরের কাজে: কাঠ কাটতে, জল তুলতে। রান্নাঘরের বাবুট কেলেভুংৰো কিন্তু ইভানকে দুচোখে দেখতে পারত না। রাজার কাছে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে ইভানের নামে লাগাতে শুরু করল সে।

হৃজুর মহারাজ, ঐ সওদাগরপুত্র ইভানটা বড়াই করে, সে নার্কি এক রাতের মধ্যে গহন বন কেটে, কাঠ গাদা করে, শিকড় উপড়িয়ে, জমি চষে, বীজ বুনে, গম কেটে, বেড়ে বেছে, পিষে, আপনার সকালে খাওয়ার জন্যে পিঠে তৈরী করে দিতে পারে।

রাজা বললে, ‘ডেকে আনো ওকে !’

এল ইভান।

শুনছি খুব নার্কি বড়াই করো: এক রাতের মধ্যে তুমি গহন বন কেটে, কাঠ গাদা করে, শিকড় উপড়িয়ে, জমি চষে, বীজ বুনে, গম কেটে, বেড়ে বেছে, পিষে, আমার সকালে খাবার মতো পিঠে তৈরী করে দিতে পারো। বেশ, কাল সকালের মধ্যেই করে দেখাও।

সওদাগরপুত্র ইভান যতই অস্বীকার করুক কোনো লাভ হল না। হৃকুম হয়ে গেছে, মানতেই হবে। উচু মাথা নীচু করে সে ফিরল রাজার কাছ থেকে। রাজার মেয়ে, যাদুকরী ভাসিলিসা তাকে দেখে বলল:

‘এত দৃঢ় কেন তোমার ?’

‘তোমায় বলে কী হবে, তুমি তো আর উপায় করতে পারবে না !’

‘বলা যায় না, হয়ত পারব !’

ইভান তখন ভাসিলিসাকে সব বলল, রাজা অদীক্ষিত ললাটকে কী কাজ করতে দিয়েছে।

‘ধ্যৎ, এ আবার একটা কাজ নার্কি, এতো ছেলেটো ! আসল কাজ পরে

আসছে। ঘুরতে যাও; রাত পোষালে বুর্জির খোলে, কাল সকালের মধ্যে সবই ঠিক হয়ে যাবো।

ঠিক স্বত্তন দু'পহর হতেই ভাসিলিসা প্রাসাদের রাঙা অলিন্দে দাঁড়াল। জোর গলায় শুক পাঠাল। এক মিনিটের মধ্যেই চারিদিক থেকে ভিড় করে এল ইজুর, দেখে লোকারণ্য। কেউ গাছ কাটে, কেউ মাটি খন্ডে শিকড় উপড়ায়, কেউ আম চয়ে। একজায়গায় বীজ পেঁতে, ততক্ষণে অন্য জায়গায় ফসল কেটে সুরু হয়ে যায় ঝাড়াই মাড়াই। ধূলোর মেঘে ছেয়ে গেল। সকালের মধ্যে ময়দা করে পিঠে ভেজে সারা। রাজাৰ সকালের জলযোগেৰ জন্যে ইভান নিয়ে গেল পিঠেগুলো।

'বাহবা!' বলে রাজা রাজভান্ডার থেকে ইভানকে পুরস্কার দেবার হকুম দিলে।

বাৰুচি কেলেভুয়ো এতে দেল আৱো রেগে। রাজাৰ কাছে সে নতুন করে লাগাতে গেল:

'ইজুর, ইভান বলছে সে নাকি রাতারাতি এমন একটা জাহাজ বানিয়ে দিতে পারে যেটা আকাশে উড়বে।'

'বেশ, তেকে নিরে এসো ওকে।'

ডেকে আনা হল সওদাগরপুত্র ইভানকে।

'তুমি নাকি আমার দাসদাসীৰ কাছে বড়াই করেছো, এমন একটা চমৎকার জাহাজ রাতারাতি বানাতে পারো যেটা আকাশেও উড়বে? অথচ আমায় সে কথা জানাওনি! শোনো, কাল সকালের মধ্যেই ওৱকম একটা জাহাজ তৈরী করে দিতে হবে।'

দৃঢ়খে ইভানের উচু মাথা হেঁট হয়ে নামল কাঁধের নীচে। রাজাৰ কমছ থেকে ফিরে এল যেন আৱ সে মানুষটি নয়। যাদুকরী ভাসিলিসা তাকে দেখে বললে:

'কীসেৰ দৃঢ়খ তোমার, কীসেৰ খেদ?

'দৃঢ়খ না করে কী কৰি বলো, রাজা আদেশ করেছে এবে রাতেৰ মধ্যে একটা উড়ো জাহাজ বানিয়ে দিতে হবে।'

‘এ আবার কাজ নাকি, এতো ছেলেখেলা ! আসল কাজ পরে। ধূমতে যাও তো ; রাত খোয়ালে বৃক্ষ খোলে, কাল সকালের মধ্যে সবই ঠিক হয়ে থাবে।’

ভাসিলিসা প্রাসাদের রাঙা অলিন্দে এসে জোরে জোরে ডাক পাঠান। এক মুহূর্তে চারদিক থেকে ছুতোরের দল ছুটে এল। তারপর ক্রাত, কুড়ুল নিয়ে ফুটি করে কাজে লেগে গেল সব। সকালের মধ্যে সব তৈরী।

রাজা বললে, ‘থাসা হয়েছে ! চলো আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।’

উঠে বসল ওরা দুজনে। সঙ্গে নিল বাবুচি কেলেভুষোকেও। জাহাজ উড়ে চলল আকাশ দিয়ে। রাজার বুনো জানোয়ারগুলোকে ধেখানে রাখা হত তার ওপর দিয়ে উড়ে থাবার সময় কেলেভুষো উর্ধ্ব মেরে ষেই দেখতে গেছে, অমনি ইভান তাকে এক ধাক্কা মেরে নাচে ফেলে দিল। চোখের পলকে জানোয়ারগুলো বাবুচিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল।

ইভান চীৎকার করে উঠল, ‘ঘাঃ ! কেলেভুষো যে পড়ে গেল !’

রাজা বললে, ‘চুলোয় ধাক গে ! কুকুরের মরণ কুন্তার মতোই !’

প্রাসাদে ফিরে এল ওরা।

রাজা বললে, ‘তোমার মাথায় বৃক্ষ আছে, ইভান। এবার তিন নম্বরের কাজ : একটা বুনো ঘোড়াকে বশ করতে হবে। যদি পারো, আমার মেরের সঙ্গে তোমার বিশ্বে দেব।’

থুশী হয়ে সওদাগরপুর ইভান ফিরে এল, ভাবল : “এ আর কঠিন কী।”

ফের যাদুকরী ভাসিলিসার সঙ্গে ইভানের দেখা। সব কথা শুনে ভাসিলিসা বলল :

‘বোঝোনি তুমি, ইভান। এবার সত্যই তোমার কাজটা সহজ নয়। কঠিন কাজ, কারণ বুনো ঘোড়াটি হচ্ছে স্বয়ং রাজা অদীক্ষিত ললাট নিজে। উড়িয়ে তোমার নিয়ে থাবে বাড়স্ত গাছের উচুতে, উড়স্ত মেঘের নাচের খোলা মাঠে ছড়াবে তোমার হাড়গোড়। এক্ষণ্ণ দৌড়ে কামার বাড়ী থাও। বলো একটা তিন পদ্ম ওজনের লোহার হাতুড়ি বানিয়ে দিতে। ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে চড়ে বসেই ওটার মাথায় বাঁড়ি মেরে ঠাণ্ডা রেখো।’

পরদিন আন্দুল থেকে সহিসরা বের করে নিয়ে এল একটা বৃন্মো ঘোড়া।
থবে রাখাই দালি কী তার ডাক, কী তার চাঁট! সওদাগরপুত্র ইভান পিঠে চড়ে
বসতেই ঘোড়াটা উঠে গেল একেবারে বাড়স্ত গাছের উচুতে, উড়স্ত মেঘের
নীচুতে ছুটতে লাগল বাতাসের আগে আগে। ইভান কিন্তু শক্ত হয়ে বসে
ঘোড়াটার মাথায় হাতুড়ি মেরে চলল ফ্রাগত। শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে ঘোড়াটা
মামল সেঁদা ঘাটিতে। সওদাগরপুত্র ইভান ঘোড়াটা সহিসদের কাছে ফেরত
দিয়ে একটু বিশ্রাম করে প্রাসাদে ফিরে গেল। গিয়ে দেখে, রাজা অদীক্ষিত
লগাটের মাথায় পটি বাঁধা।

‘বৃন্মো ঘোড়াটকে বাগ মানিয়েছি, মহারাজ! ’

‘বেশ, কাল এসো। বউ পছল করে নিও। আজ আমার মাথাটা ধরেছে। ’

পরদিন সকালে যাদুকরী ভাসিলিসা সওদাগরপুত্র ইভানকে বলল:

‘আমরা রাজার তিন মেয়ে। রাজা তিনজনকেই মাদী ঘোড়া বানিয়ে দিয়ে
তোমার বলবে বৌ বেছে নিতে। ভালো করে নজর রেখো, দেখবে আমার
লাগামের একটা মণি প্যাটপ্যাট করছে। তারপর রাজা আমাদের কপোত করে
দেবে। বোনেরা দানা খুটে খুটে খাবে। আর থেকে থেকেই আমি ডানার বাপটা
ঘারব। তিন বারের বার আমাদের তিন কন্যে করে দেবে, তিনজনের একই মৃৎ,
মাথায় এক, একই রকম চুল। আমি ইচ্ছে করে রূমাল নাড়াব; তাই দেখে চিনে
নিও। ’

যাদুকরী ভাসিলিসা যা বলেছিল তাই হল। রাজা তিনটে ঠিক একরকমের
মাদী ঘোড়া এনে সার করে দাঁড় করিয়ে দিলে।

‘যেটা খুশী বেছে নিও! ’

সওদাগরপুত্র ইভান ভাল করে নজর করলে; দেখল, একটার লাগামের মণি
প্যাটপ্যাট করছে। ইভান সেই লাগামটা ধরে বলল:

‘এই আমার বৌ! ’

‘ভালোটা ছেড়ে খারাপটাই বেছেছো। ’

‘তা হোক, এই আমার ভালো। ’

‘আর একবার বাছো। ’

তিনটে কপোত ছাড়ল রাজা, পালকে পালকে অবিকল এক, দানা ছড়িয়ে
দিলে। ইভান দেখল একটা কপোত কেবাল ডানার ঝাপটা ঘারছে। ইভান তার
ডানা চেপে ধরল।

‘এই আঘার বৌ !’

‘ঠিকটিকে ধরলে না। পরে পন্থাবে। বরং বারবার তিনবার বেছে দেখো।’

রাজা তিন কন্যা এনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তিনজনের একই মূখ, মাথায়
এক, একই রকম চুল। ইভান দেখল একজন রুম্মাল নাড়াচ্ছে। অর্মান ইভান গিয়ে
তার হাত চেপে ধরল।

‘এই আমার বৌ !’

আর উপায় নেই। রাজা অদীক্ষিত ললাট তাই ইভানের হাতেই যাদুকরী
ভাসিলিসাকে সম্প্রদান করল। বিয়ে হয়ে গেল খুব ধূমধাম করে।

গেল অল্পদিন, নাকি অনেকদিন, সওদাগরপুত্র ইভান ঠিক করল এবার
ভাসিলিসাকে নিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে যাবে। ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে অঙ্ককার
রাতে বেরিয়ে পড়ল ওরা দৃজন। পরদিন সকালে রাজা টের পেলে, ধরে
আনবার জন্যে লোক ছুটল।

ভাসিলিসা স্বামীকে বলল, ‘সৌন্দা মাটিতে কান পাতো দেখি, কী শুনতে
পাচ্ছো বলো !’

ইভান মাটিতে কান পেতে বলল:

‘ঘোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি।’

ভাসিলিসা অর্মান স্বামীকে একটা ছোট সবজি ক্ষেত বানিয়ে দিয়ে নিজে
একটা বাঁধাকর্পি হয়ে গেল। যারা ধরতে এসেছিল তারা রাজার কাছে কিনে
গেল শূন্য হাতে।

‘ইজ্জুর মহারাজ, খোলা মাঠে কিছুই দেখলাম না, শুধু একটা সবজি ক্ষেত
ছাড়া, সে ক্ষেতের মধ্যে একটা বাঁধাকর্পির মাথা।’

‘যাও, এই বাঁধাকর্পিটাই কেটে নিয়ে এসো। এ ওই মেষেজই একটা যাদু।’

লোকজন আবার ছুটল ওদের ধরতে। ইভান আঘার সৌন্দা মাটিতে কান
পেতে শুনল। বলল:

‘ঘোড়ার ডাক শনতে পাইছি।’

ভাসিলিসা তখন নিজে একটা কুয়ো হয়ে গেল। আর ইভানকে করে দিল একটা বলমলে বাজপাখি। পার্থিটা কুয়ো থেকে জল খেতে লাগল।

জ্বোকজনেরা কুয়োর পাড়ে এসে দেখে, রাস্তাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। তাই ফিরে গেল আবার।

‘ইজ্জুর মহারাজ, খোলা মাঠে কিছুই দেখলাম না, কেবল একটা কুয়ো আর তার পাশে একটা বলমলে বাজপাখি বসে জল খাচ্ছে।’

এবার রাজা অদীক্ষিত ললাট নিজেই বেরল।

যাদুকরী ভাসিলিসা ইভানকে বলল, ‘এবার দেখো তো, মাটিতে কান পেতে কী শুনতে পাও!'

‘ওরে বাবা! আগের চেয়েও যে জোরালো ধূপধাপ, গুরগুর !’

‘তার মানে এবার বাবা আসছে নিজে। কী করিঃ? কী উপায়?’

‘আমার মাথাতেও আর কিছু আসছে না।’

যাদুকরী ভাসিলিসার কাছে ছিল তিনটি জিনিস: একটা বুরুশ, একটা চিরণী আর একটা তোয়ালে। সেগুলোর কথা মনে পড়তে ভাসিলিসা বলে উঠল:

‘আছে রাজা অদীক্ষিত ললাটের হাত থেকে বাঁচার উপায়।’

ভাসিলিসা বুরুশটা দোলাতেই হয়ে গেল একটা বিরাট গহন বন, গাছে গাছে এত ঠেসাঠেসি যে হাত গলে না। তিন বছরেও সারা বনটা ঘুরে আসা যাবে না। রাজা অদীক্ষিত ললাট এখানে কামড়ায়, সেখানে কামড়ায় শেষ পর্যন্ত অতিক্ষেত্রে একটু পথ করে নিয়ে আবার ধাওয়া স্বরূপ করল। রাজা তদের প্রাণ ধরে ধরে, হাত বাড়ালেই হয়; ভাসিলিসা তার চিরণীটা দুলিয়ে দিল — শুধু পথ আটকে দাঁড়াল একটা বিরাট খাড়া পাহাড়। পায়ে হেঁটে ডিঙ্গনো ধায় না, ঘোড়ায় চড়ে পেরনো ধায় না।

রাজা পাহাড়টার গায়ে সুড়ঙ্গ কাটতে স্বরূপ করল। কাটতে কাটতে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ হয়ে যেতেই রাজা আবার ধাওয়া স্বরূপ করল। ভাসিলিসা তখন তোয়ালেটা পিছন দিকে দোলাতেই শুধু একটা বিরাট সমুদ্র

হয়ে গেল। পোড়া ছুটিয়ে তীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল রাজা — রাস্তা বন্ধ।
ফিরে যেতে হল।

‘ভাসিলিসা আর ইভান যখন প্রায় এসে গেছে ইভান বলল:
‘আমি আগে গিয়ে বাবা-মাকে খবর দিই, তুমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা
করো।’

যাদুকরী ভাসিলিসা বলল, ‘শুধু একটা কথা মনে রেখো কিন্তু, বাড়ী
পেঁচে সবাইকে চুমো দিও। কিন্তু ধর্মমাকে নয়, ধর্মমাকে চুমো দিলেই আমার
কথা সব ভুলে যাবে।’

সওদাগরপুত্র ইভান বাড়ী ফিরে এল, খুশী হয়ে চুমু খেল সবাইকে।
ধর্মমাকেও চুমু দিল, ভুলে গেল যাদুকরী ভাসিলিসার কথা। আর বেচারী
ভাসিলিসা একা একা রাস্তায় অপেক্ষা করে; ইভান আর আসে না। তাই সহজে
গিয়ে এক বৃক্ষীর বাড়ী কাজ নিল ভাসিলিসা। এদিকে সওদাগরপুত্র ইভানের
বিয়ে করার ইচ্ছে হল। একটি কনে পছন্দ করে বিরাট ভোজের আয়োজন করতে
লাগল।

যাদুকরী ভাসিলিসা তা জানতে পেরে ভিথার্বী মেজে সওদাগরের বাড়ী
গেল ভিক্ষে করতে।

সওদাগরের বৌ বলল, ‘একটু দাঁড়াও, বাছা; তোমায় একটা ছোটো পিঠে
ভেজে দিই। বিয়ের বড়ো পিঠেটা কাটবার আমার ইচ্ছে নেই।’

‘যা দাও মা, তাই ভাল। মঙ্গল হোক তোমার।’

বড়ো পিঠেটা কিন্তু পূর্ণ গেল, আর সেই ছোটো পিঠেটা হল ভারি সুস্থির।
সওদাগরের বৌ ছোটো পিঠেটা ভোজের জন্যে রেখে পোড়া পিঠেটা দিল
ভিথার্বীকে। ছোটো পিঠেটা টেবিলের ওপর কাটতেই ঝুঁড়ঁৎ করে ভোরয়ে এল
এক জোড়া ঘূঢ়ু।

ঘূঢ়ু তার জুড়ীকে বলে, ‘আমায় একটা চুমু দাও না।’

‘না, দেব না। তাহলে তুমিও আমায় ভুলে যাবে, সওদাগরপুত্র ইভান যেমন
ভুলে গেছে যাদুকরী ভাসিলিসাকে।’

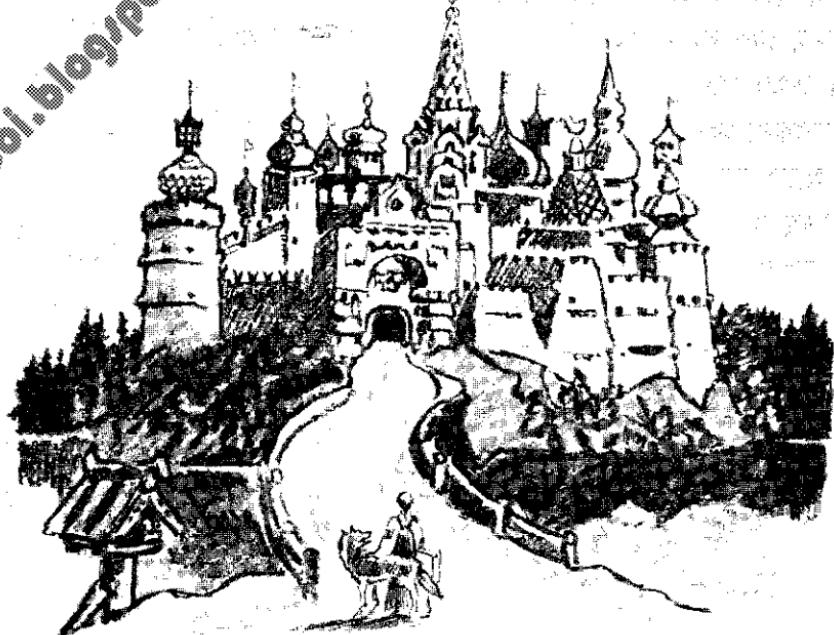
ঘৃঘৃটা বারব্যাস তিনবার বলল, ‘চুমো দাও না !’
‘না, দেব না। তবে তুমি আমায় ভুলে যাবে, সওদাগরপুত্র ইভান যেমন
ভুলে গেছে বাদুকরী ভাসিলিসাকে !’

অবশ্যই মনে পড়ে গেল ইভানের, চিনতে পারলে কে ঐ ভিখারী মেয়েটি।
বাদুকমাকে অতিরিক্ত অভ্যাগতকে সে বললে:

‘এই আমার বৌ !’

‘তা তোমার যখন এক বৌ আছেই, তখন তার সঙ্গেই ঘর করো !’

নতুন কর্ণেটিকে তারা দামী দামী উপহার দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। আর
সওদাগরপুত্র ইভান তার যাদুকরী ভাসিলিসার সঙ্গে মনের সূর্খে ঘরকম্বা করতে
লাগল। ধনধান্যে ঘর ভরা, দৃঢ়খের মুখ দেখে না।



ঝলমলে বাজি ফিনিস্ত

এক যে ছিল চাষী। তিন মেয়ে রেখে মারা গেল চাষীর বো। চাষী ভাবল
একটা বি রাখা যাক, সংসারের কাজকর্ম করবে। কিন্তু চাষীর সবচেয়ে ছোট
মেয়ে মারণ্যকা বলল:

‘বি আর রেখো না, বাবা। আমি একাই সংসার দেখব।’

তাই সই। মারণ্যকাই সংসার দেখে। সবেতেই তার হাত। সবেতেই সে
দড়। মারণ্যকাকে খুব ভালবাসে চাষী। এমন চালাক চতুর কাজের মেয়ে পেয়ে
তার ভারী আনন্দ। দেখতেও পটের সুন্দরী! তার কোথা বোনেরা কিন্তু হিংসুটে

আর লোভী। প্রদকে রূপ নেই আর ফ্যাশনের ঘটা, সারাক্ষণ রং মাখে, রংজ মাখে, সেজেছাইজে বসে থাকে। এ সাজ, সে সাজ, এ জুতো, সে জুতো, এ রংগাল, সে রংগাল।

একদিন বৃক্ষে চাষী বাজারে যাবে। মেরেদের ডেকে বলল:

‘তোদের কার জন্যে কী আনব, বাছারা? কী পেলে খুশী হ'ব?’

বড় দু’বোন বলল:

‘একটা করে শাল এনো — ফুল-তোলা, সোনা-ঝলা।’ মারবুশকা কিন্তু চুপ করে থাকে। বাপ জিজেস করল:

‘আর তোর কী চাই, মারবুশকা?’

‘আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিরিস্তের একটা পালক এনো।’

চাষী বাজার থেকে দুটো শাল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু পালক আর পেল না।

পরের বার চাষী আবার বাজারে গেল। বলে:

‘কী চাই তোদের, ফরমাশ কর।’

বড় দুজন খুশী হয়ে বলল:

‘আমাদের জন্যে এক জোড়া করে রংপোর নাল বসানো জুতো এনো।’

মারবুশকা কিন্তু আবার বলে:

‘আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিরিস্তের একটা পালক এনো।’

সারাদিন বাজারে ঘুরে ঘুরে চাষী দু’জোড়া জুতো কিনলে। কিন্তু ঝলমলে বাজ ফিরিস্তের পালক কিছুতেই পেল না। পালক ছাড়াই ফিরে এল।

বারবার তিন বার। চাষী আবার চলল বাজারে। বড় দুই শেষে বলে:

‘আমাদের জন্যে দুটো নতুন পোষাক এনো, বাবা।’

কিন্তু মারবুশকা আবার বলে:

‘আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিরিস্তের পালক এনো।’

বেচারী চাষী সারা দিন ঘুরে বেড়াল। কিন্তু পালক কোথাও পেল না। সহর হেঁড়ে বেরতেই এক বৃক্ষের সঙ্গে দেখা।

‘কী দাদু, ভালো তো?’

‘ভালোই রহছা ! চললে কোথায় ?’

‘বাড়ী ছিরছি দাদু, গ্রামে। কিন্তু ভারী ঘৃশ্কিলে পড়েছি। ছোট মেয়ে
বেরবুরি কৈময় বলে দিয়েছিল বলমলে বাজ ফিনিস্টের একটা পালক আনতে।
তা আমি কোথাও খুঁজে পেলুম না।’

‘তেমন পালক আমার একটা আছে। এ কিন্তু যাদু পালক। তবে ভালো
লোককে দিতে বাধা নেই।’

বুড়ো বের করে চাষীর হাতে দিল পালকটা — সাধারণ পালক। যেতে যেতে
চাষী ভাবে, “এর মধ্যে ভালো কী দেখল মারুশকা ?”

বাড়ী পৌঁছে চাষী মেয়েদের জিনিস ভাগ করে দিল। বড় দুই বোন তাদের
নতুন সজ্জায় সাজে আর মারুশকাকে দেখে হাসে:

‘যা বোকা ছিল সেই বোকাই রয়ে গেল ! এবার পালকটি মাথায় গোঁজ,
চেৎকার দেখাবে !’

মারুশকা উত্তর না দিয়ে সরে গেল। তারপর বাড়ীর সকলে যখন
ঘূর্মিয়ে পড়েছে, মারুশকা তখন পালকটা মেঝেয় ফেলে আস্তে আস্তে
বলে কি:

‘লক্ষ্মী ফিনিস্ট — বলমলে বাজ, পথ চাওয়া বর এসো গো আজ !’

অর্মিন এক অপরূপ সুন্দর কুমার এসে হাজির। ভোর হতেই কুমার মেঝের
আছাড় খেয়ে আবার বাজপাখি হয়ে গেল। মারুশকা জানলা খুলে দিতেই
পাখিটা উড়ে গেল নীল আকাশে।

পর পর তিনি রাস্তির মারুশকা কুমারকে ডেকে আনল। সার্দান পে
বাজপাখি হয়ে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু ষেই রাত হয়ে আসে অর্মিন
মারুশকার কাছে এসে দাঁড়ায় অপূর্ব এক সুন্দর কুমার।

চতুর্থ দিন হিংস্টে দুই বোন তা দেখে ফেললে। বাষ্পন কাছে গিয়ে
নালিশ করলে।

চাষী বলল, ‘তোরা বাপু নিজেদের চৰকার কেল তো !’

বোনেরা ভাবে, “বেশ, দেখা যাবে কী দাঁড়ায় ?”

কতগুলো মারালো ছুরির জানলার বাজুতে পুঁতে রেখে লুকিয়ে রাইল
তারা।

উচ্চারণে সেই ঘৰমলে বাজপাখি। জানলা অবধি আসে, কিন্তু মারুশকার
ঘৰে আর দুকতে পারে না। জানলার কাঁচে পাখিটা সমানে ঝাপটা মেরে ঢেলে।
কিন্তু তার কেটে কেটে ঘায়। মারুশকা কিন্তু কিছুই জানে না। অঘোরে ঘূমচ্ছে।
পাখিটা তখন বলে উঠল:

‘যে আমায় চায়, সে আমায় পাবে, কিন্তু সহজে নয়। তিনজোড়া লোহার
জুতোর তলা ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙ্গে, তিনটে লোহার টুঁপ ছিঁড়ে
তবে।’

এই কথা মারুশকার কানে ঘেতেই সে লাফিয়ে উঠল, চাইল জানলার দিকে,
কিন্তু বাজপাখি নেই, জানলায় শুধু রক্তের দাগ। খুব কাঁদতে লাগল মারুশকা।
চোখের জলে রক্তের দাগ মুছে নিল, হংসে উঠল আরও সুন্দর।

বাবার কাছে গিয়ে মারুশকা বলল:

‘আমায় বকো না বাবা, আমি চললাম দূরের পথে। বেঁচে থাকি দেখা হবে।
না থাকি, তবে সেই আমায় নির্বাক।’

খুব কষ্ট হচ্ছিল চায়ীর তবু শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হল তার আদরের
গেরেটিকে।

মারুশকা তাই তিনজোড়া লোহার জুতো, তিনটে লোহার দণ্ড, আর তিনটে
লোহার টুঁপ ফরমাশ দিল। তারপর তার চিরবাসীত বক্ষ ঘৰমলে বাজ
ফিনিষ্টকে খুঁজতে পার্ডি দিল দূরের পথে। চলল সে খোলা মাঠ ভেঙ্গে, খুন
বন পেরিয়ে, খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে। পাখিরা ওকে গান শুনিয়ে খুশী করে,
বুরগা ওর সুন্দর ধৰধৰে মুখখানি ধূয়ে দেয়, ঘন বন ওকে ঢেকে নেয়।
মারুশকার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। পাঁশটে নেকড়ে, ভালুক,
শেয়াল — জঙ্গলের যত জন্ম সবাই ছুটে আসে তার কাছে। হাঁটিতে এক
জোড়া লোহার জুতো কষে গেল, একটা লোহার দণ্ড জান্ডল, একটা লোহার
টুঁপ ছিঁড়ল।

মারুশকা কুঁড়ে বনের একটা ফাঁকায় এসে দেখে, ঘুরগীর পায়ের উপর
একটা ছোট কুঁড়ের ঘূরে চলেছে।

‘কুঁড়ের, ও কুঁড়ের, বনের দিকে পিঠি ফিরিয়ে আমার দিকে ঘুর্খ করে
দাঁড়াও! ভেতরে থাব, রুটি থাব!’

কুঁড়েরটা তখন বনের দিকে পিঠি ফিরিয়ে মারুশকার দিকে ঘুর্খ করে
দাঁড়াল। মারুশকা ঘরে ঢুকে দেখে, বসে আছে এক ডাইনী, বাবা-ইয়াগা —
খেঁরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘর জোড়া তার ঠ্যাং, ঠেঁটি উঠেছে তাকে, ছাত
ঠেকেছে নাকে।

ডাইনীটা মারুশকাকে দেখেই বলে উঠল:

‘হাউমাউথাউ, রুশীর গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার,
নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?’

‘ঝলমলে বাজ ফিনিষ্টের খোঁজে বেরিয়েছি, ঠাকুমা।’

‘সে যে অনেক দূর গো, সুন্দরী। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন নয়ের
বাজে। রাণী-ঘায়াবিনী তাকে যাদু করা সরবৎ খাইয়ে বিয়ে করেছে। তবে
আমি তোকে সাহায্য করব। এই নে একটা রূপোর পিরিচ আর একটা সোনার
ডিম। তিন নয়ের বাজে গিয়ে রাজবাড়ীর দাসীর কাজ নিস। কাজের পর এই
ডিমটা রাখিস পিরিচে। নিজে থেকেই ডিমটা ঘূরবে। কিনতে চাইলে এমনিতে
দিস না। ঝলমলে বাজ ফিনিষ্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।’

মারুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আঁধার হয়ে উঠল
বন, হয়ে উঠল ভয়ঞ্চক। পা ফেলতেও ভয় করে মারুশকার। এমন সময় এল
এক বেড়াল। লাফিয়ে মারুশকার কোলে উঠে ঘড়ঘড় করে বললে:

‘ভয় পেও না মারুশকা, এগিয়ে যেও। যত এগোবে তত ভয়ানক হয়ে উঠবে
বনটা। কিন্তু থেমো না আর খবরদার, পিছনদিকে তাকিও না।’

বেড়ালটা মারুশকার পায়ে গা ঘষে চলে গেল। মারুশকা তো এগিয়ে চলে।
যত এগোয় বনও তত গভীর, তত অক্কার হয়ে ওঠে। তবু হেঁচেই চলে
মারুশকা। আরো এক জোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল। লোহার দণ্ড ভেঙ্গে
গেল, লোহার টুঁপিটা ছিঁড়ে গেল। মারুশকা এসে পড়ল একটা কুঁড়েরের

সামনে। কুঁড়েটা একটা মূরগীর পায়ের উপর বসানো। চারিদিকে বেড়া। আর খণ্টির ডগায় সব মাথার খুলি, তাতে আগুন জ্বলছে।

মারুশকা বলল:

‘কুঁড়েধর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঢ়াও! ভেতরে থাব, রুটি থাব।’

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ওর দিকে মুখ করে দাঢ়াল কুঁড়েধর। মারুশকা তুকে গেল ভিতরে। দেখে, ডাইনী, বাবা-ইয়াগা — খেঞ্চাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘর জোড়া তার ঠ্যাং, ঠেঁটি উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে।

মারুশকাকে দেখে ডাইনী বলল:

‘হাউমাউখাউ, রুশীর গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?’

‘বলমলে বাজ ফিনিস্টের খোঁজে চলেছি, ঠাকুমা।’

‘আমার বোনের কাছে গিয়েছিল?’

‘গিয়েছিলুম, ঠাকুমা।’

‘বেশ। তবে আমি তোকে সাহায্য করব, সুন্দরী। এই সোনার ছুঁচ রূপোর ফ্রেমটা নে। ছুঁচটা নিজে নিজেই লাল মখমলে সোনালি রূপোলি নস্তা তুলবে। কেউ কিনতে চাইলে দিস না। বলমলে বাজ ফিনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইব।’

বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে মারুশকা চলল। বনের মধ্যে মড়মড় করে, দ্বিমাম করে, শনশন করে। ঝোলানো মাথার খুলিগুলো থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে ভৃতৃত্বে আলো। ভয়ে মরে মারুশকা। হঠাত কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এল:

‘ভেউ, ভেউ, মারুশকা, ভয় করো নে লক্ষ্মীটি। এগিয়ে যেও, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। পিছনাদিকে তাকিও না।’

এই বলেই কোথায় উধাও। মারুশকা হাঁটে তো হাঁটে। আরো ঘন কালো হয়ে ওঠে বনটা। পা ঠেকে ঠেকে যায়, অস্তিন বেধে মেঘে যায়... হাঁটে আর হাঁটে মারুশকা, পিছনে তাকায় না।

অনেক দিন মাকি অল্প দিন, কে জানে। লোহার ঝুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার দণ্ড ভেঙে গেল, লোহার টুপটা ছিঁড়ে গেল। পেঁচল মারুশকা বনের মধ্যে ঘাসে ঢাকা ফাঁকা একটা জায়গায়; দেখে, মুরগীর পায়ের ওপর একটা কুঁড়েঘর। লম্বা লম্বা খণ্টি দিয়ে ঘের দেওয়া। খণ্টির ডগায় ডগায় আগন্তনে ধূকথক করছে ঘোড়ার মাথার খুলি।

মারুশকা বলল:

‘কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও !’

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মারুশকার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুঁড়েঘর। মারুশকা ভিতরে চুকে গেল। দেখে, ডাইনী, বাবা-ইয়াগা — খেঁরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘর জোড়া তার ঠাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে। একটি দাঁত শুধু নড়বড় করছে মুখে। মারুশকাকে দেখে গরগর করে উঠল বৃড়ীটা:

‘হাউমাউথাউ, রুশীর গন্ধ পাউ ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার ?’

‘আমি চলেছি বলমলে বাজ ফিনিস্টের খেঁজে !’

‘তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, সুন্দরী। কিন্তু আমি তোকে সাহায্য করব। এই নে রূপের তক্কিল, সোনার টাকু। টাকুটা হাতে ধরলেই নিজে নিজে সোনার সুতো কাটা হবে।’

‘অনেক ধন্যবাদ, ঠাকুম্বা !’

‘ধন্যবাদ পরে দিস, এখন কথা শেন ! টাকুটা যদি কিনতে চায় দিম নী, বলমলে বাজ ফিনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি !’

মারুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলল তার পথে। বনে তখন ঘড়ুঘড় গজ্জন, গুরুগুরু ডাক, সাইসাই আওয়াজ। আঢ়ারা পাক খেয়ে পড়ে, ইঁদুরেরা গত থেকে বেরিয়ে আসে — সবই মারুশকার গায়ে। হঠাতে একটা পাঁশটে নেকড়ে কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল:

‘তয় নেই মারুশকা, আমার পিঠে চড়ে বসো, পিছনে তাকিও না।’

মারুশকা তখন নেকড়ের পিঠে চড়ে বসতেই এক পলকে উধাও। সামনে তার অঙ্গে স্টেপ, মখমলী মাঠ, ঘন্থুর নদী, হালুয়ার পাড়, মেঘ-ছেঁয়া উচ্চ পাহাড়। ছুটতে ছুটতে নেকড়ে ওকে নিয়ে এল এক স্ফটিকের পূর্ণীর সামনে। তার জাল-কাজের অলিন্দ, কারু-কাজের জানলা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে রাণী।

নেকড়ে বলল, ‘তাহলে এবার পিঠ থেকে নামো, মারুশকা, রাজপুরীতে দাসীর কাজ নাও গে।’

মারুশকা নেকড়ের পিঠ থেকে নেমে পেঁটলাটা নিয়ে নেকড়েকে অনেক ধন্যবাদ দিল। রাণীর কাছে কুনির্শ করে মারুশকা বলে:

‘জানি না কী বলে ডাকব, কী মানে ঘান্ধি করব, আপনার বাড়ীতে কি দাসী লাগবে?’

রাণী বলল, ‘হাঁ হ্যাঁ, বাপু, অনেক দিন থেকে একটি দাসী খুঁজছি যে সুতো কাটতে, কাপড় বুনতে, নস্তা তুলতে জানে।’

মারুশকা বলল, ‘এ সবই পারি।’

‘তাহলে এসো, কাজে লেগে যাও।’

রাজবাড়ীর দাসী হল মারুশকা। দিনভর কাজ করে, তারপর রাত হতেই রূপোর পিরিচ সোনার ডিমটা বের করে বলে:

‘রূপোর পিরিচে সোনার ডিম ঘুরে ঘা, ঘুরে ঘা। দোখিয়ে দে, কোথায় আমার ফিনিস্ত।’

আর অফিন সোনার ডিমটা ঘোরে আর ঘোরে আর সামনে এসে দাঁড়াতে ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত। চেয়ে চেঁহে মারুশকার আর সাধ ঘেটে না, দুঃখে তার জলে ভেসে ঘায়।

‘ফিনিস্ত আমার, ফিনিস্ত! কেন ছেড়ে গেলে এই হতভাগিনীকে। কেন্দে যে আর বাঁচ না ...’

রাণী সে কথা শুনতে পেষে বলে:

‘মারুশকা, তোমার রূপোর পিরিচ সোনার ডিম জীবায় বেচে দাও।’

মারুশকা বলল, ‘না, এ আমার বিছীর নয়, তবে তুমি যদি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্টকে দেখতে দাও তাহলে এটা তোমায় এমনিই দিয়ে দেব।’

রাণী ভেবে চিন্তে বলল:

‘বেশ, তাই হোক। রাতে ও যখন ঘুময়ে পড়বে তখন তোমায় দেখতে দেব।’

রাত হলে মারুশকা ঝলমলে বাজ ফিনিস্টের ঘরে গেল। দেখে তার আদরের ফিনিস্ট গভীর ঘূমে ঘুময়ে আছে। সে ঘূম ভাঙ্গে না। দেখে দেখে মারুশকার আর সাধ মেটে না। তার মধুচালা মুখে চুম্ব খেল মারুশকা, নিজের ধৰ্মধৰে বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘুময়েই রইল তার আদরের ধন ফিনিস্ট। কিছুতেই জাগল না। ভোর হয়ে গেল, তবুও মারুশকা তার ফিনিস্টের ঘূম ভাঙ্গতে পারল না...

সারাদিন সে কাজ করল। তারপর সন্ধ্যাবেলায় সে নিয়ে বসল তার রূপোর ফ্রেম সোনার ছবি। সেলাই হতে থাকে, আর মারুশকা বলে:

‘ফুল তুলে যা, ফুল তুলে যা। সেই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছবে আমার ঝলমলে বাজ ফিনিস্ট।’

রাণী সে কথা শুনতে পেয়ে বলল:

‘মারুশকা, তোমার সোনার ছবি রূপোর ফ্রেম আমায় বেচে দাও।’

মারুশকা বলল, ‘বিছী আমি করব না। তবে তুমি যদি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্টকে দেখতে দাও তাহলে অমনিই দিয়ে দেব।’

ভাবল রাণী, ভেবে দেখল, তারপর বলল:

‘বেশ, তাই সহি। রাত্তিরে এসে ওকে দেখে যেও।’

রাত এল। মারুশকা শোবার ঘরে চুক্কে দেখল তার ঝলমলে বাজ ফিনিস্ট অঘোরে ঘুময়ে।

‘ওগো ফিনিস্ট, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠো, ওঠো, ঘুম ভেঙে ওঠো।’

ফিনিস্ট কিন্তু অঘোরে ঘুময়ে। মারুশকা হাজার চেষ্টা করেও তাকে ওগাতে পারল না।

ভোর হয়ে গেল। কাজকর্ম লাগল মারুশকা, রূপোর তক্কিল আর সোনার টাকু নিয়ে বসল। তা দেখে রাণী বলে:

‘বেচে আও মারুশকা, বেচে দাও !’

মারুশকা বলল:

‘বেচার জন্যে বেচব না। তবে যদি তুমি আমায় বলমলে বাজ ফিনিস্ট্রে সঙ্গে কেবল এক ঘণ্টা থাকতে দাও তাহলে তোমায় অমনিই দিয়ে দিতে পারি !’

রাণী বলল, ‘বেশ !’

মনে মনে ভাবল, “জাগাতে তো আর পারবে না !”

রাস্তার হল। মারুশকা এসে দুকল শোবার ঘরে, কিন্তু ফিনিস্ট আগের ঘরই অঞ্চলে ঘোময়ে।

‘ওগো ফিনিস্ট, ওগো আমার বলমলে বাজ, ওঠো, ওঠো, ঘৃম থেকে জাগো !’

ফিনিস্ট কিন্তু ঘৃময়েই রইল। কিছুতেই জাগল না।

মারুশকা কত চেষ্টা করল তাকে জাগাতে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। এদিকে ভোর হয় হয়।

মারুশকা কেঁদে ফেলল। বলল:

‘প্রাণের ফিনিস্ট, ওঠো গো, চোখ মেলে দেখো, দেখো তোমার মারুশকাকে, বুকে তাকে জড়িয়ে ধরো !’

ফিনিস্টের খোলা কাঁধের ওপর তখন মারুশকার চোখের জল ঝরে পড়ল, সে চোখের জলের ছাঁকা লেগে নড়ে উঠল বলমলে বাজ ফিনিস্ট। চোখ মেলে দেখল — মারুশকা! অমনি দৃহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুরু খেল তাকে। বলল:

‘একি সীতাই তুমি আমার মারুশকা! তুমি তবে তিনজোড়া লোহার জুতো ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙে, তিনটে টুঁপি ছিঁড়ে সীতাই এলে? আর কেঁদো না। চলো এবার বাঢ়ী যাই !’

ওরা বাড়ী আবার জন্মে তৈরী হতে লাগল। কিন্তু রাণী তা দেখতে পেয়ে
হ্রস্ব দিল তেড়া দিতে, স্বামীর বেইমানী রাটিয়ে দিতে।

বাজুয়াজড়া সওদাগররা সব জড়ো হল, পরামর্শ করতে লাগল খলমলে বাজ
ফিনিস্টকে কী দণ্ড দেওয়া থায়।

খলমলে বাজ ফিনিস্ট তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

‘আপনারাই বলুন আসল বৌ কে? যে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে,
না যে আমায় বেচতে চায়, ঠকাতে চায়?’

সবাই তখন মেনে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, মারুৎশঙ্কাই তার বৌ।

তাই সুখেসবচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল তারা। নিজেদের দেশে ফিরে
গেল। সেখানে বিয়ের দিন তেপের পর তোপ পড়ল, শিঙ্গার পর শিঙ্গা
বাজল আর ভোজটা হল এমন জমকালো যে এখনো লোকে তার কথা
ভোলেন।



সিঙ্গুকা-বুর্কা

এক যে ছিল বুড়ো, তার তিন ছেলে। বড় দৃষ্টি ছেলে চাষবাস দেখত, মাথা উঁচয়ে চলত, বেশভূষা করত। ছোট ছেলে বোকা ইভান তেমন কিছু নায়। সারাদিন সে বাড়ীতেই চুল্লীর উপরের তাকে বসে কাটাত। আর মাঝে মধ্যে বনে যেত ব্যাঙের ছাতা তুলতে।

বুড়োর যখন মরবার সময়, তখন একদিন তিন ছেলেকে ডেকে বললে:

‘আমি মরে গেলে পর পর তিন রাত আমার কবরে রুক্ষি নিয়ে আসিস।’

মরে গেল বুড়ো। কবর দেওয়া হল তাকে। সেই রাতে বড় ভাইয়ের কবরে

যাওয়ার পালা। কিন্তু বড় ভাইয়ের আলসেমি লাগে, নাকি ভয় পায়। ছোট ভাই
বোকা ইভানকে বলে:

‘ইভান, আজ যদি তুই আমার বদলে বাবার কবরে যাস, তবে তোকে একটা
পিটোকনে দেব।’

ইভান তক্ষণি রাজি। রুটি নিয়ে চলে গেল বাবার কবরে। বসে বসে অপেক্ষা
করে। ঠিক রাত দৃশ্যে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে বৃত্তে বাবা বেরিয়ে এসে
জিজ্ঞেস করল:

‘কে ওখনে? আমার বড় ছেলে নাকি? বল তো শুনি রাশদেশের খবর?
কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজাচ্ছে, নাকি আমার বাঢ়া কাঁদছে?’

ইভান বলল, ‘বাবা, এই যে আমি, তোমার ছেলে। রাশদেশ শাস্তিতে আছে,
বাবা! ’

বৃত্তে তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে আবার কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর
ইভান পথে থামতে থামতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাঢ়ী ফিরল।

বাঢ়ী ফিরতে বড় ভাই জিজ্ঞেস করল:

‘হ্যাঁ রে, বাবাকে দেখলি?’

ইভান বলল, ‘হ্যাঁ, দেখেছি।’

‘রুটি খেল?’

‘হ্যাঁ খেল, পেট পূরে।’

আর একটা দিন কেটে গেল। সেদিন মেজ ভাইয়ের ধাবার পালা। আলসেমি
করেই হোক বা ভয় পেয়েই হোক মেজ ভাই বলে:

‘ইভান, তুই বরং আজ আমার বদলে ধা, তোকে এক জোড়া লাপ্তি রান্নায়ে
দেব।’

ইভান বলল, ‘বেশ।’

রুটি নিয়ে ইভান আবার গেল কবরের কাছে। অপেক্ষা করে বসে রইল।
ঠিক রাত দৃশ্যে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বৃত্তে বাবা বেরিয়ে
এসে জিজ্ঞেস করল:

‘কে ওখানে? আমার মেজ ছেলে নাকি? বল তো শুনি রংশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?’

ইভান জবাব দিল:

‘আমি তোমার ছেলে, বাবা। রংশদেশ বেশ শাস্তিতেই আছে।’

বৃক্ষে তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে কবরে গিয়ে শূরৈ পড়ল। পথে থেমে থেমে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল ইভান। বাড়ী ফিরতে মেজ ভাই জিজেস করল:

‘হ্যাঁ রে, রুটি খেল বাবা?’

‘খেল, পেট পুরে খেল।’

তৃতীয় রাস্তির। সেদিন ইভানের ঘাবার পালা। ইভান দাদাদের বলল:

‘দু’রাস্তির আমি গোছি। আজ তোমরা কেউ ঘাও। আমি বাড়ীতে ঘুমিয়ে নিই।’

দাদারা বলল:

‘সে কী রে ইভান, তোর তো বেশ জানা শোনা হয়ে গেছে, তুই বরং যা।’

‘তা বেশ, আমিই যাব।’

রুটি নিয়ে ইভান চলে গেল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু’ফাঁক হয়ে ইভানের বৃক্ষে বাবা উঠে এল। জিজেস করল:

‘কে ওখানে? আমার ছোট ছেলে ইভান নাকি? বল শুনি রংশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?’

ইভান জবাব দিল:

‘আমি ইভান, বাবা, তোমার ছেলে। রংশদেশ বেশ শাস্তিতেই আছে।’

বাপ তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে বলল:

‘তুই একমাত্র আমার কথা শুনিল। পর পর তিনি রাস্তির আমার কবরে

আসতে একটু ভয় পাসনি। এবার এক কাজ কর, খোলা মাঠে গিয়ে চীৎকার করে ডাকবে: ‘সিভ্বকা-বুর্কা, ধাদুকা লেডুকা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া! ঘোড়াটা তোর সামনে আসবে, তুই ওর ডান কান দিয়ে চুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আসিস। দেখবি তোর রূপ খুলে যাবে। তারপর ঘোড়ায় চেপে যথা ইচ্ছা তথ্য যাস।’

বুর্ডো বাবা ইভানকে একটা লাগাম দিল। ইভান লাগামটা নিয়ে বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে পথে পথে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ী ফিরতেই ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করল:

‘কিরে, বাবার সঙ্গে দেখা হল?’

ইভান বলল, ‘হল।’

‘রুটি খেল?’

‘পেট পুরে খেল। বললে কবরে আর আসতে হবে না।’

এদিকে হয়েছে কি, রাজা তখন চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছেন — রাজ্যের যত রূপবান, আইবুর্ডো, কুমারদের সব তাঁর রাজদণ্ডাবারে উপস্থিত হওয়া চাই। রাজকন্যা লাবণ্যবতীর জন্যে ওক গাছের বারো খণ্টির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা বানান হয়েছে। সেই কোঠার একেবারে ওপরে রাজকন্যা বসে থাকবেন, আর যে ঘোড়ার পিঠে বসে এক লাফে পেঁচে রাজকন্যার ঢেঁটে চুম্ব খেতে পারবে, রাজা তাকেই অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা লাবণ্যবতীকে দেবেন। তা সে যে ঘরের ছেলেই হোক।

ইভানের ভাইয়েদের কানেও একথা পেঁচতে দেরি হল না। বললে:

‘দেখা যাক ভাগ্য পরীক্ষা করে।’

তেজী ঘোড়াদুটোকে ওরা বেশ করে যবের ছাতু খাওয়াল। তারপর নিজেরা ফিটফাট পোষাক পরে, বাবার চুলটি আঁচড়ে তৈরী হল। ইভান তখন চির্মনির পেছনে চুল্লীর তাকে বসে। বলল:

‘আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না দাদা, আমিও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে আসি।’

‘দূর, হতভাগ্য তুই বরং বনে ব্যাঙের ছাতা খেজে বেড়া গে যা, লোক হাসিয়ে দরকার নেই !’

বড় ছুটভাই তেজী ঘোড়ায় চড়ে টুপি বাঁকিয়ে, চাবুক চালিয়ে, শিস দিতেই — একরাশ ধূলোর মেঘ আকাশে। ইভান তখন বাবার দেওয়া লাগামটা নিয়ে চলে গেল খোলা মাঠে। তারপর বাবার কথামত ডাকলে:

‘সিভ-কা-ষুর্কা, যাদুকা লেডুকা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া !’

কোথেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছেটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। মাটিতে পা গেঁথে বলে:

‘বলো, কী হুকুম !’

ইভান ঘোড়াটার গলা চাপড়ে নিয়ে তাকে লাগাম পরাল, তারপর তার ডান কান দিয়ে চুকে, বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল। আর কী আশ্চর্য ! অমনি সে হয়ে গেল এক সুন্দর তরুণ — কী তার রূপ — সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুরীর দিকে রওনা হল ইভান। ছুটল ঘোড়া কদমে, কাঁপল মাটি সঘনে, পেরিয়ে গিরির কাস্তার, মন্ত সৌক বাঁপ তার।

ইভান এসে পেঁচল রাজদরবারে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা। তার চিলেকোঠায় জানলার পাশে বসে আছে রাজকন্যা লাবণ্যবতী।

রাজা অলিল্দে বেরিয়ে এসে বললেন:

‘তোমাদের মধ্যে যে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফিয়ে উঠে আমার মেয়ের ঠোঁটে চুম্ব খেতে পারবে, তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব, আর যৌনক দেব অর্ধেক রাজ্য।’

কুমারেরা সবাই তখন এক এক করে এগিয়ে লাফাল, কিন্তু কোথায় কে, জানলার নাগাল কেউ ধরতে পারল না। ইভানের দুই ভাই চেষ্টা করলে, কিন্তু অর্ধেকটা পর্যন্ত গেল না। এবার এল ইভানের পাল্লা।

সিভ্র্কা-বুর্কাকে সে কদমে ছুটিয়ে হাঁক পেড়ে, ডাক ছেড়ে লাফ মারলে। কেবল দুটে কুঁদো বাদে সব কুঁদো সে ছাড়িয়ে গেল। ফের আবার ঘোড়া ছুটাল সে। এবরাকার লাফে বাঁকি রইল একটা কুঁদো। ফের ফিরল ইভান, পাক থাউলে ঘোড়কে, গরম করে তুললে। তারপর আগন্তের ইল্কার মতো এক ছুটে লাফে জানলা পেরিয়ে রাজকন্যা লাবণ্যবর্তীর মধ্যচালা ঠোঁটে চুম্ব খেয়ে গেল ইভান। আর রাজকন্যাও তার হাতের আংটি দিয়ে ইভানের কপালে ছাপ এঁকে দিল।

লোকজনেরা সব ‘ধরো, ধরো!’ করে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু ইভান ততক্ষণে উধাও।

সিভ্র্কা-বুর্কাকে ছুটিয়ে ইভান এল সেই খোলা ঘাটে। তারপর ঘোড়ার বাঁ কান বেঁয়ে উঠে ডান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অর্মান সে ফের হয়ে গেল সেই বোকা ইভান। সিভ্র্কা-বুর্কাকে ছেড়ে দিয়ে সে রওনা হল বাড়ীর দিকে। যেতে যেতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নিলে। বাড়ী এসে ন্যাকড়া দিয়ে কপালটা বেঁধে চুল্লীর উপরের তাকে উঠে শূয়ে রইল।

ভাইয়েরাও যথা সময়ে ফিরে এসে বলতে লাগল, কোথায় গিয়েছিল, কী দেখল।

‘খাসা খাসা সব জোরান, একজন কিন্তু সবার সেরা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক লাফে উঠে রাজকন্যার ঠোঁটে চুম্ব খেয়ে গেছে। দেখলাম কোথেকে এল, দেখা গেল না কোথায় গেল।’

চির্মানির পিছন থেকে ইভান বলে:

‘আমি নই তো?’

ভাইয়েরা সে কথা শনে ভীষণ চটে গেল:

‘বাজে বৰ্কিস না, হাঁদা কোথাকার! তার চেয়ে চুল্লীর উপর বসে রাসে ব্যাঙের ছাতা গেল।’

ইভান তখন কপালের পটিটা খুলে ফেলল, যেখানে রাজকন্যা ছাপ মেরেছিল আংটি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কুঁড়েধরটা আলোয় আলোয় ভরে গেল। ভাইয়েরা ডয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

‘কী, কর্ণিষ্ঠ কী, হাঁদা কোথাকার! রাজবাড়ী জহালয়ে দীর্ঘ যৈ!’
পরদিন রাজবাড়ীতে বিরাট ভোজ। পাত্র মিশ, জমিদার প্রজা, ধনী গরীব,
বৃড়ো বৃষ্টি—সকলের নেমন্তন্ত্র।

ইভানের ভাই দুজনও ভোজে থেতে যাবে বলে তৈরী। ইভান বলল:
‘দাদা, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো।’

‘কী বললি? তোকে নিয়ে যাব? শোকে হাসবে। তার চেয়ে তুই এখানে
চুল্লীর উপরে বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল।’

দু'ভাই তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চলে গেল। আর পারে
হেঁটে ইভান গেল ওদের পেছন পেছন। রাজপুরীতে পেঁচে দূরে এককোণে
বসে রইল ইভান। রাজকন্যা লাবণ্যবতী তখন নিম্নলিখিতদের প্রদর্শক
সূরু করেছে। হাতে তার মধ্য পাত্র। তা থেকে সে এক এক জনকে মধ্য ঢেলে
দেয় আর দেখে কপালে তার আংটির ছাপ আছে কিনা।

সকলকে প্রদর্শক করে এল রাজকন্যা, বাদু রইল কেবল ইভান। ইভানের
দিকে রাজকন্যা যত এগোয় তত তার বুক দুরদুর করে। ইভানের সারা গাঁথে
কালি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল।

রাজকন্যা লাবণ্যবতী জিজেস করে:

‘কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো? কপালে তোমার পাঁটি বাঁধা কেন?’

ইভান বলল, ‘পড়ে গিয়ে কেটে গেছে।’

রাজকন্যা পাঁটি খুলে ফেলতেই সারা রাজপুরী আলোয় আলোয় ভরে গেল।
রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল:

‘এ তো আমারই ছাপ, একেই তো আমি বরণ করেছি।’

রাজামশাই কাছে এসে বলেন:

‘কী যতো বাজে কথা, এ যে একবারে কালিবুলি মাথা এক
হাঁদা।’

ইভান রাজাকে বললে:

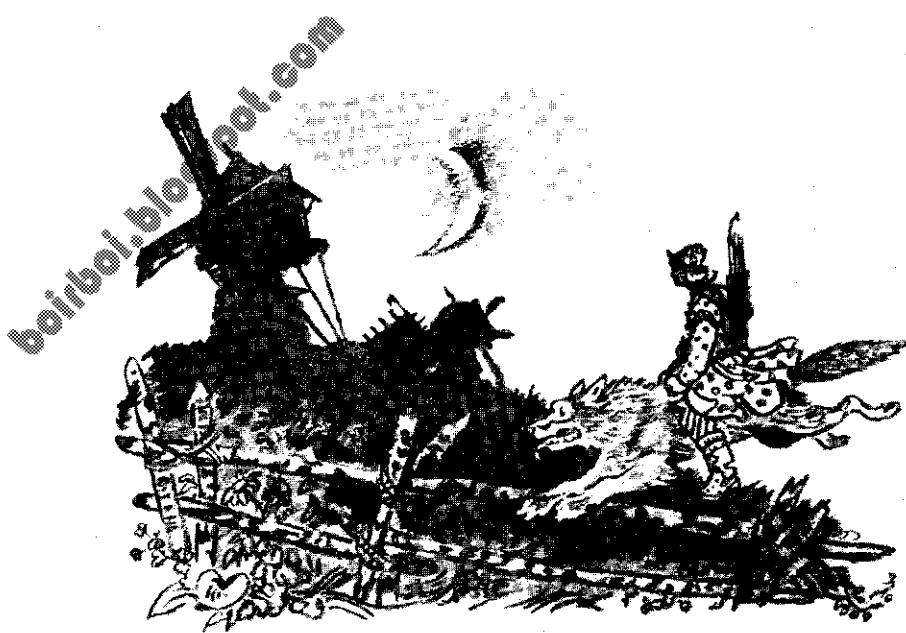
‘রাজামশাই, অনুমতি দিন একবার মুখ ধূয়ে আস।’

বাজামশাট অনুমতি দিলেন। ইভান উঠোনে গিয়ে বাবার কথামত হাঁক
দিল:

‘সিংকা-ব্র্কা, ষাদুকা লেডুকা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া !’

অর্মানি কোথেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে ঘাটি কাঁপে,
কাঁক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। ইভান তার ডান কান দিয়ে
চুকে, বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অর্মানি সে হয়ে গেল সেই রূপবান
তরুণ — সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। সব লোকে
একেবারে আহার্মারি করে উঠল।

অর্মানি সব কথা মিটে গেল, বিয়ের ভোজ চলল ধূমধাম করে।



ରାଜ୍‌ପତ୍ର ଇଭାନ ଆର ପାଞ୍ଚଟି ନେକଡ଼େ

ଏକ ସେ ଛିଲ ରାଜା । ନାମ ତାର ବେରେନ୍ଦେଇ । ରାଜାର ତିନ ଛେଲେ । ଛୋଟଟିର
ନାମ ଇଭାନ ।

ଚମକାର ଏକ ବାଗାନ ଛିଲ ରାଜାର, ସେଇ ବାଗାନେ ଛିଲ ଆପେଲ ଗାଛ । ସେଇ
ଗାଛେ ଆବାର ସୋନାର ଆପେଲ ହତ ।

କେ ସେନ ରାଜବାଗାନେ ଚୁପିଚୁପି ଢାକେ, ସୋନାର ଆପେଲ ଚୁରି କରେ । ତା ଦେଖେ
ରାଜାର ମନେ ଆର ଶାନ୍ତି ନେଇ । ପାଇକ ପେଯାଦା ଛୁଟିଲ, କିନ୍ତୁ କେଉ ଯୋଗ ଧରତେ
ପାରଲ ନା ।

ରାଜାର ଭୀଷଣ ଘନ ଖାରାପ । ଖାଓଯା ଦାଓଯା ବକ୍ଷ । ଛେଲେରା ସାବାକେ ସାନ୍ତ୍ଵନା
ଦେଇ । ବଲେ :

‘ଦୃଃଥ କରୋ ନା ବାବା, ଆମରା ନିଜେରାଇ ବାଗାନେ ପୁଅହରା ଦେବ ।’

বড় ছেলে বললে:

‘আজ আমার পাহারা দেবার পালা !’

এই বলে সে বাগানে গিয়ে সারা সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিল। কিন্তু কাবল দেখা নেই। বড় রাজপুত্র তাই নরম ঘাসের ওপর শয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা রাজা বললে:

‘শুভসংবাদ কিছি আছে কী ? দেখলি কে রোজ চুরি করে ?’

‘না বাবা, সারারাত্তির একটিবারও চোখ বুজিনি, কিন্তু কাউকে তো দেখলাম না !’

পরদিন রাত্তিরে মেজ রাজকুমার গেল পাহারা দিতে। কিন্তু সেও ঘুমিয়ে কাটাল। আর পরদিন সকালে সেও বলল কোনো চোর সে দেখেনি।

এবার ছোট রাজকুমারের পালা। রাজপুত্র ইভান বাগানে পাহারা দিতে গেল। দৃদ্দণ্ড বসতেও তার ভয় হয়, কী জানি কেউ যদি তুকে পড়ে। ঘুম পেলেই ইভান শিশির দিয়ে মুখ ধূয়ে ফেলে, অর্মান ঘুম টুম কোথায় চলে যায়।

তারপর মাঝরাত পেরতেই অবাক কাণ্ড — বাগানে আলো। সে আলো বাড়ে আর বাড়ে। সারা বাগান আলোময়। দেখে কি, আগুনে-পাখি আপেল গাছে বসে বসে সোনার আপেল ঠোকরাচ্ছে।

ইভান চুপচুপ গাছের কাছে গিয়ে খপ্প করে পাঁখটার লেজ চেপে ধরল। পাঁখটা কিন্তু হাত ছাড়িয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল। কেবল একটা পালক রয়ে গেল রাজপুত্রের হাতে।

পরদিন সকালে রাজপুত্র ইভান এল বাপের কাছে।

‘কী খবর ? চোর দেখলি ?’

‘ধরতে পারিনি বাবা, কিন্তু দেখেছি কে রোজ চুরি করে। এই দেখে চোরের চিহ্ন। এ হল আগুনে-পাখি।’

রাজা ইভানের হাত থেকে পালকটা নিলে। সেই থেকে স্মরণ হল খাওয়া দাওয়া, আবার মখে হাসি। কিন্তু আবার একদিন রাজা মনে ভাবনা দেখা দিল।

তিন কুমারকে দেকে বললে:

‘যেহের ছলেরা আমার, যা না তোরা ঘোড়ায় গিয়ে ওঠ, সারা প্রথিবী
খুঁজে মেঝে। আগন্মে-পার্থির দেখা কোথাও পাস কিনা।’

রাজপুত্র বাপকে কুর্নিশ করে ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বড়
বাজকুমার এক দিকে চলল, মেজ গেল অন্য দিকে, ছোটটি আরেক পথে ঘোড়া
ছোটাল।

রাজপুত্র ইভান ঘোড়ায় চলেছে অনেকদিন নাকি অল্পদিন, কে জানে।
গ্রীষ্মের দিন। ক্লান্ত হয়ে ইভান ঘোড়া থেকে নেমে, তার সামনের পা দাঢ়ি দিয়ে
বেঁধে ঘূর্মতে গেল।

অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, কতক্ষণ কাটল কে জানে। ঘূর্ম থেকে উঠে
রাজপুত্র দেখে ঘোড়া নেই। ঘোড়া খেঁজতে গেল রাজপুত্র। হাঁটতে
শেষকালে এক জায়গায় এসে দেখে, ঘোড়ার কয়েকটা হাড় পড়ে আছে কেবল,
তাও আবার চাঁচা পৌঁছা পরিষ্কার।

রাজপুত্রের ভীষণ দৃঃখ হল। ঘোড়া ছাড়া এ দূরের দেশে যাবে কোথায়?

ভাবে, “তা কী আর হয়েছে, কাজে নেমেছি, উপায় তো নেই।”

এই ভেবে রাজপুত্র পায়ে হেঁটেই চললে। হাঁটতে হাঁটতে রাজপুত্র আর
পারে না। নরম ঘাসে বসে বসে দৃঃখ করে রাজপুত্র। হঠাত দেখে, কোথা থেকে
একটা পাঁশুটে নেকড়ে দৌড়তে দৌড়তে তার দিকেই আসছে।

পাঁশুটে নেকড়ে জিজেস করল, ‘কী রাজপুত্র ইভান, বসে বসে দৃঃখ
করছো, হেঁট করেছো মাথা?’

‘দৃঃখ না করে কী করিব বলো নেকড়ে, আমার তেজী ঘোড়াটা যে নেই।

‘আমিই সেটাকে খেয়ে ফেলেছি রাজপুত্র ইভান ... তোমার জন্মে দৃঃখ
হচ্ছে। বলো তো, দূর দেশে এলে কেন, কোন পথে চলেছো?’

‘বাবা আমায় পাঁঠেরেছেন সারা প্রথিবী ঘূরে দেখতে, আগন্মে-পার্থির
খোঁজ করতে।’

‘আরে হ্যা, তোমার ঐ ঘোড়ায় চড়ে তুমি তিন বছরেও আগন্মে-পার্থির
কাছে পেঁচতে পারতে না। আমিই কেবল জানি আগন্মে-পার্থির বাসা কোথায়।

বেশ, আমিই যুদ্ধে তোমার ঘোড়া খেয়ে ফেলেছি, তখন আজ থেকে আমিই তোমার ন্যায়বন্ধে কাজ করব। আমার পিঠে বসে বেশ করে জাপটে ধরো।'

রাজপুত্র নেকড়ের পিঠে উঠে বসল। অম্বিন পাঁশটে নেকড়েও ছুট লাগাল: পলকে পেরয় নীল বন, নিমেষে ডিঙেয় সরোবর। অনেকদিন নার্কি অল্পদিন, শৈশবকালে ওরা এসে পৌঁছল এক উঁচু কেঁপ্লার কাছে। পাঁশটে নেকড়ে বলল: 'রাজপুত্র ইভান, বল শোনো, ভুলো না। পাঁচল বেয়ে উঠে যাও। কোনো ভয় নেই। আমরা ভাল সময়ে এসেছি, প্রহরীরা সব ঘৃণচ্ছে। কোঠায় দেখবে জানলা। সেই জানলায় সোনার খাঁচা। সেই খাঁচায় আছে আগুনে-পার্থ। পার্থিটাকে বুকের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু মনে রেখো, খাঁচাটা ছুঁয়ো না যেন।'

রাজপুত্র ইভান দেওয়াল বেয়ে উঠে দেখে কোঠা, জানলায় সোনার খাঁচা আর সোনার খাঁচায় সেই আগুনে-পার্থ। রাজপুত্র পার্থিটা নিয়ে বুকের তলায় লুকিয়ে রাখল। কিন্তু খাঁচাটা থেকে কিছুতেই আর সে চোখ ফেরাতে পারে না। বুক তার দুলে উঠল: "আহা, কী সুন্দর সোনার খাঁচাটা! ছেড়ে যাই কী করে!" নেকড়ের বারণ সে ভুলে গেল। তারপর যেই না রাজপুত্র খাঁচাটা ছুঁয়েছে, অম্বিন সারা কেঁপ্লায় হৈচে। বেজে উঠল রামশঙ্গা, কাঠি পড়ল কাড়া-নাকাড়ায়। প্রহরীরা জেগে উঠে ইভানকে ধরে নিয়ে গেল রাজা আফ্রনের কাছে।

রাজা ভীষণ রেগে জিজ্ঞেস করলে:

'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো?'

'আমি রাজা বেরেন্দেইয়ের ছেলে, রাজপুত্র ইভান।'

'ছি ছি! লজ্জার কথা! রাজার ছেলে হয়ে কিনা শেষে চুরিবিদ্যা!'

'কিন্তু রাজামশাই, আপনার পার্থিটি যে আমাদের বাগানে আপেন্তা চুরি করতে আসত।'

'তুমি যদি বাছা ভালোমানুষের মতো এসে চাইতে, তাহলে আমি নিজে সম্মান করে তোমার বাবাকে পার্থিটি উপহার দিতুম। কিন্তু এখন? তোমাদের এই কলঙ্ক চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেব ... যাই হোক, এবাবের মতো তোমায় মাপ করে দিতে পারি, তবে একটি সর্তে। কুসমান ক্ষামে এক রাজার আছে

স্বর্ণকেশৱী ঘোড়াটি তুমি যদি আমাকে সেই ঘোড়াটা এনে দিতে পারো, তবে
আমি তোমায় এই খাঁচাসমেত আগন্নে-পার্থিটা দিয়ে দেব।'

মনের দৃঢ়থে রাজপুত্র পাঁশটে নেকড়ের কাছে ফিরে গেল।

নেকড়ে বলল, 'আমি যে তোমায় খাঁচায় হাত দিতে বারণ করেছিলাম !
আমার কথা কেন শুনলে না ?'

রাজপুত্র বলল, 'যাক গে, মাপ করো নেকড়ে, ক্ষমা করে দাও !'

'আহা, বড়ো বললেন, ক্ষমা করে দাও ... যাক গে, চড়ে বসো আমার পিঠে।
নেমেছি যখন কাজে, না করা কি সাজে !'

রাজপুত্রকে পিঠে করে আবার ছুটল নেকড়ে। অনেকদিন নাকি অল্প দিন,
শেষ পর্যন্ত তারা এসে পেঁচল সেই কেলায়, স্বর্ণকেশৱী ঘোড়া বেখানে থাকে।

'পাঁচিল বেয়ে উঠে যাও, রাজপুত্র, প্রহরীরা সব ঘূর্মিয়ে আছে। আন্তবলে
গিয়ে ঘোড়া নিয়ে এসো, কিন্তু খবরদার লাগামটা ছুঁয়ো না।'

রাজপুত্র পাঁচিল বেয়ে উঠে দুর্গে ঢুকল। প্রহরীরা সব ঘূর্মচ্ছে। আন্তবলে
গিয়ে স্বর্ণকেশৱী ঘোড়াকে ধরল রাজপুত্র। কিন্তু লাগামটা না ছুঁয়ে সে থাকতে
পারল না — একে সোনার লাগাম, তার আবার দামী জড়োয়ার কাজ — যেমন
ঘোড়া তার তেজনি লাগাম।

যেই না রাজপুত্র লাগামটা ছুঁয়েছে, অর্থনি দুর্গের মধ্যে হৈচে পড়ে গেল।
বেজে উঠল রামশঙ্গা, কাড়া-নাকাড়া। প্রহরীরা জেগে উঠে ইভানকে ধরে নিয়ে
গেল রাজা কুসমানের কাছে।

'কে তুমি ? কোথা থেকে এসেছো ?'

'আমি রাজপুত্র ইভান !'

'ছি ছি, কী বকাটেপনা, ঘোড়া চুরি ! সাধারণ একটা চাবীও একাজ করবে
না। তা যাক গে, তোমাকে মাপ করতে পারি, যদি তুমি আমার একটা কাজ করে
দাও। রাজা দালমাতের একটি মেয়ে আছে, রূপসৌ ইয়েলেনা। তাকে যদি সেই
মেয়েকে হরণ করে এনে দিতে পারো, তবে তোমায় স্বর্ণকেশৱী ঘোড়াটি দিয়ে
দেব, তার সঙ্গে লাগামটাও।'

আরো বেশী মনের দৃঢ়থে রাজপুত্র পাঁশটে নেকড়ের কাছে ফিরে গেল।

নেকড়ে বললু, ‘লাগামে হাত দিতে তোমায় আগেই তো বারণ করেছিলাম !
আমার কথম কান দিলে না তো !’

‘যাক্ষ গে, আমায় ক্ষমা করো নেকড়ে, মাপ করে দাও !’

‘বড়ো বললেন, ক্ষমা করো !... যাক গে, কী আর করা, আমার পিঠে ছড়ে বসো !’
রাজপুত্রকে পিঠে নিয়ে আবার ছুটে চলল নেকড়ে। ছুটতে ছুটতে এসে
পেঁচল রাজা দালমাতের কেলায়। চারপাশে সখীবাঁদী নিয়ে রূপসী ইয়েলেনা
তখন কেলার বাগানে পায়চারি করছে। পাঁশুটে নেকড়ে বলল :

‘এবার তুমি নয় আমিই যাব, তুমি ফিরতি পথ ধরে ফিরে যাও, শীগুগিরই
আমি তোমার নাগাল ধরব !’

ফিরতি পথে ফিরে চলল রাজপুত্র ইভান। আর পাঁচল ডিঙ্গিরে পাঁশুটে
নেকড়ে ঢুকল বাগানে। বোপের পেছনে লুকিয়ে থেকে সে উৎক দিয়ে দেখে,
সখীবাঁদী নিয়ে পায়চারি করছে রূপসী ইয়েলেনা। বেড়াতে বেড়াতে ইয়েলেনা
তার সঙ্গীদের চেয়ে একটু পেছিয়ে পড়তেই পাঁশুটে নেকড়ে তাকে টে করে
ধরে, পিঠে ফেলে উধাও।

পথে যেতে যেতে রাজপুত্র দেখে, পাঁশুটে নেকড়ে ফিরে আসছে, পিঠে তার
রূপসী ইয়েলেনা। রাজপুত্রের খুসি আর ধরে না। নেকড়ে বলল :

‘তুমিও পিঠে উঠে বসো জলদি করে, নয়ত ধরে ফেলবে !’

ফিরতি পথে ছুটে চলল পাঁশুটে নেকড়ে, পিঠে তার রূপসী ইয়েলেনা আর
রাজপুত্র ইভান বসে। পলকে পেরয় সুন্দরী বন, নিমেষে জিঞ্জোর সরোবর।
অনেকদিন নার্কি অল্পদিন, শেষ পর্যন্ত তারা এসে পেঁচল রাজা কুসমানের
দেশে। নেকড়ে জিঞ্জেস করল :

‘কী রাজপুত্র, মৃখে রা নেই, মন খারাপ ?’

‘মন খারাপ না করে কী কৰি বলো। এমন সুন্দরীকে ছেড়ে দিই কী করে ?
রূপসী ইয়েলেনার বদলে কিনা একটা ঘোড়া !’

‘বেশ, সুন্দরীকে ছেড়ে দিও না। ওকে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমিই
রূপসী ইয়েলেনা হয়ে যাব। তুমি আমায় নিয়ে যেও রাজাৰ কাছে !’

এই বলে তারা রূপসী ইয়েলেনাকে বনের মধ্যে একটা কুঁড়েয়েরে লুকিয়ে

রাখল। নেকড়ে শুভ্রে একটা ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়তেই, ওমা, একেবারে রূপসী ইয়েলেনার প্রতিমূর্তি। রাজা কুসমানের কাছে নিয়ে যেতে রাজা তো ভারি খুশি, ভারি কৃতজ্ঞ। বললে:

‘অনেক ধন্যবাদ রাজপুত্র ইভান, তুমি আমার কনে এনে দিয়েছো। আজ থেকে লাগামসমেত স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটা তোমার হল।’

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে রূপসী ইয়েলেনার কাছে ফিরে গেল, তারপর ইয়েলেনাকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

রাজা কুসমান তো ওদিকে বিয়ের উৎসবে মন্ত্র। সারাদিন ধরে চলল খাওয়া দাওয়ার ধূম। তারপর রাত্তিরে শোবার সময় হতে রাজা ইয়েলেনাকে নিয়ে এল শোবার ঘরে। বৌকে নিয়ে শুতে না শুতেই রাজা দেখে, কোথায় তার সুন্দরী, এ যে একটা নেকড়ের মুখ! ভীষণ ভয় পেয়ে বিছানা থেকে উল্টে পড়ল রাজা। আর নেকড়েও সেই সুযোগে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট।

দৌড়তে দৌড়তে পাঁশুটে নেকড়ে নাগাল ধরল রাজপুত্রে। জিজেস করল:

‘রাজপুত্র, অমন মুখভার কেন?’

রাজপুত্র বলল, ‘মুখভার না করে কী করিব বলো, এমন ধন স্বর্ণকেশরী ঘোড়া, তাকে কিনা দিতে হবে আগুনে-পার্থির বদলে।’

‘ভেবো না রাজপুত্র, আমি তোমায় সাহায্য করব।’

রাজা আফনের রাজে পৌঁছল ওরা। নেকড়ে বলল:

‘ঘোড়াটাকে আর ইয়েলেনাকে লুকিয়ে রাখো। আমি স্বর্ণকেশরী ঘোড়া হব, তুমি আমায় রাজার কাছে নিয়ে যেও, বুঝলে।’

ঘোড়াটাকে আর রূপসী ইয়েলেনাকে ওরা বনে লুকিয়ে রেখে এল। পাঁশুটে নেকড়ে এক ডিগবাজী খেয়েই হয়ে গেল স্বর্ণকেশরী ঘোড়া। রাজপুত্র তাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা ভীষণ খুশি হয়ে রাজপুত্রকে সোনার খাঁচাশুল্ক আগুনে-পার্থি দিয়ে দিলে।

রাজপুত্রও ফিরে গেল বনে। রূপসী ইয়েলেনাকে বমালী স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায়। হাতে নিল সোনার খাঁচায় আগুনে-পার্থি। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ী ফিরে চলল।

এদিকে হঞ্চে কী, রাজা আফন রাজপুত্রের দেওয়া ঘোড়ার পিঠে যেই চড়তে গেছে ব্যস — ঘোড়াটা অমান হয়ে গেল এক পাঁশুটে নেকড়ে। আঁতকে উঠে রাজা যেখানে ছিল সেখানেই উল্টে পড়ল, নেকড়ে ততক্ষণে এক দোড়ে নামাঙ্গ ধরল রাজপুত্রের।

‘এবার তাহলে বিদায় দাও রাজপুত্র, আর বেশী দূর আমি যেতে পারব না।’
রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তিনবার আভূমি কুর্নিশ করলে, পাঁশুটে নেকড়েকে সম্মান করে ধন্যবাদ দিলে। নেকড়ে বলল:

‘চিরদিনের মতো বিদায় দিও না কিন্তু, আবার হয়ত আমায় দরকার হতে পারে।’

রাজপুত্র মনে মনে ভাবে, “আবার কী দরকার হবে? আমার সব ইচ্ছেই তো পূর্ণ হয়ে গেছে!” তারপর স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় উঠে রূপসী ইয়েলেনাকে বসিয়ে হাতে সোনার খাঁচায় আগন্নে-পার্থি নিয়ে দেশে ফিরে চলল রাজপুত্র ইভান। নিজের দেশে পেঁচে রাজপুত্র ভাবল একটু খেয়ে নেওয়া যাক। সঙ্গে একটু রুটি ছিল, দৃঢ়নে তাই চিবিয়ে ঝরণার টাটকা জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রাজপুত্র ইভান সবে ঘূর্মিয়েছে, এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে এল তার অন্য ভাইয়েরা। আগন্নে-পার্থির খেঁজে ওরা নানা দেশ ঘূরে এখন বাড়ী ফিরছে খালি হাতে।

রাজপুত্র ইভান সর্বাকচ্ছ পেয়ে গেছে দেখে ওরা ঠিক করল:

‘এসো, ভাইকে মেরে ফেলা যাক, তাহলে ওর সব কিছুই আমাদের হয়ে যাবে।’

এই ভেবে দুই ভাই মিলে ইভানকে মেরে স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় চড়ে, আগন্নে-পার্থি নিয়ে, রূপসী ইয়েলেনাকেও ঘোড়ায় বসিয়ে শাসাল।

‘দেখো, বাড়ী গিয়ে এর একটি কথাও বলবে না কিন্তু!'

রাজপুত্র ইভান পড়ে আছে মাটিতে, ঘাথার উপরে চুক্ক দিচ্ছে দাঁড়কাকগুলো। হঠাতে কোথা থেকে ছুটে এল পাঁশুটে নেকড়ে। খপ্ করে একটা দাঁড়কাক আর তার ছানাকে ধরে বলল:

‘উড়ে যা দাঁড়কাক, শীগুঁগির আমায় জীয়ন জল মরণ জল এনে দে। এনে
দিলে তবে ত্বের ছানাকে ছেড়ে দেব।’

দাঁড়কাক কী আর করে! উড়েই গেল, আর নেকড়ে বসে রইল দাঁড়কাকের
ছানাকে। নিয়ে। উড়ল অনেক দিন, নার্ক অল্প দিন কে জানে, শেষ পর্যন্ত
জীয়ন জল মরণ জল নিয়ে ফিরে এল সে। রাজপুত্র ইভানের গায়ে ক্ষতের
উপর নেকড়ে মরণ জল ছিটিয়ে দিতেই জখমগুলো সব সেরে গেল। তারপর
জীয়ন জল ছিটিয়ে দিতেই রাজপুত্র ইভান বেঁচে উঠল আবার।

‘ইস্, খুব ঘুমিয়েছি!'

নেকড়ে বলল, ‘খুবই ঘুমিয়েছো বটে, তবে আমি না থাকলে আর তোমার
সে ঘুম ভাঙত না। তোমার নিজের ভাইয়েরাই তোমায় মেরে রেখে সব ধন
নিয়ে চলে গেছে। শীগুঁগির আমার পিঠে ওঠো।’

পেছু ধাওয়া করে ওরা অচিরেই দুই ভাইকে ধরে ফেলল। নেকড়ে তাদের
টুকরো টুকরো করে সারা মাঠে ছাড়িয়ে দিলে টুকরোগুলো।

রাজপুত্র ইভান তখন নেকড়েকে কুর্নিশ করে চিরদিনের মতো বিদায় নিল।

রাজপুত্র ইভান বাঢ়ী ফিরে গেল স্বর্ণকেশৱী ঘোড়ায় চড়ে। বাবার জন্যে
এনেছে আগুনে-পাথি আর নিজের জন্যে রূপসী ইয়েলেনা।

রাজা বেরেন্দেই তো মহা খুশী। কত কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। রাজপুত্র
বলল পাঁশটে নেকড়ে তাকে কী রকম সাহায্য করেছে, ভাইয়েরা তাকে কী
ভাবে ঘুমের মধ্যে মেরে রেখেছিল, নেকড়ে তাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে
ফেলেছে।

সব কথা শুনে রাজার ভীষণ দ্রুঃখ হল প্রথমে। তবে শীগুঁগিরই সে দ্রুঃখ
কেটে গেল। আর রাজপুত্র ইভান রূপসী ইয়েলেনাকে বিয়ে করে সুখেস্বচ্ছতা
ঘর করতে লাগল।



আ-জানি দেশের না-জানি কৌ

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজা বিয়ে থা করেনি, একাই থাকে। তার কাছে এক তীরন্দাজ কাজ করত। তার নাম আনন্দেই।

একদিন আনন্দেই শিকার করতে গেছে। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরেও তার কপাল খুলল না, শিকার মিলল না। এবিদকে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আনন্দেই বাড়ী ফিরে চলল। হঠাতে দেখে, গাছের মাথায় একটা ঘুঘু বসে।

আনন্দেই ভাবল, “ওটাকেই মারা যাক।”

আনন্দেই তীর মারল পার্থির ডানায়। গাছের উপর থেকে সৈন্দা মাটির উপর পড়ে গেল পার্থিটা। আনন্দেই তুলে নিয়ে গলা মুচড়ে ধাঁজতে পূরতে যাবে, হঠাতে পার্থিটা মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল।

‘ঘৰেৱো না, তীৰলদাজ আন্দৰেই, গলা আমাৰ কেচে ফেলো না। জীবন্ত বাড়ী
নিয়ে গিয়ে জানলায় রেখে দিও। যেই বিমতে সুৰু কৰিব, অমৰ্ন তোমাৰ
ডান হাতত দিয়ে চড় মেরো আমায়। দেখবে তোমাৰ ভাগ্য কেৰন খুলে
যায়।’

ভোজেৱ কানকেই বিশ্বাস কৰতে পাৰছিল না আন্দৰেই; এ কৰ্তৃ? দেখতে ঠিক
গাঁথৰ ঘতো, আবাৰ মানুষৰে মতো কথা বলে! আন্দৰেই পাঁথটা বাড়ী নিয়ে
গিয়ে জানলার উপৰ রেখে দেখতে লাগল কৰ্তৃ হয়।

কিছুক্ষণ পৱে ঘৃঘৃটা ডানাৰ তলায় মাথা গুঁজে ঘৃঘৰিয়ে পড়ল। ঘৃঘৃটা
কৰ্তৃ বলেছিল ঘনে পড়ল আন্দৰে-এৱ। ডান হাত দিয়ে ঘৃঘৃটাকে সে চড় মারল।
ঘৃঘৃটা মাটিতে পড়ে হয়ে গেল এক কনো, রাজকুমাৰী মারিয়া। কৰ্তৃ তাৰ রূপ,
সে রূপ বলাৰ নয়, কওয়াৰ নয়, রূপকথাতেই পৰিচয়।

রাজকুমাৰী মারিয়া তীৰলদাজকে বলল:

‘হৰণ কৱলে ষথন, কৰো ভৱণ পোষণ। ভোজেৱ জন্মে তাড়া নেই, বিয়ে
কৰো। হাসিৰুণ সতীলক্ষ্মী বৌ পাবে।’

সেই কথাই ঠিক হল। তীৰলদাজ আন্দৰেই রাজকুমাৰী মারিয়াকে বিয়ে কৱে
দৃঢ়জনে মনেৰ সূখে থাকতে লাগল। আন্দৰেই কিঞ্চি তাৰ কাজ ভোলে না। ৱোজ
সকালে আলো ফুটতে না ফুটতেই বনে গিয়ে বনমোৰগ শিকার কৱে রাজবাড়ীৰ
ৱস্তুইঘৰে দিয়ে আসে।

এইভাবে দিন কাটে। একদিন রাজকুমাৰী মারিয়া বলল:

‘আমৱা বড় গৱৰীবেৰ মতো দিন কাটাইছ, আন্দৰেই।’

‘তা ঠিক বলেছো।’

‘একশ’ রূবল জোগাড় কৱে আমায় কিছু রেশম কিনে এনে দাও, ভুলে
আমাদেৱ অবস্থা ঠিক ফেৱাতে পাৰব।’

রাজকুমাৰী মারিয়া যা বলল তাই কৱল আন্দৰেই। বক্সদেৱ কাছে গিয়ে
কাৰও কাছে এক রূবল, কাৰও কাছে দুই রূবল, এইভাবে ‘একশ’ রূবল ধাৰ
কৱে রেশম কিনে বাড়ী ফিৱল। রাজকুমাৰী মারিয়া বনমোৰগ

‘এবাৰ শুভতে যাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।’

আল্দেই যাতে গেল। বুনতে বসল রাজকুমারী মারিয়া। সারারাত ধরে বনে মারিয়া এমন একটা গালিচা তৈরী করল, যা প্রথিবীতে কেউ দেখেনি। গালিচাটা ওপরে গোটা রাজ্যের ছবি আঁকা, সহর-গ্রাম, মাঠ-বনের নক্ষা তোলা, তাই আকাশে পাথি, বনে পশু, সমৃদ্ধে মাছ, আর সবকিছুর উপর চাঁদের আলো, রীবর কিরণ ...

সকালবেলা মারিয়া স্বামীকে গালিচাটা দিয়ে বলল:

‘সওদাগরদের হাতে গিয়ে বেচে এসো। কিন্তু দেখো নিজে মুখে দাম বলো না, যা দেবে তাই নিও।’

আল্দেই গালিচা হাতে ঝুলিয়ে চলল সওদাগরদের হাতে।

আল্দেইকে দেখেই তক্ষণ এক সওদাগর দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

‘কত দাম চাও, ভাই?’

‘তুমি সওদাগর, তুমই বলো।’

সওদাগর ভেবে ভেবে আর কিছুতেই দাম বলতে পারে না। তারপর এল আর একজন, আরো একজন, এক এক করে ভিড় জমে গেল সওদাগরের। সকলেই গালিচাটা তাকিয়ে দেখে আর অবাক হয়, কিন্তু কেউ আর দাম বলতে পারে না।

সেই সময় পথ দিয়ে ঘাছিল রাজার এক মন্ত্রী। কী ব্যাপার দেখবার জন্যে গাড়ী থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল:

‘নমস্কার সওদাগরেরা, সাগরপারের মানুষেরা! কী ব্যাপার?’

‘না, গালিচাটার দাম ঠিক করতে পারছ না।’

রাজার মন্ত্রী তো গালিচাটার দিকে তাকিয়ে হতবাক।

জিজ্ঞেস করল, ‘বলো তীরন্দাজ, সাত্য করে বলো তো, চমৎকার এই গালিচাটা তুমি কোথায় পেলে?’

‘না, আমার বৌ বানিয়েছে।’

‘কত দাম চাও তুমি?’

‘আমি জানি না, বৌ বলে দিয়েছে দরাদরি কোরোনা, যা দেবে তাই নেব।’

‘তাহলে এই নাও দশ হাজার।’

আন্দুই টাকা নিয়ে গালিচাটা দিয়ে বাড়ী ফিরে চলল। মন্ত্রী প্রাসাদে ফিরে গালিচা দেখাল রাজাকে।

নিজের সমস্ত রাজষ্টা চোখের সামনে খেলা দেখে রাজা তো হতভব্ব। আহমারি করে বলে:

“যাই বলো মন্ত্রী, তোমাকে আর এ গালিচা ফিরিয়ে দিচ্ছ নে।”

কুড়ি হাজার রূপল রাজা নগদ ধরে দিলে মন্ত্রীকে। মন্ত্রী টাকা পেয়ে ভাবল: “যাক গে। আমি আর একথানা ফরমাশ দেব, এর চেয়েও সুন্দর।”

বাড়ী চড়ে মন্ত্রী চলে গেল সহরতলীতে। সেখানে তীরন্দাজ আন্দুই-এর বাড়ী খুঁজে বের করে দরজায় টোকা মারতে লাগল। দরজা খুলে দিল রাজকুমারী মারিয়া। মন্ত্রী এক পা দিল চৌকাঠের ওপারে, কিন্তু অন্য পা তার আর ওঠে না। কথা সবে না ঘুর্থে। কী জন্মে এসেছিল সব ভুলে গেল। সামনে তার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা, রূপ দেখে তার আশ ওটে না।

মন্ত্রী কী বলে শোনার জন্মে রাজকুমারী মারিয়া দাঁড়িয়ে রাইল, কিন্তু যখন দেখল মন্ত্রী একটি কথাও বলছে না, তখন মৃথ ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সম্বিত ফিরে এল মন্ত্রীর। বাড়ী ফিরে চলল। কিন্তু সেইদিন থেকে মন্ত্রীর খাওয়া দাওয়া গেল ঘুচে। সারাক্ষণ খালি সে তীরন্দাজের বৌয়ের কথা ভাবে।

রাজা বেশ বুঝলে মন্ত্রীর একটা কিছু হয়েছে, তাই একদিন জিজেস করলে ব্যাপার কী।

‘কী আর বলি রাজামশাই, তীরন্দাজের বৌকে দেখে আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমায় যেন যাদ, করে ফেলেছে, কিছুতেই সে মাঝা কাটাতে পারছি না।’

রাজা ভাবলে, “আমিও একবার তীরন্দাজের বৌকে দেখে আসি।” স্বাধারণ জামাকাপড় পরে রাজা গেল সহরতলীতে। আন্দুই-এর বাড়ী খুঁজে বের করে দরজায় টোকা মারল। দরজা খুলে দিল রাজকুমারী মারিয়া। রাজা এক পা বাড়াল চৌকাঠের দিকে, কিন্তু অন্য পা আর তার ওঠে নাও মুখে আর কথা সবে না। হাঁ করে রাজা এই অপূর্ব মুখের স্বর্গার্য রূপ দেখতে লাগল।

রাজা কী বলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল রাজকুমারী মারিয়া। কিন্তু রাজা যখন একটি খাও বললে না, তখন ঘৃণ্য ঘৃণ্যে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভীষণ দৃঃখ হল রাজার। ভাবলে, “আমিই বা কেন এক থাকি। এই তো আমার^১ উপযুক্ত এক সন্দৰ্ভী কন্যা। এমন মেয়ের রাজবাণী হওয়াই সাজে, তীরন্দাজের বৌ নয়।”

প্রাসাদে ফিরে, রাজার আথায় এক দৃঢ়ু বৃক্ষ এল — স্বামী বেঁচে থাকতেও বৌ চুরি করে আনবে। মন্ত্রীকে ডেকে বললে:

‘একটা উপায় বের করো মন্ত্রী, কী করে ঐ তীরন্দাজ আন্দুইকে তাড়ান যায়। আমি ওর বৌকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যদি আমায় সাহায্য করো, তবে সহর, গ্রাম, সোনাদানা অনেক কিছু উপহার দেব। আর যদি না করো তবে তোমার গর্দান যাবে।’

মন্ত্রীর ভীবণ ভাবনা হল। মাথা হেঁট করে ফিরে গেল, কিছুতেই আর আন্দুইকে তাড়ানর ফাঁল বের করতে পারে না। মনের দৃঃখে মন্ত্রী গেল শুঁড়ীখানায় মদ খেতে।

শুঁড়ীখানার এক নেশাখোর, গায়ে তার ছেঁড়া কাপড় জামা, সে এসে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে:

‘মনভার কেন রাজমন্ত্রী, মাথা হেঁট কেন?’

‘দূর হ, হতভাগা কোথাকার।’

‘আমায় তাড়িয়ে না দিয়ে যদি একটু মদ খাওয়াও, তবে খুব ভাল বৃক্ষ দিতে পারি।’

মন্ত্রী লোকটিকে এক গেলাশ মদ খাইয়ে তার দৃঃখের কথা খুলে বললে লোকটি বলল:

‘কাজটা তেমন কঠিন নয়, তীরন্দাজ আন্দুই তো ভারী সরল মাঝুম, তবে ওর বৌ ভারী বৃক্ষমতী, যাক গে, এমন একটা ফাঁল বের করতে হবে যাতে কিছুতেই ও পার না পায়। এক কাজ করো, বাড়ী গিয়ে^২ রাজাকে বলো আন্দুইকে হৃকুম দিক পরলোকে গিয়ে ও দেখে আসুন। রাজামশাইয়ের বাবা বৃক্ষে রাজা কেমন আছে। আন্দুই একবার গেলে আমি ফিরবে না।’

বদমাইস্টার ধন্যবাদ দিয়ে মন্ত্রী ছাটে গেল রাজাৰ কাছে।

‘আন্দুইকে সৱিয়ে দেবাৰ একটা উপায় বেৰ কৱেছি।’ বললে কোথাৱ
পাঠাতে হৈবৈ তাকে, কী কাজে! রাজা ভীষণ খুশী হয়ে তক্ষণ তীৰন্দাজ
আন্দুইকে ডেকে পাঠাল।

‘দেখো আন্দুই, তুমি এতদিন ন্যায়ধন্মে আমাৰ কাজ কৱেছো। আজ আৱ
একটি কাজ আমাৰ কৱো। পৱলোকে গিয়ে দেখে আসতে হবে আমাৰ বাবা
কেমন আছেন। নহিলে আমাৰ কৃপাণ, নেবে তোমাৰ গৰ্দান...’

আন্দুই বাড়ী ফিরে মন খারাপ কৱে চৌকিতে বসে রইল।

রাজকুমাৰী মারিয়া বলল:

‘মন খারাপ কেন আন্দুই, বিপদ হয়েছে কিছু?’

রাজা কী হৰুম কৱেছে আন্দুই সব কথা খুলে বলল।

রাজকুমাৰী মারিয়া বলল:

‘এ নিয়ে এত ভাবনা? এ আবাৰ কাজ নাকি, এত মেহাত ছেলেখেলা,
আসল কাজই বাকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বৰ্দ্ধি খোলে।’

পৱদিন সকালে আন্দুই ঘৰ থেকে উঠতেই রাজকুমাৰী মারিয়া এক থলি
শুকনো রূটি আৱ একটা সোনাৰ আংটি দিয়ে বলল:

‘রাজচাষাইকে গিয়ে বলো, মন্ত্রীকে তোমাৰ সঙ্গে থেতে হবে, তুমি সতীই
পৱলোকে গিয়েছিলে কিনা মন্ত্রী তাৰ সাক্ষী থাকবে। তাৱপৱ বাস্তাৱ বেৰিয়ে
সোনাৰ আংটিটা সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিও, আংটি তোমায় পথ দোখিয়ে দেবে।’

বৌকে বিদায় জানিয়ে শুকনো রূটি আৱ আংটি নিয়ে আন্দুই বাড়ী
কাছে গিয়ে বলল মন্ত্রীকে সঙ্গে দিতে হবে। রাজা আপন্তি কৱতে পাৱল মো।

মন্ত্রী আৱ আন্দুই দুজনে পথে বেৱল। আংটিটা গাড়িয়ে দিল আন্দুই।
খোলা মাঠ, পানা জলা, নদী, হৃদ পেৱিয়ে আন্দুই চলল আংটিব পিছু পিছু।
আৱ আন্দুই-এৱ পিছনে পিছনে কোনোক্ষমে আসে রাজাৰ মন্ত্রী।

হেঁটে হেঁটে ঝুন্ট হয়ে গেলে ওৱা কিছু শুকনো কুঁটি থেয়ে নেয়, তাৱপৱ
আবাৰ হাঁটা দেয়।

অল্পদূর নার্কি অনেকদূর, শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল এক বিজিবিজি গহন
বনের মধ্যে। সেখানে এক গভীর খাদের মধ্যে নেমে থেমে গেল আংটিটো।

আন্দেই আর মন্ত্রী কিছু শুকনো রূটি খাবে বলে বসল। এমন সময়
দেখে ঈক, বুড়ো থত্থড়ে রাজাকে দিয়ে কাঠ বইছে দুই শয়তান। সে কাঠের
অঙ্গ কী! রাজার দু'দিকে দুই শয়তান বসে লাঠি মেরে মেরে তাকে চালাচ্ছে।

আন্দেই বলল:

'দেখো দেখো, রাজার মরা বাবা না?'

মন্ত্রী বলল, 'তাই তো বটে। এযে দোথ সে-ই বোৰা বইছে।'

আন্দেই চীৎকার করে শয়তানদুটোকে ডেকে বললে:

'ও মশাইরা! বুড়োটাকে একবার ছেড়ে দাও না, দুটো কথা আছে।'

শয়তানরা বলল:

'আমাদের অত সময় নেই। নিজেরাই আমরা কাঠগুলো বয়ে নিয়ে থাব
নাক?'

'আমি তোমাদের একটা তাজা লোক দিচ্ছি, সে কিছুক্ষণ বুড়োর জায়গায়
কাজ করতে পারে।'

এই শুনে শয়তানগুলো বুড়োর ঘাড় থেকে জোয়ালটা থুলে মন্ত্রীর ঘাড়ে
পরিয়ে দিল। তারপর লাঠি দিয়ে একজন ডাইনে মারে, একজন বাঁয়ে মারে,
কুঝো হয়ে বোৰা টানতে সুরু করল মন্ত্রী।

আন্দেই তখন বুড়ো রাজাকে জিজেস করল কেমন তার দিন চলছে।

রাজা বলল, 'কী আর বলব, তীরন্দাজ আন্দেই? এ জগতে এসে বড় কষ্টে
দিন যাচ্ছে! ছেলেকে গিয়ে আমার কথা জানিও আর বলো, লোকের সঙ্গে যেন
খারাপ ব্যবহার না করে, নইলে এখানে এসে তারও দিন যাবে কষ্টে।'

কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই শয়তানগুলো থালি গাঢ়ী নিয়ে ফিরে এল।
আন্দেই বুড়ো রাজার কাছ থেকে বিদায় নিল, শয়তানদের কাছ থেকে মন্ত্রীকে
খালাস করে বাঢ়ী ফিরে চলল দুজনে।

দেশে পেঁচে ওরা তো প্রাসাদে গেল। রাজা আন্দেইকে দেখেই ক্ষেপে
আগুন।

বললে, ‘কুরে এলে যে বড় আচ্ছা আচ্পর্ধা তোমার?’

‘না, আপনার বাবার সঙ্গে পরলোকে দেখা করে এসেছি! বৃক্ষে
রাজমন্ত্রীয়ের বড় কষ্টে দিন কাটছে। আপনাকে আশীর্বাদ জানিয়ে খুব করে
বলেছেন, প্রজার উপর বেন অভ্যাচার না করেন।’

‘সত্ত্বাই যে পরলোকে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেছো তার প্রমাণ কী?’

‘আপনার মন্ত্রীর পিঠে শশতানন্দের জাঠির দাগগুলো দেখুন।’

মোক্ষম প্রমাণ! রাজা আর কী করে, ছেড়ে দিল আনন্দেইকে। আর মন্ত্রীকে
ডেকে বললে:

‘আনন্দেইকে সরিয়ে দেবার উপায় বের করো বাপ, নইলে আমার কৃপণ,
নেবে তোমার গর্দান।’

মন্ত্রীর এবার আরো দৃশ্যমান। শুধু খানায় গিয়ে মন্ত্রী মদ নিয়ে বসল
টেবিলে। অর্মান সেই বদমাইস্টা এসে হাজির। বলল:

‘কিসের এত ভাবনা তোমার, রাজমন্ত্রী? আমায় যদি একটু মদ খাওয়াও
তবে আমি ভাল বুঝি বাতলে দিতে পারি।’

মন্ত্রী তখন তাকে এক গেলাশ মদ দিয়ে সব কথা খুলে বলল। নেশাখোরটা
বলল:

‘রাজাকে গিয়ে বলো আনন্দেইকে এক কাজ দিতে — এ বাবা জবর কাজ,
দিশা পাওয়াই কঠিন, করা তো দূরের কথা। বলবে তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে,
তিন দশের রাজ্যে এক ঘূর্মপাড়ানী বেড়াল আছে, আনন্দেইকে সেটা এনে দিতে
হবে...’

রাজমন্ত্রী ছুটে গিয়ে আনন্দেইকে সরিয়ে দেবার উপায় বলল রাজাকে। ‘রাজা
আনন্দেইকে ডেকে পাঠাল।

‘শোনো আনন্দেই, তুমি আমার একটা কাজ করে দিয়েছো, আর একটা
কাজও করে দাও। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে গিয়ে
ঘূর্মপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এসো আমার জন্যে। নইলে আমার কৃপণ, নেবে
তোমার গর্দান।’

মাথা নীচে পরে বাড়ী ফিরল আন্দেই। বৌকে বলল রাজা কী কাজ দিয়েছে।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, ‘এ নিয়ে এত ভাবনা? এ তো কাজ নয়, দেশের লোক আসল কাজই ধাঁক। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বুর্বুর হলো।’

আন্দেই ঘূরতে গেল। রাজকুমারী মারিয়া তখন কানারের বাড়ী গিয়ে বলল তিনটে লোহার টুপি, একটা লোহার চিমটে আর তিনটে দণ্ড বানিয়ে দিতে — একটা লোহার, একটা তামার আর তৃতীয়টা টিনের।

পরদিন তোরে রাজকুমারী মারিয়া আন্দেইকে ঘূর থেকে তুলে দিয়ে বলল: ‘এই নাও তিনটে টুপি, একটা চিমটে, আর তিনটে দণ্ড — এবার তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে যাও। ওখানে পেঁচবার তিন ভাস্ট আগে তোমার ভীষণ ঘূর পাবে — ঘূরপাড়ানী বেড়াল তোমায় ঘূর পাড়াবে। কিন্তু খবরদার, ঘূরিয়ে পড়ো না। হাত দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, পা দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, মাটিতে গড়াগড়িও দেবে। ঘূরিয়ে পড়লেই কিন্তু বেড়াল মেরে ফেলবে তোমার।’

কী কী করতে হবে সব বুর্বুরে বলে আন্দেইকে বিদায় দিয়ে পাঠাল রাজকুমারী মারিয়া।

বলতে এতটুকু কিন্তু করতে এতখানি। তিন দশের রাজ্যে এসে পেঁচল আন্দেই। ঠিক তিন ভাস্ট আগে ভীষণ ঘূর পেতে লাগল তার। তখন তিনটে লোহার টুপি মাথায় পরে, হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে, পা দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে এগোয় আন্দেই, দরকার ঘতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নেয়।

কোনোকমে নিজেকে জাগিয়ে রাখল আন্দেই, এসে পেঁচল একটা জন্ম থামের কাছে।

ঘূরপাড়ানী বেড়াল আন্দেইকে দেখেই গুৱার গুৱার কল্প গজে উঠে থামের উপর থেকে লাকিয়ে পড়ল আন্দেই-এর মাথার উপর। প্রথম টুপটা ভেঙে, দ্বিতীয়টা ভেঙে, তৃতীয়টা ভাঙতে যাবে, তামানী আন্দেই বেড়ালটাকে চিমটে দিয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দণ্ড দিয়ে আচ্ছা করে পেটাতে লাগল। প্রথমে

মারল লোহার দণ্ড দিয়ে, সেটা ভেঙে যেতে মারল তামার দণ্ড দিয়ে, সেটাও ধখন ভেঙে গেল তখন টিনেরটা তুলে নিয়ে পেটাতে লাগল।

টিনের দণ্ডটা বেঁকে যায়, কিন্তু ভাঙে না। কেবল বেঁকে গিয়ে বেড়ালটার গায়ে জড়িয়ে যায়। আনন্দেই ঘত মারে বেড়ালটা তত গল্প শোনায় তাকে —
পুরুতদের গল্প, যাজকদের গল্প, পুরুত বাড়ীর মেয়ের গল্প। আনন্দেই কিন্তু কেনে কথা না শুনে ঘত জোর পারে কেবল মেরেই চলে।

বেড়াল আর পারে না। দেখে তুকতাকে চলবে না, তাই অনুনয়-বিনয় স্থান করল:

‘ছেড়ে দাও সুজন, যা বলবে তাই করব।’

‘আমার সঙ্গে যাবি?’

‘থেখানে বলবে যাব।’

আনন্দেই বেড়ালটা নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে স্থান করল। দেশে ফিরে বেড়ালটাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। বললে:

‘তা, হকুম তামিল করেছি, ঘৃমপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এসেছি।’

রাজা তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে চায় না। বললে:

‘তা ঘৃমপাড়ানী বেড়াল, দেখা ও দৰ্থি তোমার তেজ।’

বেড়াল অর্ধনি থাবায় শান দেয়, রাজাকে আঁচড়ায়, এই বৃক্ষ রাজার বৃক্ষ চিরে জ্যান্ত হৎপন্থটাই বের করে আনে।

ভয় পেয়ে গেল রাজা:

‘থামাও ওকে বাপু, তীরন্দাজ আনন্দেই।’

আনন্দেই বেড়ালটাকে শান্ত করে থাঁচায় পুরুল, নিজে ফিরে গেল রাজমন্ত্রীর মারিয়ার কাছে। দ্রষ্টিতে মনের আনন্দেই থাকে। রাজার কিন্তু বক্তুর মধ্যে আরো বেশী জবালাপোড়া। একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বললে:

‘যে ক’রে পারো, উপায় করো, তীরন্দাজ আনন্দেইকে সম্পূর্ণ। নইলে আমার ক্ষপণ, নেবে তোমার গর্দান।’

রাজমন্ত্রী সোজা গেল শুঁড়ীখানায়। ছেঁড়া জানা পরা সেই বদমাইস্টাকে

খুঁজে বার করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সাহায্য চাইল। বদমাইসটা তার মদের শেলোশ উজাড় করে গোঁফ ঘূঁচে বললে:

‘রাজামশাইকে গিয়ে বলো, আন্দেই অ-জ্ঞানি দেশ থেকে না-জ্ঞানি কী নিয়ে আস্তুক। একজ আন্দেই সারা জীবনেও করতে পারবে না, ফিরেও আর আসবে না।’

ছুটে গিয়ে রাজাকে সব বলল মন্ত্রী। রাজা আন্দেইকে ডেকে পাঠালে। বললে:

‘তুমি আমার দৃঢ়টো কাজ করে দিয়েছো, এবার ততীয় কাজটাও করো। অ-জ্ঞানি দেশ থেকে না-জ্ঞানি কী-কে নিয়ে এসো। যদি পাবো, রাজার মতো খেলাং করব। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।’

আন্দেই বাড়ী ফিরে ঢোকিতে বসে কাঁদতে লাগল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

‘কী গো, এমন মনভার কেন গো? আবার কোনো বিপদ নাকি?’

আন্দেই বলল, ‘কী আর বলি, তোমার রংপই আমার কাল হল। রাজা হৃকুম করেছেন অ-জ্ঞানি দেশ থেকে না-জ্ঞানি কী আনতে হবে।’

‘হ্যাঁ, এটা একটা কাজের মতো কাজ! কিন্তু কিছু ভেবো না। শোও গে যাও, বাত পোয়ালে বুর্জি খোলে।’

রাত হতেই রাজকুমারী মারিয়া খুলে বসল তার যাদুর বই। পড়ে পড়ে তারপর বই ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসল: রাজামশাইয়ের কাজটার কথা বইয়ে কিছুই লেখা নেই। তখন রাজকুমারী মারিয়া অলিল্দে গিয়ে রূমাল বের করে নাড়তে লাগল। অর্মানি উড়ে এল যত পার্থি, ছুটে এল যত পশ্চি।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

‘বনের পশ্চি, আকাশের পার্থি, বলো তো! পশ্চি—তোমরা সব জায়গায় চৰে বেড়াও, পার্থি—তোমরা সব জায়গায় উড়ে বেড়াও। শোনেন্তি কখনো কী করে অ-জ্ঞানি দেশে গিয়ে না-জ্ঞানি কী আনা যায়?’

পশ্চ-পার্থির দল বলল:

‘না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শুনিনি।’

আবার রুমাল নাড়ল রাজকুমারী মারিয়া। পশ্চপার্থির দল নিমেষের মধ্যে
কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজকুমারী তৃতীয় বার রুমাল নাড়তেই এসে দাঁড়াল
দুই দৈত্য।

‘কী আজ্ঞা, কী হস্তুম?’

‘বিশ্বাসী দাসেরা আমার, নিয়ে চলো আমায় মহাসম্ভুদ্রের মাঝখানে।’

দৈত্যদুটো রাজকুমারী মারিয়াকে ধরে মহাসম্ভুদ্রের ঠিক মাঝখানে নিয়ে গিয়ে
গভীর জলে দাঁড়িয়ে পড়ল উঁচু স্তম্ভের মতো। রাজকুমারীকে দুই হাতে তুলে ধরে
রাখল জলের ওপর। রাজকুমারী মারিয়া একবার রুমাল নাড়তেই সম্ভুদ্রের
যত মাছ, যত প্রাণী সব এসে হাঁজির।

‘সম্ভুদ্রের মাছ, সম্ভুদ্রের প্রাণী, তোমরা তো সবখানে সাঁতরে বেড়াও,
সব দৌপৈ ঘাও, শোনোনি কখনো কী করে অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী
আনা যায়?’

‘না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শুনিনি।’

মৃষ্টড়ে পড়ল রাজকুমারী মারিয়া। দৈত্যদুটোকে বলল বাড়ী নিয়ে যেতে।
দৈত্যদুটো তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল বাড়ীর অলিঙ্গে।

পরদিন সকালে আল্লেইকে বিদায় দেবার জন্যে রাজকুমারী মারিয়া
তাড়াতাড়ি ঘূর ছেড়ে উঠল। তারপর আল্লেইকে এক সূতোর গোলা আর
একটা নস্তা কাটা গামছা দিয়ে বলল:

‘সামনে এই সূতোর গোলা গড়িয়ে দেবে। ওটা যে দিকে গড়াবে সে দিকে
যেও। আর যেখানেই থাকো হাত মুখ ধোবার সময় পরের গামছায় মুছো না,
আমার গামছায় মুছো।’

আল্লেই রাজকুমারী মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারদিককে নমস্কার
করে সহরের ফটক পার হল। তারপর সূতোর গোলা গড়িয়ে দিল সামনে।
সূতোর গোলা গড়ায়, আল্লেইও পিছন পিছন যায়।

বলতে এতটুকু কিন্তু করতে এতখানি। চলতে চলতে আল্লেই কত রাজ্য,
কত আজব দেশ পেরিয়ে গেল। সূতোর গোলা গড়াতে গড়াতে ছোট হতে হতে
ক্রমে একেবারে মূরগীর ডিমের মতো হয়ে গেল। তাবেশ এত ছোট হয়ে গেল

যে আর চোখেই পড়ে না ... আন্দেই তখন একটা বনের কাছে এসে দেখে মুরগীর পায়ের উপর একটা ছোট কুঁড়ের।

আন্দেই বলল, ‘কুঁড়ের, ও কুঁড়ের, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে শুধু করে দাঁড়াও তো !’

কুঁড়েরটা ঘুরে গেল। আন্দেই ঘরে ঢুকে দেখে, এক পাকাচুলো বৃক্ষ ডাইনী বেঁশিতে বসে বসে টাকু ঘোরাচ্ছে।

‘হাউমাউথাউ, রূপীর গন্ধ পাউ ! কখনো চোখে দৈর্ঘ্যন যাবে, সে দৈর্ঘ্য এল আমার দ্বারে। জ্যান্ত তোকে ভেজে খাব, হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াব !’

আন্দেই বলল:

‘হয়েছে, হয়েছে বৃক্ষী বাবা-ইয়াগা ! হঠাৎ ভবধূরেকে খাওয়ার স্থ কেন ? ভবধূরের তো কেবল হাঁড়ি চামড়াই সার ! আগে চানের জল গরম করো, ধোয়াও, চান করাও, তারপর খেও !’

বাবা-ইয়াগা তো চানের আগন্ম জেবলে জল গরম করল। আর আন্দেই গা ধূয়ে বেরিয়ে এল বৌঝের দেওয়া গামছায় গা মুছতে মুছতে।

বাবা-ইয়াগা জিজ্ঞেস করল:

‘এ গামছা তুমি পেলে কী করে ? এ যে দৈর্ঘ্য আমার মেয়ের হাতের নম্বা তোলা !’

‘তোমার মেয়েই যে আমার বৌ ! সেই আমাকে গামছাটা দিয়েছে !’

‘ও তাই নাকি বাছা ! এসো এসো, তুমি যে আমার কত আদরের জামাই !’

বাবা-ইয়াগা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে কত রকম খাবার, কত রকম পানীয়, কত রকমের সব ভাল ভাল জিনিস টেবিলের উপর সাজিয়ে দিল। আন্দেই কেম ভাণ্ডতা না করে বসেই খাবার কাজে লেগে গেল। বাবা-ইয়াগা পাশে বসে বসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কী করে আন্দেই রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করল, তারা বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে আছে কিনা। আন্দেই সব কথা তাকে জানাল। তারপর রাজা যে তাকে অ-জানি দেশের না-জানি কী আনতে পারিয়েছে সে কথাও বলল।

আন্দেই বলল, ‘তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য করতে বৃক্ষী !’

‘কী আর বললু যাছা, হায় হায়, এমন তাঙ্গবের তাজজব, আমিও কখনো
শুনিনি। ও রঞ্জিনীনে কেবল এক বুড়ী ব্যাঙ। সে আজ ‘তিনশ’ বছর হল জলায়
বাস করলেই যাক গে, কিছু ভেবো না, শুতে যাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।’

আনন্দেই শুয়ে পড়ল আর বাবা-ইয়াগা দৃঢ়ো বাচ’ গাছের বাঁটা নিয়ে উড়ে
চলে গেল সেই জলার কাছে। সেখানে গিয়ে ডেকে বলল:

‘ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙ, বেঁচে আছো?’

‘আছি।’

‘বেরিয়ে এসো জলা থেকে।’

জলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বুড়ী ব্যাঙ। বাবা-ইয়াগা বলল:

‘না-জানি কী কোথায় জানো কি?’

‘জানি।’

‘তাহলে দয়া করে বলে দাও কোথায়। আমার জামাইকে রাজা অ-জানি
দেশ থেকে না-জানি কী আনতে পাঠিয়েছেন।’

বুড়ী ব্যাঙ বলল:

‘আমি নিজেই তাকে নিয়ে যেতুম, কিন্তু বস্ত বৃত্তো হয়ে পড়েছি। অতটী
লাফের সাধ্য নেই। তোমার জামাইকে বলো আমায় এক ভাঁড় টাটকা দূধের
মধ্যে করে নিয়ে যাক জবলস্ত নদীতে। তখন বলব।’

বাবা-ইয়াগা ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙকে নিয়ে উড়ে এল বাড়ী। এক ভাঁড়
টাটকা দূধ দুইয়ে বুড়ী ব্যাঙকে তার মধ্যে রাখল। পরদিন খুব ভোরে
আনন্দেইকে তুলে দিয়ে বলল:

‘তা জামাই, তৈরি হয়ে নাও, টাটকা দূধের ভাঁড়টা ধরো, এতে বুড়ী ঘ্যাঙ
আছে। আমার ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও জবলস্ত নদীতে। সেখানে ঘোড়ার ছেড়ে
দিয়ে বুড়ী ব্যাঙকে ভাঁড় থেকে বের করো। বুড়ী ব্যাঙ তোমার সব বলে
দেবে।’

আনন্দেই তৈরী হয়ে ভাঁড়টা হাতে নিল, তারপর বাবা-ইয়াগার ঘোড়ায় চড়ে
রওন্না দিল। অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, শেষ পর্যন্ত জবলস্ত নদীর কাছে

পেঁচল আন্দেই। সে নদী লাফিয়ে পেরবে এমন জন্ম নেই, উড়ে যাবে এমন
পার্থ নেই।

আন্দেই ঘোড়া থেকে নামতে বৃড়ী ব্যাঙ বলল:

‘এবার বাছা, আমায় ভাঁড় থেকে বের করে নাও। নদী পেরতে হবে।’

আন্দেই বৃড়ী ব্যাঙকে ভাঁড় থেকে বের করে মাটিতে রাখল।

‘এবার সুজন, আমার পিঠে চড়ে বসো।’

‘সেকি দিদিমা, তুম যে এতটুকু, আমার চাপে পিষে যাবে।’

‘ভয় নেই, কিছু হবে না, ভাল করে ধরে থাকো।’

বৃড়ী ব্যাঙের পিঠে চেপে বসল আন্দেই। ব্যাঙ অর্ধনি নিজেকে ফোলাতে
সুরু করল। ফুলতে ফুলতে একটা বিচালির অঁটির মতো বড় হয়ে উঠল ব্যাঙ।

‘চেপে ধরেছো তো শক্ত করে?’

‘হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।’

আবার ব্যাঙ ফুলতে সুরু করল। ফুলতে ফুলতে বড় হয়ে গেল একটা
বিচালির গাদার মতো।

‘চেপে ধরেছো তো শক্ত করে?’

‘হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।’

আবার ফুলতে সুরু করল ব্যাঙ। ফুলতে ফুলতে এবার সে ঘন বনের
চেয়েও উঁচু হয়ে গেল। তারপর এক লাফে একেবারে জলন্ত নদীর ওপারে।
ওপারে গিয়ে আন্দেইকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে সে আবার আগের মতো
ছোটটি হয়ে গেল।

‘চলে যাও সুজন, এই পায়ে হাঁটা পথ ধরে, দেখবে এক কোঠা বাড়ি—
অথচ কোঠা নয়, কুঁড়েঘর—অথচ কুঁড়ে নয়, চালা—অথচ চালা নয়। গিয়ে
সোজা ভিতরে চুকে চুল্লীর পিছনে দাঁড়িয়ে থেকো। সেখানেই পাবে না-জানি
কী।’

পথ ধরে চলল আন্দেই, দেখে, এক পূরনো কুঁড়েঘর কিন্তু কুঁড়ে নয়।
জানালা নেই, অলিঙ্গ নেই, বেড়া দিয়ে দেরা। আন্দেই ভিতরে চুকে চুল্লীর
পিছনে লুকিয়ে রাইল।

একটু পরেই মনের মধ্যে ইডমণ্ড, ঘড়মণ্ড শব্দ। ঘরে এসে তুকল এক বুড়ো আঙ্গুলে দাদা, তার দাঁড়ি শাদা শাদা। তুকেই সে চীৎকার করে উঠল:
‘ওহে নাউম বেয়াই, খেতে দাও!’

মুখ্যথেকে কথা খসতে না খসতেই শূন্য থেকে একটা টেবিল এসে হাঁচে। টেবিলের ওপর এক পিপে বিয়র আর একটা রোস্ট করা ধারালো ছাঁচির বেঁধান আন্ত ষাঁড়। দাঁড়ি-শাদা-শাদা বুড়ো আঙ্গুলে দাদা, ষাঁড়টার সামনে বসে ধারালো ছুরিটা বের করে মাংস কাটে, রসুন ঘষে, খায় দায়, তারিফ করে।

ষাঁড়টার আপাদমন্ত্রক শেষ করল সে, বিয়রের পিপে খালি করে দিল। বলল:
‘ওহে নাউম বেয়াই, এটো পরিষ্কার করে নাও!’

অর্মানি সঙ্গে সঙ্গে হাড়গোড়, বিয়র পিপেশুন্দু কোথায় মিলিয়ে গেল টেবিলটা... বুড়ো আঙ্গুলে দাদা কতক্ষণে বেরিয়ে যায় আন্দেই সেই অপেক্ষায় রইল। তারপর বেরিয়ে যেতেই চুল্লীর পিছন ছেড়ে এসে আন্দেই ভরসা করে ডেকেই ফেলল:

‘নাউম বেয়াই, আমায় কিছু খেতে দাও...’

কথাটা মূখ থেকে বেরতে না বেরতেই কোথেকে যেন একটা টেবিল এসে গেল। আর তার উপর কত রকম খাবার দাবার, মধু মদ।

আন্দেই টেবিলে বসে বলল:

‘নাউম বেয়াই, তুমি ও বসো, একসঙ্গে খাওয়া যাক।’

কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু উত্তর এল:

‘ধ্যবাদ তোমায় সুজন! কত বছর ধরে এখানে কাজ করছি, কিন্তু কেউ কোনদিন আমায় একটুকরো পোড়া রুটি খেতে দের্ঘনি। আর তুমি আঝকে টেবিলে বসে খেতে ডাকলে।’

আন্দেই তো হতবাক। কাউকে দেখা যাচ্ছে না অথচ খাবারগুলো যেন বেঁটিয়ে সাফ হচ্ছে। আপনা থেকেই মদ আর মধুতে গেলাশ উরে উঠছে। আপনা থেকেই খুটখুট করছে গেলাশ।

আন্দেই বলল:

‘নাউম বেয়াই, একবার দেখা দাও না !’

‘না, আমাকে তো দেখা যায় না। আমি হলাম না-জ্ঞানি কী !’

‘নাউম বেয়াই, তুমি আমার কাছে কাজ করবে ?’

‘করব না কেন। দেখছি, লোকটা তুমি ভালো।’

থাওয়া শেষ হলে আনন্দেই বলল:

‘টেবিলটা পরিষ্কার করে ঢলো আমার সঙ্গে !’

কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আনন্দেই আশেপাশে তাকাল।

‘নাউম বেয়াই, আছো তো এখানে ?’

‘হ্যাঁ আছি, ভয় নেই। তোমায় আমি ছেড়ে যাব না !’

হাঁটতে হাঁটতে আনন্দেই এসে পোঁছল জবলস্ত নদীর পাড়ে। সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করে ছিল ব্যাঙ।

‘কী সূজন, না-জ্ঞানি কী পেলে ?’

‘পেয়েছি, দিদিমা !’

‘তাহলে এবার আমার পিঠে চড়ে বসো !’

আনন্দেই পিঠে চড়ে বসল আর ব্যাঙ নিজেকে ফোলাতে সুরু করল আবার।
তারপর এক লাফে আনন্দেইকে জবলস্ত নদী পার করে দিল।

আনন্দেই ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের দেশের পথ ধরল।
আনন্দেই একটু ধায় আর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে:

‘কি নাউম বেয়াই, আছো তো ?’

‘আছি আছি, কোনো ভয় নেই তোমার। ছেড়ে যাব না !’

আনন্দেই হাঁটে আর হাঁটে। দ্রুরের পথ। এলিয়ে পড়ে তার সবল-পা,
নেতৃত্বে পড়ে তার ধ্বল হাত।

বলে, ‘ওহ, কী ক্লান্তই না হয়ে পড়েছি !’

নাউম বেয়াই বলল:

‘আগে বললে না কেন ? আমি তোমায় পলকের মধ্যে শক্তি পেঁচে দিতুম !’

হঠাতে একটা ঝড় এসে আনন্দেইকে পাহাড়, পর্বত, ঘন, সহর, গ্রাম পেরিয়ে

উড়িয়ে নিয়ে চল্লিপ এক গভীর সম্মুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে থাবার সময় আন্দোই
ভয় পেয়ে বলল:

‘নাউম বেয়াই, একটু বিশ্রাম করতে পারলে হত !’

আবান থেমে গেল হাওয়া। আন্দোই নামতে লাগল। দেখে কি, থেখানে নীল
টেক গজরাছিল, সেখানে একটা দ্বীপ হয়ে গেছে। সে দ্বীপে এক সোনার
ছাদওয়ালা প্রাসাদ আর তার চারাদিক ঘিরে অপরূপ বাগান.... নাউম বেয়াই
আন্দোইকে বলল:

‘বিশ্রাম করো গে, চৰ্বি-চোষ্য-লেহা-পেয় খাও আর সম্মুদ্রের দিকে নজর
রেখো। তিনটে সওদাগরী জাহাজ আসবে। তাদের নেমন্তন্ত্রে ডেকো, ভালো করে
আপ্যায়ন করো। ওদের কাছে তিনটে আজব জিনিস আছে, চেয়ে নিও। তার
বদলে আমায় দিয়ে দিও। ভয় নেই, আমি আবার ফিরে আসব।’

অনেকদিন নার্কি অল্প দিন, দেখে কি, তিনটে জাহাজ পশ্চিম থেকে এগিয়ে
আসছে। নার্বিকরা দেখে একটা দ্বীপ, তার মধ্যে অপরূপ বাগানে ঘেরা সোনার
ছাদওয়ালা এক প্রাসাদ।

ওরা বলাবলি করল, ‘কী আশ্চর্য ! কতবার এই পথে গেছি, নীল টেক ছাড়া
কিছুই চোখে পড়েন তো। চলো জাহাজ তৈরে লাগাই !’

জাহাজ তিনটে নোঙ্র ফেলল। আর তিনজন সওদাগর ডিঙি করে এগিয়ে
এল পাড়ের দিকে। তীরলাজ আন্দোই আগেই সেখানে অভ্যর্থনার জন্যে
হাজির।

‘আসুন, আসুন অর্তিথি সজ্জন !’

সওদাগররা ঘত দেখে তত অবাক হয়। আগুনের মতো জবলহে পুরোয়
ছাদ। গাছে গাছে পাথির গান, পথে পথে অপরূপ সব প্রাণী।

‘বলো তো সুজন, কে এখানে এমন আশ্চর্য প্রাসাদ বানানে ?’

‘আমার চাকর নাউম বেয়াই এসবই বানিয়েছে এক রাতের মধ্যে।’

আন্দোই অর্তিথদের নিয়ে গেজ পুরীর ভেতরে। বলল:

‘ওহে নাউম বেয়াই, আমাদের কিছু খেতে দাও তো !’

হঠাতে শুনা থেকে একটা টেবিল এসে দাঁড়াল। আর তার উপর নানা
রকম চৰ্বি-চোষ্য-পানীয়। যা মন চায় সব। সওদাগররা একেবাবে অবাক।
বলল:

‘এসো আমরা বদলাবদলি করি। তোমার চাকরটিকে আমাদের দাও, তার
বদলে আমাদের যে কোনো একটা আজব জিনিস তুমি চাও দেব।’

‘বেশ, তা কী কী আজব জিনিস তোমাদের আছে?’

এক সওদাগর জামার নীচ থেকে একটা মৃগুর বের করল। কেবল বলতে
হবে: “দে তো মৃগুর হাড় গাঁড়িয়ে!” ব্যস, অর্মানি মৃগুর লেগে যাবে কাজে।
যত বড়ো পালোয়ানই হোক না কেন, তার হাড় গাঁড়িয়ে ছাড়বে।

আর এক সওদাগর পোষাকের নীচ থেকে বের করল একটা কুড়ুল। সোজা
করে কুড়ুলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা মাত্রই খটাখট খটাখট ঘা পড়তে লাগল আর
তৈরি হয়ে গেল একটা জাহাজ। খটাখট খটাখট — হয়ে গেল আর একটা জাহাজ।
একেবাবে পাল তোলা, কামান লাগানো, মার্বিমাল্লায় ভরা। জাহাজগুলো চলতে
স্বীকৃত করল, কামানে তোপ পড়ল, মার্বিমাল্লারা হ্রস্ব চাইল।

সওদাগর কুড়ুলটা উল্টে রাখা মাত্র জাহাজ-টাহাজ সব মিলিয়ে গেল। যেন
কিছুই ছিল না।

এবার তৃতীয় সওদাগর পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে বাজাতে আরম্ভ
করল, অর্মানি এক দল সৈন্য এসে হাজির: তাদের কেউ সওয়ারী, কেউ পদাতিক
কারো হাতে বল্দুক, কারো কাছে কামান। কুচকাওয়াজ স্বীকৃত হয়ে গেল,
তুরীভেরী বেজে উঠল, আকাশে উড়ল পতাকা, ঘোড়সওয়াররা হ্রস্ব
চাইল।

সওদাগর তারপর বাঁশির অন্য মুখে ফুঁ দিতেই, ব্যস — ভোঁ মিলিয়ে
গেল সব।

তৌরন্দাজ আন্দেই বলল:

‘তোমাদের আজব জিনিসগুলো ভালোই, তবে আমারটার দাম আরও
বেশী। আমার চাকর, নাউম বেয়াইকে বদলি করতে পারির যদি তোমরা ঐ
তিনটে জিনিসই আমায় দিয়ে দাও।’

‘একটু বাড়াড়ি হচ্ছে না ভাই?’

‘নয়ত বুলিগ করব না, বুঝে দেখো।’

সওদাগরেরা ভেবে দেখল: “মৃগুর, কুড়ুল, বাঁশি দিয়ে আমাদের কীই বা হবে? তার বদলে নাউম বেয়াই পেলেই ভাল। রাতে দিনে খাওয়া দাওয়ার কেননো ভাবনাই থাকবে না।”

সওদাগরেরা আন্দেহিকে মৃগুর, কুড়ুল, বাঁশি দিয়ে দিল। তারপর চীৎকার করে বলল:

‘ওহে নাউম বেয়াই, আমরা তোমার নিয়ে ঘাব! ধম্মমতে কাজ করবে তো?’

আওয়াজ শোনা গেল:

‘করব না কেন? যার কাছেই কাজ করি আমার কাছে সবাই সমান।’

সওদাগরেরা তখন জাহাজে ফিরে গিয়ে ফুর্তি জমাল। খায়, দায়, আর কেবল হুকুম দেয়:

‘নাউম বেয়াই, এই আনো, সেই আনো!’

খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বেদম মাতাল হলে যেখানে ছিল সেখানেই চুলে পড়ল।

ওদিকে তীরল্দাজ আন্দেহ প্রাসাদে একা বসে বসে ঘন খারাপ করে আর ভাবে: “হায় হায়, কোথায় গেল আমার সেই অনুগত চাকর নাউম বেয়াই?”

‘এই যে আমি, কী চাই?’

আন্দেহ তো মহা খুশী।

‘বাঢ়ী ফেরার সময় হয়েছে, ঘরে আমার কচি বৌ! নাউম বেয়াই আবার বাঢ়ী নিয়ে চলো।’

আবার একটা জোর ঝড় উঠল আর আন্দেহিকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল একেবারে তার নিজের দেশে।

এদিকে তো ঘূম থেকে জেগে উঠে সওদাগরদের গা মাঝম্যাজ করে, তেষ্টায় ছাতি ফাটে।

‘ওহে নাউম বেয়াই, দেখি, কিছু খাবার দাবার এনে দাও তো, একটু চাঙ্গা
করে দাও।

কঙ্কাল, কত ডাক, কিছুতেই কিছু হয় না। তাকিয়ে দেখে, দ্বীপ কোথায়
মিলিয়ে গেছে। চারদিকে কেবল ফুঁসে উঠছে নীল টেউ।

সওদাগররা ভীষণ চটে গেল। “আচ্ছা বদ লোক তো, আমাদের এমন
করে ঠকাল!” কিন্তু তখন আর উপায় নেই, পাল খাটিয়ে যেদিকে ধাবার
সেদিকে গেল।

তীরন্দাজ আন্দেই এদিকে দেশে গিয়ে তার কুংড়েঘরটার পাশে নামল।
কিন্তু দেখে কী, কোথায় তার কুংড়েঘর, একটা পোড়া কালো চিমানি ছাড়া আর
কিছুই সেখানে নেই।

দৃঢ়ে মাথা নীচু করে সে সহর ছেড়ে চলে গেল নীল সমুদ্রের ধারে এক
বিজন জায়গায়। সেখানে বসে আছে তো আছেই। হঠাতে কোথা থেকে উড়ে এল
একটা ঘূঘূ। মাটি ছুঁতেই ঘূঘূ পাখিটা হয়ে গেল আন্দেই-এর বৌ রাজকুমারী
মারিয়া।

দূজনে দূজনকে জড়িয়ে ধরে তখন কত কথা, কত কুশল, সবকিছু
শুধুয়, সবকিছু বলে।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

‘যে দিন থেকে তুমি বাড়ী ছেড়ে গেছো, সেদিন থেকে আমি বনে বনে
ঝোপে বাড়ে ঘূঘূ হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। তিন তিন বার রাজা আমার খোঁজে
লোক পাঠিয়েছে। আমায় থুঁজে না পেয়ে বাড়ীটাই পুরুড়িয়ে দিয়েছে।’

আন্দেই বলল:

‘নাউম বেয়াই, নীল সমুদ্রের পাড়ে একটা প্রাসাদ তৈরী করে দিতে পারো?’

‘কেন পারব না? নিমেষের মধ্যেই করে দিচ্ছি।’

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রাসাদ একেবারে তৈরী। আর সে
কী জমকালো প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের চেয়েও তের ভাল। চারদিকে সবুজ বাগান।
গাছে গাছে পাঁথির গান, পথে পথে কত অপরূপ প্রাণী।

তীরন্দাজ আন্দেই আর রাজকুমারী মারিয়া তুকন প্রাসাদে। জনলার পাশে

বসে তারা দৃঢ় দোঁহা গল্প করে, দেখে দেখে আর আশ ঘেটে না। এই ভাবে মহা আনন্দে দিন কাটে, একদিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন থাক।

রাজপুর্ণাদকে শিকার করতে গিয়ে দেখে, নীল সমুদ্রের ধারে আগে যেখানে কিছু ছিল না, সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ।

‘আমার অনুর্মাতি না নিয়ে কোন হতভাগা আমারই জর্মিতে বাড়ী তুলেছে?’
তক্ষণ দৃঢ় ছুটল। খেঁজখবর নিয়ে জানাল সেই যে তীরল্দাজ আন্দেই, সে এই প্রাসাদ বানিয়ে তার বৌ রাজকুমারী মারিয়াকে নিয়ে বসবাস করছে।

রাজা গেল আরো ক্ষেপে। দৃঢ় পাঠাল খবর আনতে সত্যই আন্দেই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী এনেছে কিনা।

আবার দৃঢ় ছুটল। ফিরে এসে খবর দিল:

‘হ্যাঁ মহারাজ, আন্দেই সত্যই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী নিয়ে এসেছে।’

এই কথা শুনে তো রাজা একেবারে রেগে আগুন, তেলে বেগুন। তক্ষণ সৈন্যসামন্ত ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিল সমুদ্র তীরে গিয়ে আন্দেই-এর প্রাসাদ যেন ধূলোয় ঘূর্ষিয়ে দেওয়া হয়। তীরল্দাজ আন্দেই আর রাজকুমারী মারিয়াকে যেন হত্যা করা হয় নিষ্ঠুরভাবে।

আন্দেই দেখে, প্রবল এক সৈন্যবাহিনী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। তক্ষণ সে কুড়ুলটা টেনে নিয়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। কুড়ুল চলল খটাখট খটাখট — অর্মান জাহাজ ভাসল সমুদ্রে। খটাখট খটাখট — অর্মান আর একটা জাহাজ। একশ' বার কুড়ুল চলল, একশ' জাহাজ পাল তুলে দাঁড়াল সমুদ্রে।

আন্দেই বাঁশিটা বের করে বাজাতেই হাজির হল সৈন্যদল। তান্দেই কেউ সওয়ারী, কেউ পদার্থিক, কারো হাতে বল্দুক, কারো কাছে কামান, কারো কাছে নিশান।

সেনাপতিরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, হুকুমের জন্যে দাঁড়াওয়ে আন্দেই হুকুম দিল যন্ত্র স্বরূপ করয়ে। অর্মান তুরীভেরী কাড়া-নাকাড়া রণবাদ্য বেজে উঠল। এগোতে স্বরূপ করল সৈন্যদল। পদার্থিকরা ঝুঁঝাখার করে রাজসৈন্য।

যোড়সওয়াররা আপিয়ে পড়ে বন্দী করতে থাকে। একশ' জাহাজের কামান
থেকে গোলা ছোটে।

রাজা দেখল, সৈন্যরা তার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, নিজেই ছুটলে তাদের
থামতে। আন্দেই তখন তার মুগ্ধরটা বের করে বলল:

'দে মুগ্ধ রাজার হাড় গাঁড়িয়ে!'

অমনি মুগ্ধ তিড়িৎ লাফে ঘাঠ পৌরয়ে ধেয়ে গেল। রাজাকে ধরে ফেলে
তার কপালে এমন এক ঘা কষিয়ে দিল যে রাজা সেখানেই লুটিয়ে পড়ল প্রাণ
হারিয়ে।

অমনি যন্ত্র থেমে গেল। সহরের সব লোকেরা সহর থেকে বেরিয়ে এসে
তীরন্দাজ আন্দেইকে তাদের রাজা হবার জন্যে মিনতি করতে লাগল।

আন্দেইও আপত্তি করল না। বিরাট এক ভোজ দিয়ে রাজকুমারী মারিয়াকে
নিয়ে সারা জীবন স্বীকৃত করতে লাগল সে।



ঞ্জুদে ইডান বড় বুদ্ধিমান

অনেককাল আগে ছিল এক বৃক্ষে আর বৃক্ষী। বৃক্ষে রোজ পশ্চপাঁথ
মেরে আনত। সেই খেয়েই বেঁচে থাকত। বয়স অনেক হল, কিন্তু জনসম্পদ
নেই। বৃক্ষী তাই নিয়ে রোজ দণ্ড করত, ঘ্যানঘ্যান করত:

‘সারা জীবন কেটে গেল, না পেলাম একটা ভালো কিছু, খেতে, না পেলাম
ভালো কিছু, পরতে। ছেলেপুলেও নেই যে বৃক্ষে বয়সে আমাদের দেখাশোনা
করে।’

বুড়ো সান্তুন্দিরে বলল, ‘দুঃখ করো না বুড়ী, দুঃখ করো না। যত্তিদিন আমার এই দুটো হাত আর দুটো পা আছে, তত্তিদিন খাওয়া জোটাব। তার পরের কথা ভেবে কৌ হবে।’

এই বলে বুড়ো ঢলে গেল শিকারে।

সেদিন সকাল থেকে রাত অবধি বুড়ো বনের মধ্যে ঘূরে বেড়াল, কিন্তু একটা পাখ পশু কিছুই মারতে পারল না। খালি হাতে বাড়ী ফিরতে ঘন চাইছিল না। কিন্তু উপায় নেই। ওদিকে স্বৰ্য ডুবে যাচ্ছে — বাড়ী ফেরার সময় হল।

বুড়ো যেই বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে, অর্মান ডানার আওয়াজ শোনা গেল। বোপ থেকে মাথা তুললে অপূর্ব সন্দের একটা বড়মত্তো পাখি।

কিন্তু নিশানা ঠিক করতেই উড়ে পালিয়ে গেল পাখিটা।

‘দেখা যাচ্ছে কপালে নেই।’

যে বোপ থেকে পাখিটা বেরিয়ে এসেছিল বুড়ো সেখানে উৎক দিয়ে দেখে, একটা বাসা, তাতে তেগ্রিশটা ডিম।

‘নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল,’ এই বলে বুড়ো তার কোমরের বাঁধুনিটা এঁটে নিয়ে তেগ্রিশটা ডিমই তার পোষাকের মধ্যে পুরে বাড়ীমুখো রওনা দিল।

চলতে চলতে বুড়োর কোমরের বাঁধুনি কখন গেল আলগা হয়ে, আর ডিমগুলো সব ফাঁক দিয়ে পড়ে যেতে লাগল।

একটা করে ডিম পড়ে, আর তার ভিতর থেকে একটি করে তরুণ বেরিয়ে আসে। এর্মান করে করে বাঁগ্রিশটা ডিম পড়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাঁগ্রিশটি তরুণ।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বুড়ো তার কোমরের বাঁধুনিটা এঁটে দেওয়ায় তেগ্রিশ নম্বর ডিমটা আর পড়ল না। বুড়ো তারপর যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে, — একেবারে অবাক কাণ্ড, দেখে কি, বাঁগ্রিশটি সুকুমার তরুণ তার পিছন পিছন আসছে, চোখে মুখে গড়নে চলনে একেবারে হ্ৰবহ্ৰ এক। ছেলের দল সংস্থৱে বলে উঠল:

‘তুমি যখন আমাদের খুঁজে পেয়েছো, তখন তুমই আমাদের বাবা, আমরা তোমার ছেলে, বাড়ী নিয়ে চলো আমাদের।’

বুড়ো ভাবল, “বুড়োবুড়ী আমাদের একটি ছেলেও ছিল না, আর আজ একেবারে একসঙ্গে বাঁশিষ্টি!”

সবাইকে নিয়ে বাড়ী এসে বুড়ো ডাকল:

‘বুড়ী, ও বুড়ী! এতদিন তো খালি ছেলে ছেলে করে দুঃখ করতে। এই নাও বাঁশিষ্টি ফুটফুটে ছেলে। জায়গা করো, ছেলেদের খাওয়াও।’

বুড়ো বুড়ীকে সব ঘটনা খুলে বলল।

বুড়ী তো সেখানেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মৃত্যু দিয়ে রা বেরল না। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপর হঠাত ছুটল খাবার জায়গা করতে। বুড়ো ওদিকে কোমরের বাঁধানিটা খুলে ষেই পোষাকটা ছাড়তে গেছে, অমনি তৈরিশ নম্বর ডিমটা গেল পড়ে আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আর একটি তরুণ।

‘আরে, তুমি আবার কোথা থেকে এলে?’

‘আমিও তোমার ছেলে, ক্ষুদে ইভান।’

তখন বুড়োর মনে পড়ল সত্তাই তো সে পাখির বাসায় তৈরিষ্টা ডিউই পেয়েছিল।

‘ঠিক আছে, ক্ষুদে ইভান, তুমিও তবে খেতে বসে যাও।’

তৈরিষ্টা ছেলে কিন্তু খেতে বসামাত্রই বুড়ীর ভাঁড়ারে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেল, টেবল ছেড়ে উঠতে হল ভরপেটেও নয়, খালি পেটেও নয়।

রাত কাটাল ছেলেরা। পর্যাদন সকালে ক্ষুদে ইভান বুড়োকে বলল:

‘বাবা, আমাদের নিয়ে যখন এসেছো, কাজও দাও।’

‘কিন্তু কী কাজ দিই? বুড়োবুড়ী আমরা, জীবনে কখনও না দিয়েছি হাল, না বনেছি বীজ। আমাদের না আছে ধোঢ়া, না আছে লাঙল।’

ক্ষুদে ইভান বলল, ‘নেই, তো নেই! কী আর করা বাবে। লোকের কাছে গিয়ে কাজ করব। বাবা, তুমি কামারের কাছে গিয়ে আমাদের জন্যে তৈরিষ্টা কাস্টে গাড়িয়ে আনো।’

বুড়ো গেল কামারের কাছে কান্তে গড়াতে, আর এদিকে ক্ষুদ্রে ইভান আর তার ভাইয়েরা মিলে ততক্ষণে বানিয়ে ফেলল তেগিশটা কান্তের হাতল আর তেগিশটা আঁচড়া।

বুড়ো কামারঘর থেকে ফিরে এলে পর ক্ষুদ্রে ইভান সবাইকে ঘন্টপার্টি মেলে দিয়ে বললে:

‘চলো ধাই মজুর খাটব, রোজগার করব, নিজেদের পেট চালাতে হবে, বাবা-মাকেও দেখতে হবে।’

তারপর বুড়ো বাবা-মা’র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভাইয়েরা। গেল তারা একটুখানি নাকি অনেকখানি, অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, দেখল সামনে একটা মস্ত সহর। সেই সহর থেকে তখন রাজার গোমন্তা খোড়ায় চেপে যাচ্ছল। ওদের দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল:

‘ওহে জোয়ানেরা, কাজ করতে থাচ্ছো, নাকি কাজ থেকে ফিরছো? যদি খাটতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো, তাল কাজ আছে।’

ক্ষুদ্রে ইভান জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু কাজটা কী, বলবে?’

গোমন্তা বলল, ‘তেমন কঠিন কিছু নয়। রাজার খাস মাঠের ঘাস তোমাদের কেটে, শুরু করে, আঁটি বেঁধে, গাদা করে রাখতে হবে। তোমাদের সর্দা’র কে?’

কেউ উত্তর দিল না। ক্ষুদ্রে ইভান এগিয়ে এসে বলল:

‘চলো, কাজ বুঝিয়ে দাও।’

গোমন্তা তখন তাদের রাজার খাস মাঠে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল:

‘তিনি সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে তো?’

ইভান বলল:

‘যদি ঝড় জল না হয়, তবে তিনি দিনেই হয়ে যাবে।’

সে কথায় গোমন্তা ভারি খুশী হয়ে বলল:

‘তবে কাজে লেগে যাও, মজুরির ঠকাব না, খোরাক যা লাগবে সব পাবে।’

ক্ষুদ্রে ইভান বলল:

‘আধুনিক কিছুই চাই না, কেবল তৈরিশটা ষাঁড়ের রোস্ট, তৈরিশ বাল্টি মদ, প্রত্যেককে একটা করে কালাচ* দিও, তাতেই হবে।’

গোমন্তা টলে গেল। তৈরিশ ভাই কাস্তে শান দিয়ে এমন ফুর্তি সে টান লাগলে যে আওয়াজ উঠল শনশন। কাজ চলল থব জোর। সক্যার মধ্যেই সব ষাঁড় কাটা হয়ে গেল। এদিকে রাজার রস্তাইর থেকে এল তৈরিশটা ষাঁড়ের রোস্ট, তৈরিশ বাল্টি মদ আর প্রত্যেকের একটা করে কালাচ। তৈরিশ ভাই প্রত্যেকে আধখানা করে ষাঁড়, আধ বাল্টি করে মদ, আর আধখানা করে কালাচ খেয়ে ঘূর্মিয়ে পড়ল।

পরদিন চন্দনে রোদ উঠলে তৈরিশ ভাই ঘাসগুলো শুরু করে আঁটি বেঁধে সন্ধ্যার মধ্যেই গাদা দিয়ে ফেলল। তারপর আবার তারা প্রত্যেকে আধখানা করে কালাচ দিয়ে আধখানা করে ষাঁড় আর আধ বাল্টি মদ খেল। তারপর ক্ষুদ্র ইভান তার এক ভাইকে পাঠিয়ে দিল রাজদরবারে।

বললে, ‘বলো গিয়ে আমাদের কাজ দেখে যাক।’

গোমন্তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরল। পেছু পেছু রাজামশাইও তার মাঠে এসে হাজির। প্রত্যেকটি গাদা গুণে গুণে মাঠের সবটা ঘূরে ঘূরে দেখল রাজা — একটি ঘাসের শিষ্ঠি কোথাও নেই। বললে:

‘চট্টপাট আমার খাস জর্মির ঘাস কেটে বিচালি বানিয়ে গাদা দিয়েছো তোমরা ভালোই। এর জন্যে তোমাদের বাহবা দিচ্ছি, তাছাড়া দিচ্ছি একশ’টি রূবল আর চাঞ্চল-ভাঁড়ি মদের পিপে। কিন্তু আর একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। এই বিচালি পাহারা দাও। প্রত্যেক বছর কে এসে যেন এ সব বিচালি খেয়ে যায়, কিছুতেই চোরকে ধরতে পারছি না।’

ক্ষুদ্র ইভান বলল:

‘হৃজির মহারাজ, আমার ভাইয়েদের আপনি বাড়ী যেতে দিন আমি একাই পাহারা দেব।’

রাজার তাতে আপত্তি হল না। ভাইয়েরা সব রাজদরবারে গিয়ে তাদের পাওনা টাকা নিয়ে ভাল পানাহার করে বাড়ী ফিরল।

* কালাচ — শাদা রুটি।

କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ୍ ଫରେ ଗେଲ ରାଜାର ମେହି ଖାସ ମାଠେ । ରାତିରେ ସେ ନା ସ୍ଥୁରିଯେ ରାଜାର ବିଚାଳି ପାହାରା ଦେଇ । ଆର ଦିନେର ବେଳା ଖାଓସା ଦାଓସା କରେ ଜିରିଯେ ନେଇ ରାଜାର ରସୁଇଥରେ ।

ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ହେମନ୍ତକାଳ ଏସେ ଗେଲ । ରାତିରଗୁଲୋ ତଥନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର ଅନ୍ଧକାର । ଏକଦିନ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ ଏକଟା ବିଚାଳିର ଗାଦାଯ ଖଡ଼ ଜିଡ଼ିଯେ ଶୁଣେ ଆଛେ, ଚୋଥେ ସ୍ଥୁରି ନେଇ । ଠିକ ରାତ ଦୁଃଖରେ ଚାରିଦିକ ହଠାଏ ଯେନ ଦିନେର ଆଲୋଯ ଭରେ ଗେଲ । କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ ମାଥା ବେର କରେ ଦେଖେ କୀଂ ସ୍ଵର୍ଗକେଶରୀ ଏକଟା ମାଦୀ ଘୋଡ଼ା । ଘୋଡ଼ାଟା ସମ୍ବନ୍ଦ୍ରେ ବୁକ ଥେକେ ଲାଫିଯେ ଉଠେ ସୋଜା ଛୁଟେ ଏଲ ବିଚାଳିର ଗାଦାର ଦିକେ । ତାର ଖୁରେର ଦାପେ ମାଟି କାଂପେ, ସୋନାଲୀ କେଶର ହାଓସାଯ ଓଡ଼େ, ନାକ ଦିଯେ ଆଗନ ଛୋଟେ, କାନ ଦିଯେ ଧୈଁଯା ବେରଯ ।

ଘୋଡ଼ାଟା ଏସେଇ ବିଚାଳି ଥେତେ ଲେଗେ ଗେଲ । ପାହାରାଦାର କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ ସ୍ଥୁରୋଗ ବୁଝେଇ ଲାଫିଯେ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଟାର ପିଠେ । ବିଚାଳିର ଗାଦା ଛେଡ଼େ ରାଜାର ଖାସ ମାଠେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ତଥନ ସେ କୀଂ ଛୁଟ ଘୋଡ଼ାଟାର । କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ ବାଁ ହାତେ ଧରେଛେ ଘୋଡ଼ାର କେଶର, ଡାନ ହାତେ ଚାମଡ଼ାର ଚାବୁକ । ଚାବୁକ ମେରେ ମେରେ ଜଲାୟ ଶ୍ୟାଓଲାୟ ଘୋଡ଼ାକେ ଛୋଟାତେ ଲାଗଲ କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ ।

ଜଲାୟ ଶ୍ୟାଓଲାୟ ଛୁଟେ ଛୁଟେ ଶେଷେ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଁକେର ମଧ୍ୟେ ଡୁବେ ଗିଯେ ଥାମଲ ଘୋଡ଼ାଟା । ବଲଲ :

‘କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ, ଆମାଯ ତୁମି ଧରେଛୋ, ମୁଖ୍ୟାର ହୟେ ଥେକେଛୋ, ବଶେ ଆନତେଓ ପେରେଛୋ । ଆର ଆମାଯ ମେରୋ ନା, କଣ୍ଠ ଦିଯୋ ନା, ଆଜ ଥେକେ ଆମି ତୋମାର ସବ କଥା ଶୁଣବ ।’

କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ ତଥନ ଘୋଡ଼ାଟାକେ ନିଯେ ରାଜାର ଆନ୍ତାବଲେ ବେଁଧେ ରେଖେ ନିଜେ ଗିଯେ ରସୁଇଥରେ ସ୍ଥୁରିଯେ ରଇଲ । ପରଦିନ ଇଭାନ ରାଜାକେ ଗିଯେ ବଲଲ :

‘ହରଜୁର ମହାରାଜ, ଆପନାର ଖାସ ମାଠ ଥେକେ ବିଚାଳି ଚୁରି କ୍ରେକରତ ଆମି ବେର କରେଛି । ଚୋରଟାକେଓ ଧରେଛି । ଚଲନ ଦେଖବେନ ।’

ସ୍ଵର୍ଗକେଶରୀ ଘୋଡ଼ାକେ ଦେଖେ ରାଜା ତୋ ଭୀଷଣ ଖର୍ଷୀ

ବଲଲ, ‘ତା ଇଭାନ, ହଲେ କୀ ହୟ କୁନ୍ଦିଦେ ଇଭାନ, ଆସଲେ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ,

তোমার ভালো কর্জের জন্যে আজ থেকে তোমায় আমি আমার প্রধান সহিস
করে দিলুম।'

সেই থেকে ছেলের নাম হয়ে গেল ক্ষুদে ইভান বড় বৃদ্ধিমান।

ক্ষুদে ইভান রাজার আন্তরিকে কাজ করতে লাগল। সারারাত না ঘুমিয়ে সে
ব্রহ্মায়ের ঘোড়ার দেখাশোনা করে। তার ফলে রাজার ঘোড়াগুলোর দিনে দিনে
চকচকাই বাড়ল আর পূরুষ্ট হয়ে উঠল। গো তাদের রেশমের মতো চকচক করে,
লেজ ফুলিয়ে কেশের ফুলিয়ে দাঁড়ায়—সর্তাই দেখবার মতো।

রাজামশাই ভারি খুশী। প্রশংসা আর ধরে না।

‘বাহবা, ক্ষুদে ইভান বড় বৃদ্ধিমান! এমন সহিস আমি জীবনে দোখিনি।’
কিন্তু আন্তরিকের প্ররোচনা সহিসদের হিংসে হল।

‘কোথাকার একটা গেঁয়ো ভূত এসে বসেছে আমাদের উপর। রাজার
আন্তরিকের প্রধান সহিস হবে কিনা ওই লোকটা?’

সবাই মিলে ওরা বড়বন্দ পাকাতে লাগল। ক্ষুদে ইভান কিন্তু নিজের কাজ
করে চলে। কেনো কিছুই টের পেল না।

একদিন এক নেশাখোর চৌকিদার এল রাজার আন্তরিকে।

বলল, ‘এক ঢোক মদ দাও তো হে। কাল রাত থেকে মাথাটা বড় ধরে
আছে। যদি মদ খাওয়াও তবে তোমাদের এই প্রধান সহিসের হাত থেকে ছাড়া
পাবার ফর্জি বাংলে দেব।’

এই কথা শুনে সহিসরা সানল্দে ওকে মদ খাওয়াল। চৌকিদার তার ঘদের
পাত্র শেষ করে বলল:

‘আমাদের রাজামশাইয়ের ভারি ইচ্ছে, আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর
রগড়ে বেড়াল জোগাড় করেন। এই আজব জিনিসের খোঁজে কত ভাল ভাল
জোয়ান দেছে নিজে থেকে, আরো কত গোছে বাধ্য হয়ে, কিন্তু তাদের একজনও
আর ফিরে আসেনি। তোমরা এক কাজ করো, রাজামশাইকে শিক্ষা বলো যে
ক্ষুদে ইভান বড় বৃদ্ধিমান বড়ই করে বলেছে যে সে অনায়াসে এই সব জিনিস
এনে দিতে পারে। রাজা তখন ওকেই পাঠাবেন, তাহলে আর কোনদিনই সে
ফিরে আসবে না।’

পুরোনো সহস্রা চৌকিদারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আর এক পাত্র
মদ খাওয়াল। ভারপর ছলে গেল একেবারে সোজা রাজবাড়ীর সদর অলিন্দের
দিকে। সেখানে গিয়ে তারা রাজার ঘরের জানলার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে গুজগুজ
করতে লাগল। দেখতে পেয়ে রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:
'কী বলাবলি করছো হে? কী চাও, কী?'

'না মহারাজ, বিশেষ কিছুই না, তবে প্রধান সহিস ক্ষুদ্রে ইভান বড়
বৃক্ষিমান বড়ই করে বলছিল যে সে আপনি-বাজা বাদ্য, নাচয়ে হাঁস আর
রগড়ে বেড়াল এনে দিতে পারে। সেই নিয়েই আমাদের মধ্যে তক্ত হচ্ছিল,
কেউ বলছিল আনতে পারবে, কেউ বলছিল কেবল বরফটাই।'

এই কথা শুনে রাজামশাহীয়ের মুখের চেহারাই বদলে গেল, হাত পা কঁপতে
লাগল। ভাবল, "আঃ, যদি একবার এই দুর্ভিজিনিসগুলো পাই, তবে সব
রাজা আমায় হিংসে করবে। কত লোককে পাঠালাম কিস্তি একজনও ফিরে
এল না!"

ক্ষুণ্ণ রাজা প্রধান সহিসকে ডেকে পাঠাল।

প্রধান সহিস আসামাত্রই চেঁচিয়ে উঠল রাজা:

'দেরি করো না ইভান, বেরিয়ে পড়ো, আপনি-বাজা বাদ্য, নাচয়ে হাঁস আর
রগড়ে বেড়াল এনে দাও।'

ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃক্ষিমান বলল:

'কি বলছেন মহারাজ, আমি তো এসব জিনিসের নাম কোনদিন কানেও
শৰ্ণান্নি, যাব কোথায়?'

রাজামশাহী তা শুনে রেগে উঠে মাটিতে পা ঠুকে বলল:

'কী, রাজার কথার ওপর কথা! যদি আনতে পারো তবে উপযুক্ত প্রকার
পাবে, আর যদি না পারো তবে গদ্দান থাবে।'

মনের দৃঃখে উঁচু মাথা নিচু করে ফিরে এল ক্ষুদ্রে ইভান। এসে তার সেই
শ্বর্ণক্ষেপণী ঘোড়াকে লাগাম পরাতে লাগল। ঘোড়া জিজ্ঞেস করল:

'কী কর্তা, মন খারাপ কেন, বিপদ কিছু হয়নি তো?'

'মন খারাপ না করে কী করি বলো, রাজা বঙ্গেছেন আপনি-বাজা বাদ্য,

নাচিয়ে হাঁস আর রেগড়ে বেড়াল এনে দিতে হবে। আমি তো কোনদিন তাদের কথা কানেও শুনিনি।’

স্বর্ণকেশরী ঘোড়া বলল, ‘এ আর এমন কী ব্যাপার, আমার পিঠে চড়ে বসে ভাইনী বৃক্ষী বাবা-ইয়াগার কাছে গিয়ে জেনে নেব, এসব আজব জিনিস কেম্পায় পাওয়া যেতে পারে।’

ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃক্ষিগান তাই তখন দ্ব্র পাল্লায় পাঁড় দেবার জন্যে তৈরী হল। ঘোড়ায় উঠতে দেখা গেল, কিন্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া।

গেল সে অল্প পথ নার্ক অনেক পথ, অল্প দিন নার্ক অনেক দিন, এল এক গহন বনের মধ্যে, এমন আঁধার, দিনের আলো চুকতে পায় না। ঘূরতে ঘূরতে স্বর্ণকেশরী ঘোড়া তার রোগা হয়ে গেল, ক্ষুদ্রে ইভান নিজেও কাহিল। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় আসতেই দেখে এক মুরগীর পা, পায়ের গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘরটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাক থাচ্ছে। ক্ষুদ্রে ইভান কুঁড়েঘরটার কাছে গিয়ে বলল:

‘কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। থাকতে আসিন চিরকাল, রাত পোয়ালে যাব কাল।’

কুঁড়েঘর ইভানের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। ক্ষুদ্রে ইভান তার ঘোড়াটাকে একটা খণ্ডিতে বেঁধে রেখে, সির্পি বেয়ে উঠে এক ধাক্কায় দরজা খুলল। খণ্ডিলে দেখে কী, না বাবা-ইয়াগা খেঁরাকাঠি পা, খাঁড়ার মতো বেঁকে, নাকটা ছাতে ঠেকে, হামানদিন্তা পাশে, বৃক্ষী মিট্টিমিটি হাসে।

বাবা-ইয়াগা অতিরিক্তে দেখে খনখনিয়ে উঠল:

‘কত্তিদিন যে শুনিনি কানে, আজ দেখি রূপী মোর এখানে। বলো তো কিসের জন্যে এসেছো! ’

‘দিদিমা, এই কি তোমার অতিরিক্ত সংকারের ধারা? খিদেয় ঠাণ্ডায় যে মরছে আগেই তাকে জিঞ্জাসাবাদ? আমাদের রূপ দেশে অতিরিক্ত এসে আগে তাকে খাইয়ে দাইয়ে মান করতে দেয়, জিরতে বলে, তারপর অন্ধধাম, কেন, কী, সব ব্রহ্মান্ত জিজেস করে।’

‘বাবা রে বাবা, আমি বুড়ী মানুষ, রাগ করো না বাছা। এদেশটা তো আর
রাশিয়া নয়। দাঢ়াও বাবা, আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।’

বুড়ী তাড়াতাড়ি সব জোগাড় ঘন্ট করতে লাগল। চৰ্য-চোষা-লেহা-পেয়
খনের সাজাল টেবিলে, অতিথিকে ডেকে বসাল। তারপর দৌড়ে গেল চানের
খরে চুল্লী জবালাতে। ক্ষুদে ইভান বড় বৃক্ষিমান খুব আরাম করে গরম জলে
চান করে নিল। বাবা-ইয়াগা বিছানা পেতে দিলে, শোয়ালে ইভানকে, তখন
বিছানার পাশে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলে:

‘এবার বলো, তো সুজন? নিজের ইচ্ছে এসেছো, নাকি অনিচ্ছায় আসতে
হয়েছে? কোথায় যাবে?’

ইভান বলল, ‘রাজামশাই আমায় পাঠিয়েছেন আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে
হাঁস আর রগড়ে বেড়াল আনতে। এগুলো কোথায় পাওয়া যায় যদি বলে
দাও দিদিমা, তবে চিরকাল তোমার গুণ গাইব।’

‘ওগুলো কোথায় আছে, সে তো জানি বাছা, কিন্তু পাওয়া যে ভারি শক্ত।
কত কুমার আনতে গেল, কিন্তু তাদের কেউ ফেরেনি।’

‘কিন্তু দিদিমা, যা হবার তা হবেই! বরং আমায় সাহায্য করো, কোথায় যাব
বলে দাও।’

‘আহা বাছা রে, তোমার জন্মে দুঃখ হচ্ছে। দৰ্দি তোমায় একটু সাহায্য
করে। স্বর্ণকেশরীকে রেখে যাও, আগার কাছে সে ভালই থাকবে। আর এই
সুতোর গোলা নাও। কাল বেরবার সময় এই সুতোর গোলাটাকে মাটিতে
ফেলে দিও, তারপর সুতোর গোলা যে দিকে গড়িয়ে যাবে সেদিকে যেও। এই
ভাবে তুমি আগার মেজে বোনের কাছে গিয়ে পেঁচবে। সুতোর গোলাটাকে
দেখালেই সে যা সন্দান জানে বলে দিয়ে তোমায় সাহায্য করবে। তোমাকে
আমাদের বড়ো বেনের কাছে পাঠিয়ে দেবে।’

পরের দিন বুড়ী তার অতিথিকে ভোর হবার আগেই তুলে দিয়ে খাইয়ে
দাইয়ে এগিয়ে দিল। ক্ষুদে ইভান বড় বৃক্ষিমান বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায়
নিয়ে, ধন্যবাদ দিয়ে দূরের পথে পার্ডি দিল। বলতে সহজ কিন্তু করতে কঠিন।

যাই হোক সন্তোষ গোলাটা গাড়িয়েই চলে আর ক্ষুদ্রে ইভান চলে তার পিছন
পিছন।

একদিন যায়, দ্বিতীয় দিন যায়, তিনিদিন যায়, শেষকালে গোলাটা এসে থামল
এক উঠাইয়ের পায়ের কাছে। পায়ের গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই
পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর। ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃক্ষমান ডেকে বলল:

‘কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠি ফিরিয়ে আমার দিকে ঝুঁথ করে
দাঁড়াও।’

সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েঘর ঘূরে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই ইভান শূন্তে পেল
হেঁড়ে গলার আওয়াজ:

‘কর্তদিন যে শূন্যনি কানে, রূশীর গন্ধ পাইন, মানুষের মাংস খাইন।
মানুষ আজ যে নিজেই হাজির। কী চাই তোমার?’

ক্ষুদ্রে ইভান সন্তোষ গোলাটা দেখাতেই সে অবাক হয়ে বলে উঠল:

‘আরে আরে, তুমি তো দোখ আমার বোনের কাছ থেকে আসছো, তবে তো
তুমি পর নও, আদরের অর্তিথ। আগে বললেই পারতে।’

তারপর ব্যন্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি লাগল বৃক্ষী। আর যত রাজ্যের ভাল
ভাল ধৰার মদ এনে টেবিল সাজিয়ে অতিথিকে ডেকে বসাল।

বৃক্ষী বললে, ‘আগে খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে নাও, তারপর কাজের কথা হবে।’

ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃক্ষমান তো পেট পুরে খেয়ে দেয়ে বিছানায় শূন্যে
জিরোতে লাগল। আর বাবা-ইয়াগার মেজো বোন তার বিছানার পাশে বসে
জিঞ্জেস করতে লাগল সব ব্রতান্ত। কে সে, কোথা থেকে আসছে, কোথায়
যাবে; সব কথা তাকে বলল ক্ষুদ্রে ইভান। শূন্যে টুনে বাবা-ইয়াগা বলল:

‘পথ তো বেশী দ্বৰের নয়, তবে জানি না তুমি শেষ পর্যন্ত প্রাণে বৈচে
থাকবে কিনা। নাগ জ্মেই গরীণীচ হল আমাদের বোন-পো। অশ্রু-বাজা
বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগড়ে বেড়াল সব তারই সম্পর্ক। কৃত্তিরং কুমার
গেছে, কিন্তু কেউ ফিরে আসোন। সবাই নাগের হাতে মারা পড়েছে। এই নাগ
আমার দিদির ছেলে। এই কাজে এখন দীনদির সাহায্য চাই, কোন তো বাছা তুমিও
প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। আজ আমার মাদ্দা দাঁড়কাককে পাঠাব,

দিদিকে আপেক্ষি সাবধান করে দিতে হবে। যা হোক, এখন তুম্হি ঘুমোও, কাল খব ভোক্তা দেকে দেব।'

বাস্তুটা ঘুমাল ক্ষণে ইভান, ভোর বেলা উঠে হাতমুখ ধূল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাইয়ে দাইয়ে হাতে একটা লাল পশমের গোলা দিয়ে পথ দেখিয়ে বিদায় নিল। গোলা চলল গাড়িয়ে আর ইভান চলল তার পিছন পিছন।

সকাল থেকে সঙ্গে আর সঙ্গে থেকে সকাল—ইভান হেঁটেই চলেছে। ক্লাস্ট হয়ে ইভান পশমের গোলাটা হাতে তুলে নিয়ে একটুকরো ঝুঁটি আর এক ঢোক বরগার জল থেরে নেয়, তারপর আবার হাঁটে।

তিন দিন পৃথ্বী হলে গোলাটা একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে থামল। বারোটা পাথরের উপরে বাড়ী, বারোটা থামের উপর। চারিদিকে তার উচু বেঢ়া।

কুকুর ডেকে উঠেই বাবা-ইয়াগাদের বড়ো বোন অলিন্দে দৌড়ে এল। কুকুরটাকে শাস্ত করে সে বলল:

‘এসো এসো, বাছা, তোমার কথা আমি সবই জানি। আমার বৈনের দৃত, যাদু দাঁড়কাক, আমার কাছে এসেছিল। তোমার দায়-দুঃখে সাহায্য করার উপায় একটা করা যাবে। তার আগে বরং ঘরে ঢুকে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।’

খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর বললে:

‘তোমার এখন লুকিয়ে থাকতে হবে — আমার ছেলে জ্মেই গরীনীচ-এর আসার সময় হয়ে গেল। বাড়ী ফেরার সময় ক্ষিদে তেটায় ওর মেজাজ একেবারে তিরিক্ত হয়ে থাকে। তোমায় আবার গিলে না থায়।’

বড়ো বোন মাটির নিচের গুদামঘরের দরজা খুলে দিল। বলল:

‘নিচে গিয়ে বসে থাকো। না ডাকলে এসো না।’

তারপর দরজা বন্ধ করতে না করতেই সে কী হৃদমুড় দৃমদাম আওয়াজ। দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জ্মেই গরীনীচ। সারা ঘর কেপে উঠল।

‘রুশী মানুষের গন্ধ পাই যে?’

‘কী যে বালিস, বাবা, কতবছর হয়ে গেল একটা পাঁচটো নেকড়েও আসে না, একটা ঝলমলে বাজও ওড়ে না, রুশী মানুষের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? প্রথিবীময় দুঁড়ে বেড়াস, ও গন্ধ তুই-ই নিয়ে এসেছিস।’

একথা বলে ক্ষুদ্র টেবিল সাজাতে লেগে গেল। উন্নন থেকে বায় করল
একটা তিনবছর বয়সের ষাঁড়ের রোস্ট, টেবিলে বসালে বড় এক বাল্পতি মদ।
জ্মেই গরীবীচ এক ঢেকে সবটা মদ শেষ করে আন্ত ষাঁড়ের রোস্টটা ঘূর্খে
পুরে দিল। থেয়ে দেয়ে বড় ফুর্তি হল তার।

বললে, ‘মা, কার সঙ্গে একটু ফুর্তি করা যাব বলো তো, অন্তত গাধা
পিটোপিটি তাস খেলবার একটা সঙ্গী থাকলেও হত।’

‘গাধা পিটোপিটি তাস খেলে ফুর্তি করে সময় কাটিনোর মতো একজন
সঙ্গী আরু দিতে পারি, কিন্তু ওর কোনও অনিষ্ট করবি না তো?’

‘ভয় নেই মা, আরু তাকে কিছু করব না। কেবল ভয়ানক ইচ্ছে ইচ্ছে
একটু তাস খেলি, ফুর্তি করি।’

‘কিন্তু বাবা, যা বললি মনে রাখিস, এই বলে বাবা-ইয়াগা গুদামঘরের ডালা
খুলে বলল:

‘ক্ষুদে ইভান বড় বৰ্দ্ধিমান, উঠে এসো। বাড়ীর কর্তাকে মান্য করে একটু
তাস খেলো।’

তাই সুরু হল তাস খেলা। জ্মেই গরীবীচ বলল:

‘বাজি রইল যে জিতবে সে যে হারবে তাকে থেয়ে ফেলবে।’

সারারাত খেলা চলল। বাবা-ইয়াগার সাহায্য নিয়ে ভোর নাগাদ ক্ষুদে ইভান
হারিয়ে দিল জ্মেই গরীবীচকে।

তখন জ্মেই গরীবীচ মিনতি করে বলল:

‘এ বাড়ীতেই থেকে যাও সুজন। কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর আবার
খেলব, দেখি জিতি কিনা।’

এই বলে সে উড়ে চলে গেল। ক্ষুদে ইভান বড় বৰ্দ্ধিমান সেই ফাঁকে পেট
ভরে থেয়ে দিবিয় একটা ঘূর্ম দিয়ে নিল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাওয়াল দাওয়াল।

সূর্য ডোবার পর ফিরে এল জ্মেই গরীবীচ। একটা আন্ত ষাঁড়ের রোস্ট
আর বড় বাল্পতির দেড় বাল্পতি মদ থেয়ে বলল:

‘এসো, এবার থেলা শুরু করা যাক। দেখো এবার আঁশু ঠিক জিতব।’

আবার সুরু হল তাস খেলা। কিন্তু কিছু কিছু পরেই জ্মেই গরীবীচ ঘূর্মে

ତୁଲେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗୁଳି । ଆଗେର ରାତଟା ମୋଟେ ସ୍କ୍ରମୋର୍ଯ୍ୟନି, ସାରା ଦିନମାନ କେବଳ ପ୍ରଥିବୀମୟ ଚାହୁଡ଼େ ବୈଡିଯେଛେ । କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଇଭାନ ମେହି ଫାଁକେ ବାବା-ଇଯାଗାର ଦୌଲତେ ଖେଳଟା ତିନିବାର ଜିତେ ନିଲ । ଜ୍ମେଇ ଗରୀନୀଚ ବଲଲ :

‘ତିନିବାର ଆମାୟ କାଜେ ବେରତେ ହବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଲା ଖେଳା ହବେ ବାଜିର ଅତୀଯ ଦଫା ।’

କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଇଭାନ ବଡ଼ ବ୍ରାନ୍ଦିମାନ ବେଶ ଭାଲ କରେ ସ୍କ୍ରମିଯେ ଟୁମିଯେ ଜିରିଯେ ନିଲ । ଆର ଓଦିକେ ଜ୍ମେଇ ଗରୀନୀଚ ଫିରିଲ ଏକେବାରେ ହୃଦାରାନ ହୟେ, ଦ୍ଵା'ରାତିର ସ୍କ୍ରମୋର୍ଯ୍ୟନି, ତାର ଓପର ସାରାଦିନ ପ୍ରଥିବୀମୟ ଚାହୁଡ଼େ ବୈଡିଯେଛେ । ଏକଟା ଆନ୍ତ ଫାଁଦେର ରୋଷଟ ଆର ବଡ଼ ବାଲାତିର ଦ୍ଵା'ବାଲାତି ମଦ ଥେଯେ ସେ ତାର ଅର୍ତ୍ତିଥିକେ ଡେକେ ବଲଲ :

‘ଏସୋ କୁମାର, ବସେ ଯାଓ, ଏବାର ଠିକ ଜିତବ ।’

ମେ କିନ୍ତୁ ତଥନ ଭାରି କ୍ଲାନ୍ଟ । ଥେକେ ଥେକେଇ ସ୍କ୍ରମେ ତୁଲେ ପଡ଼ିଛେ । କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଇଭାନ ଏବାରେଓ ଜିତେ ଗେଲ ।

ଜ୍ମେଇ ଗରୀନୀଚ ତଥନ ଭୀଷଣ ଭୟ ପେରେ, ହାଁଟୁଗେଡ଼େ ବସେ ଘିନାତି କରତେ ଥାକେ :

‘ଆମାୟ ଥେଯେ ଫେଲୋ ନା ସ୍କ୍ରଜନ, ମେରେ ଫେଲୋ ନା ! ତୁମ୍ଭ ଯା ବଲବେ, ତାଇ କରବ ।’

ମାଯେର ପାଓ ଜାଗିଯେ ଧରେ, ‘ଓକେ ବଲୋ ମା, ଆମାୟ ଯେନ ଛେଡେ ଦେଯ ।’

କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଇଭାନ ବଡ଼ ବ୍ରାନ୍ଦିମାନେର ଠିକ ଏଇଟେଇ ଚାଇ ।

‘ବେଶ, ଆମି ତିନିବାର ଜିତେଛ ଜ୍ମେଇ ଗରୀନୀଚ । ତାର ବଦଳେ ତୁମ୍ଭ ସିଦ୍ଧ ଆମାୟ ଆପନି-ବାଜା ବାଦ୍ୟ, ନାଚିଯେ ହାଁସ ଆର ରଗଦୁଡ଼େ ବେଡ଼ାଳ ଏହି ତିନଟେ ଜିନିସ ଦାଓ ତବେ ମିଟେ ଯାଯ ।’

ଜ୍ମେଇ ଗରୀନୀଚ ତୋ ଆହ୍ୟାଦେ ଏକେବାରେ ଆଟଖାନା । ତାର ଅର୍ତ୍ତିଥ ଆର ବ୍ରାନ୍ଦୀ ମାକେ ଜାଗିଯେ ଧରେ କୀ ତାର ଆଦର ।

‘ଏ ତୋ ଆନନ୍ଦ କରେ ଦେବ, ଭବିଷ୍ୟତେ ଆରଓ କତ ଭାଲ ଜିନିସ ଜୋଗାଇ କରା ଯାବେ ।’

ତାରପର, କୀ ଆଯୋଜନ, ମହା ଭୋଜନ, କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଇଭାନକେ ଆମର ସତ୍ତା କରଲ ଜ୍ମେଇ ଗରୀନୀଚ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭାଇ ପାତାଲେ । ନିଜେ ଥେକେଇ ବଲଲେ :

‘କେନ ମିଛିମିଛି ଆପନି-ବାଜା ବାଦ୍ୟ, ନାଚିଯେ ହାଁସ ଆର ରଗଦୁଡ଼େ ବେଡ଼ାଳ ବୟେ ବୟେ ତୁମ୍ଭ ହାଁଟିବେ । କୋଥାଯ ଯାବେ ବଲୋ, ଆମି ଏକ ଦୈତ୍ୟେ ପେଂଛେ ଦିଚ୍ଛ ।’

বাবা-ইয়াগা চলল, ‘এই তো কথার মতো কথা, বাছা! অর্তিথকে নিয়ে তুই
সোজা চলে পাই আমার ছোট বোন, তোর মাসীর কাছে। আর সেখান থেকে
ফিরবার যদি তোর মেজে মাসীর সঙ্গেও দেখা করে আসতে ভুলিস না যেন।
কর্তব্যের তারা তোকে দেখৈন!’

সাঙ্গ হল ভোজ, ক্ষুদে ইভান বড় বৃদ্ধিমান তার ওই আজব জিনিসগুলো
নিয়ে বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিল। জ্মেই গরীনীচ তাকে তুলে নিয়ে
উড়ে চলল আকাশে। একষটার মধ্যেই বাবা-ইয়াগাদের সবচেয়ে ছোট বোনের
বাড়ীতে এসে পৌছল তারা। গহকর্ণ অলিল্দে ছুটে এল, আনন্দ করে বরণ
করলে অর্তিথদের।

ক্ষুদে ইভান বড় বৃদ্ধিমান সময় নষ্ট না করে স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় লাগাম
পরিয়ে পিঠে চড়ে বসল। তারপর ছোটো বোন বাবা-ইয়াগা আর জ্মেই
গরীনীচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল নিজের দেশে।

ক্ষুদে ইভান যখন তার আজব জিনিসগুলোকে নিয়ে বহাল-ত্বিয়তে বাড়ী
ফিরল, রাজার কাছে তখন অর্তিথ এসেছে: তিন জার আর তাদের তিন
জারপুত্র, তিন বিদেশী রাজা আর রাজপুত্র, মন্ত্রীসামন্ত পাত্রিমন্ত্র।

ক্ষুদে ইভান ঘরে ঢুকে রাজার হাতে দিল আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস
আর রংগড়ে বেড়াল। রাজা তো ভারি খুশী। বললে:

‘ক্ষুদে ইভান বড় বৃদ্ধিমান, কাজ করে দিয়েছো তুমি। এর জন্যে অনেক
বাহবা তোমায়। পুরস্কারও দেব। এতদিন তুমি ছিলে প্রধান সহিস। আজ
থেকে তুমি হলে আমার অম্বত্য।’

কিন্তু মন্ত্রী আর সামন্তেরা নাক সিটকে নিজেদের মধ্যে বলাবালি করতে
লাগল:

‘একটা সহিস এসে কিনা আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবে। ছিছ-ছি, কী
লজ্জার কথা! রাজামশাই কী পেয়েছেন?’

ওদিকে কিন্তু আপনি-বাজা বাদ্য থেকে বাজনা স্থান হয়ে গেল, রংগড়ে
বেড়াল তার সঙ্গে গান জুড়ল আর সেই তালে পা মেঝেল নাচিয়ে হাঁস। এগন

ফুর্তি লেগে গেল যে বসে থাকা যায় না। মান্যগণ্য অর্তিথরা লেগে গেল নাচতে।

সময় চলে যায় কিন্তু নাচ আর থামে না। রাজদের রাজদের ঘুর্কুট চলে পড়ে। জারপৃষ্ঠ, রাজপৃষ্ঠের ঘূরে ঘূরে নাচে। মন্ত্রীসামন্তেরা ধামে আর হাঁপায়, কিন্তু থামতে কেউ পারে না। তখন রাজা হাত নেড়ে বললে:

‘হয়েছে ইভান, রংগড় থামাও। আমরা সব জেরবার হয়ে পড়েছি।’

ক্ষুদে ইভান তখন তিনটে আজব জিনিস থালতে ভরে ফেলল, শাস্তি হল সকলের।

অর্তিথরা যে যেখানে ছিল সেখানেই সবাই ধূপধাপ বসে পড়ে খাব খেতে লাগল।

‘সত্তাই রাজা বটে, রংগড় বটে, এছন্টি আর কখনো দেখিনি।’

বিদেশী অর্তিথরা সবাই হিংসে করতে লাগল। রাজার আর আনন্দ ধরে না।

‘রাজামহারাজারা সব এবার আমায় দেখে হিংসের জরুলে পুড়ে মরবে। এমন জিনিস আর কারও নেই।’

মন্ত্রীসামন্তের দল কিন্তু বসে বসে ফুস্ফুস্ গুজগুজ করতে লাগল:

‘এই যদি চলতে থাকে, তবে তো শীগ্রগিরাই এই গেঁয়ো ভূতটাই হয়ে উঠবে রাজ্যের সেরা মানুষ। রাজার চার্কারাকরগুলোও পাবে ওর গেঁয়ো জাতভাইগুলো। এখনি যদি ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা না করা যায় তবে আমাদের ভুইয়া-সামন্তদের কপালে মরণ আছে।’

তাই পরের দিন মন্ত্রীসামন্তেরা সব কী করে রাজার এই নতুন অমাত্যকে তাড়ান যায় তাই ভাবতে লাগল। বুড়ো একজন রায়বাহাদুর বলল:

‘নেশাখোর চৌকিদারটাকে ডেকে আনা যাক, সে এ সব ব্যাপারে উদ্বাদ।’

নেশাখোর চৌকিদার এসে কুর্নিশ করে বলল:

‘জানি হুজুর, কেন আমায় ডেকেছেন। আমায় যদি আধবালতি মদ খাওয়ান, তবে রাজার নতুন অমাত্যকে কী করে তাড়ান যাব বাতলে দিতে পারি।’

সবাই বলে উঠল, ‘বলো, বলো, আধবাল্পিত মদ তৃষ্ণি নিশ্চয়ই পাবে।’

গলা ডেঙ্গুবার জন্যে চৌকিদারকে এক পেয়ালা মদ দেওয়া হল। চৌকিদার তা খেয়ে বলল:

‘আমাদের রাজাৰ চালিশ বছৰ হল বৌ মৰে গেছে। তাৰপৰ থেকে তিনি সুন্দৱী রাজকন্যা আলিওনাকে বিয়ে কৰিবাৰ জন্যে নানা চেষ্টা কৰে আসছেন, পারেননি। তিন তিন বার তিনি রাজকন্যা আলিওনার রাজ্য আক্ৰমণ কৰেছেন। কত সৈন্য ঘাৱা গেছে। কিন্তু জয় কৰতে পারেননি। সুন্দৱী রাজকন্যাকে আনাৰ জন্যে এই বার রাজা ক্ষুদ্রে ইভানকে পাঠান। একবাৰ গেলে আৱ ফিরতে হবে না।’

একথা শুনে মন্ত্রীসামন্তেৱা ভাৱি খুশী। সকাল হতোই তাৱা রাজাৰ কাছে গেল।

‘মহারাজ, খুব বুদ্ধি কৰে আপনি এই নতুন অমাত্যটিকে খুঁজে বেৱ কৰেছেন। ঐ আজৰ জিনিসগুলো আনা কিছু সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখন সে বড়াই কৰে বলছে সে নাকি সুন্দৱী রাজকন্যা আলিওনাকেও হৱণ কৰে আপনাৰ কাছে এনে দিতে পাৱে।’

সুন্দৱী রাজকন্যা আলিওনার নাম শুনেই আৱ রাজা স্থিৱ থাকতে পাৱল না। সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে চৰ্চায়ে উঠল:

‘ঠিক বলেছো, এতক্ষণ তো আমাৰ খেয়াল হৱানি! সুন্দৱী রাজকন্যা আলিওনাকে হৱণ কৰতে হলে ওই আসল লোক।’

নতুন অমাত্যকে ডেকে বলল:

‘তিন নয়েৱ দেশ পেৰিয়ে তিন দশেৱ রাজ্য গিয়ে সুন্দৱী রাজকন্যা আলিওনাকে নিয়ে এসো।’

তা শুনে ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৰ্দ্ধিমান বলল:

‘হুজুৱ মহারাজ, রাজকন্যা তো আৱ আপনি-বাজা বাদ্য নয়। কৰিয়ে হাঁসও নয়, বগুড়ে বেড়ালও নয়, থঙ্গেতেও তো পোৱা যায় না। নিজেই হয়ত আসতেও চাইবে না।’

রাজা কিন্তু রাগে পা ঠুকল, হাত নাড়ল, দাঁড়ি ঝাঙ্গা দিল। বলল:

‘তক’ করে না! কোনও কথা শুনতে চাই না। যে করে পারো তাকে নিয়ে
এসো। যদি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে আনতে পারো, তবে তোমায় নগর
উপনগর দান করব, তোমায় করে দেব আমার রাজ্যের মন্ত্রী। আর যদি না
পারো, তবে তোমার গর্দান যাবে!’

রাজার কাছ থেকে ক্ষুদ্রে ইভান ফিরে এল গভীর দৃঃখ্য, মাথায় একরাশ
ভাবনা। স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে জিন পরাচ্ছে, ঘোড়া জিজ্ঞেস করল:

‘কী ভাবছো, এত মনমরা কেন কর্তা? কোনও বিপদাপদ্ধ হয়নি তো?’

‘বিপদ বড় নয়, তবে খৃষ্ণরও কারণ নেই। সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে
নিয়ে আসার জন্যে রাজা আমায় পাঠাচ্ছেন। নিজে তিনি তিন বছর ধরে
রাজকন্যার জন্যে সম্বন্ধ করেছেন, সম্বন্ধ আর হয়নি, তিনি বার ঘূর্ণে
জয় করতে পারেননি, আর এখন কিনা একলা আমায় পাঠাচ্ছেন নিয়ে আসতে।’

স্বর্ণকেশরী বলল, ‘এ আর এমন কী বিপদ, আমি তোমার সঙ্গে আছি,
দুজনে মিলে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।’

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্ষুদ্রে ইভান। ঘোড়ায় উঠতে দেখা
গেল, কিন্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া।

অনেকদিন নাকি অল্পদিন, অনেক দূর নাকি অল্প দূর — ঘোড়া ছুটিয়ে
চলল, ইভান এসে পেঁচল তিন নয়ের রাজ্য। দেখে — এক মন্ত্র বেড়া পথ জুড়ে
দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বর্ণকেশরী এক লাফে বেড়া পার হয়ে রাজার খাস বাগিচায়
গিয়ে পড়ল। বলল:

‘আমি এবার একটা আপেল গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তাতে সোনার আপেল
ধরবে। তুমি আমার পিছনে লুকিয়ে থাকো। সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা বধা
বেড়াতে এসে সোনার আপেল তুলতে আসবে, তখন তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে
থেকো না কিন্তু, খপ করে ধরে ফেলো, আমিও তৈরী থাকব। তাম্পর আর
এক মহুর্তেও নষ্ট করো না — সোজা আমার পিঠে উঠে ষেও, আমি পালাব।
কিন্তু মনে রেখো, ভুল করলে তুমি আমি কেউ বাঁচব না।’

পরের দিন সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা খাস বাগিচায় বেড়াতে এল।
আপেল গাছটা দেখেই সে তার দাসীবাঁদী সখীসহচৰীদের ডেকে বলল:

‘কী সুন্দর আপেল গাছ ! আপেলও আবার সোনার ! তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি একটা আপেল পেড়ে নিয়ে আসি ।’

রাজকন্যা দৌড়ে যেতেই ক্ষুদ্রে ইভান হঠাতে কোথা থেকে লাফিয়ে এসে সুন্দর রাজকন্যার হাত চেপে ধরল। আপেল গাছটিও অমনি স্বর্ণকেশরী মৃত্যু হয়ে গিয়ে মাটিতে পা টুকে তাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রে ইভান আলিওনাকে নিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। রাজকন্যার দাসীবাঁদী স্বর্ণসহচরীরা কিন্তু দেখতে পেল।

চীৎকার করে উঠল তারা, প্রহরীরা সব ছুটে এল, কিন্তু রাজকন্যার চিহ্নেই। রাজা সব শুনে প্রত্যেকটি পথে ঘোড়সওয়ারদের পাঁঠিয়ে দিল খোঁজ করতে। পরের দিন কিন্তু তারা সবাই খালি হাতে ফিরে এল। ঘোড়া ছোটনোই সার হল, চোরকে কেউ চোখেও দেখতে পেল না।

ক্ষুদ্রে ইভান বড় বুদ্ধিমান ততক্ষণে বহু দেশ পৈরিয়ে গেছে, নদী হৃদ উর্জিয়ে গেছে।

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা প্রথমটা নিজেকে ছাড়তে চেষ্টা করেছিল, শেষকালে শাস্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। একটু করে কাঁদে আর তরুণ কুমারকে চেয়ে দেখে, কাঁদে আর তাকায়। দ্বিতীয় দিন রাজকন্যা ক্ষুদ্রে ইভানের সঙ্গে প্রথম কথা কইলে:

‘বলো, কে তুমি, কোন দেশে বাড়ী, কোন বাহিনীর লোক ? কোন কুলের ছেলে ? কী বলে ডাকব, মান্য করব ?’

‘আমার নাম ইভান, সবাই আমায় ক্ষুদ্রে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলে ডাকে। আমি অমূর্ক রাজার অমূর্ক রাজ্য থেকে আসছি, বাবা মা আমার চার্ষী !’

‘ক্ষুদ্রে ইভান বড় বুদ্ধিমান, তুমি কি নিজের জন্যেই আমায় হরণ করেছো, নাকি কারো হস্তুমে ?’

‘আমাদের রাজার আদেশে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।’

তা শুনে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদতে স্বরূপ করল :

‘ঐ হাঁদা বুড়োটাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। তিন বছর ধরে সম্বন্ধ

করেছে, সম্বন্ধ হয়নি, তিনবার রাজ্য আন্তর্মগ করেছে, কত সৈন্য মারা পড়েছে, জয় করে তিতে পারেনি, এবারও আমায় ও কিছুতেই পাবে না।'

বুদ্ধ কুমারের মনে লাগল কথাগুলো, কিন্তু কিছু বললে না। ভাবল:

“আমার ধর্দি এরকম একটি বৌ হত!”

কিছু কাল পরেই ইভান তার নিজের দেশে এসে পড়ল। বৃক্ষে রাজা এই কয়দিন জানলা ছেড়ে নড়েন, কেবল পথ চেয়ে দেখেছে কখন আসে ক্ষুদ্রে ইভান বড় বুদ্ধিমান।

ইভান সহরে এসে পৰ্ণচতেই রাজা একেবারে তার প্রাসাদের সিংহদ্বারে। ইভান রাজপ্রাঙ্গণে চুক্তে না চুক্তেই রাজা দৌড়ে এসে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নামাল তার ধৰধৰে হাতদৃঢ়ি ধরে।

বললে, ‘কত বছর ধরে ঘটক পাঠিয়েছি, নিজে গিয়ে সম্বন্ধ করেছি, কিন্তু তুম কেবলি ফিরিয়ে দিয়েছো, কিন্তু এবার তো আমায় বিয়ে করতেই হবে।’

আলিওনা একটু হেসে বলল:

‘এতটা পথ এসে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি, মহারাজ, একটু জিরিয়ে নিতে দিন, তারপর বিয়ের কথা বলবেন।’

রাজা হস্তদন্ত ব্যন্তসমন্ত হয়ে দাসীবাঁদী সখীসহচরীদের ডেকে পাঠাল:

‘এই আমার আদরের অতিথির জন্যে ঘর সাজিয়েছো তো?’

‘অনেকক্ষণ, মহারাজ।’

‘নাও, বরণ করো তোমাদের ভাবী মহারাণীকে, যা বলবে সব শুনবে, কিছুর ধেন অভাব না হয়।’

দাসীবাঁদী সখী সহচরীর দল তখন রাজকন্যাকে ঘরে নিয়ে গেল। ইভানকে রাজা বললে:

‘সাবাস, ইভান! এই কাজের জন্যে তুমি আমার প্রধান মন্ত্রী হবে প্রশংসকার পাবে তিনটি নগর তিন উপনগর।’

একদিন যায়, দ্বিতীয় যায়, রাজার আর ধৈর্য ধরে না। যেরেটা না চুকিয়ে তার শাস্তি নেই। তাই সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে গিয়ে বলে:

‘কবে সবাইকে নিঘন্তু করিব, কবে হবে বিয়ে?’

ରାଜକନ୍ୟା ବଲିଲେ:

‘କିନ୍ତୁ କହି କରେ ବିଯେ ହବେ, ଆମାର ନା ଆଛେ ବିଯେର ଆଂଟି, ନା ଆଛେ ରଥ?’

ରାଜା ବଲିଲେ, ‘ଓଃ, ଏ ତୋ କୋନୋ କଥାଇ ନଯ, ଆମାର ରାଜ୍ୟ କତ ରଥ, କତ ଆଂଟି ତାର ଏକଟା ସଦି ତୋମାର ପଛଳ ନା ହୟ, ତବେ ଆମି ସାଗର ପାରେ ଲୋକ ପାଠୀବ, ମେଥାନ ଥେକେ ଆନିଯେ ଦେବ ।’

‘ନା, ମହାରାଜ, ଆମାର ନିଜେର ରଥ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରଥେ ଆମି ବିଯେ ଥାବ ନା, ଆମାର ନିଜେର ଆଂଟି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆଂଟି ବଦଳ କରବ ନା ।’

ରାଜା ତଥନ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେ:

‘କିନ୍ତୁ କୋଥାଯ ତୋମାର ଆଂଟି, କୋଥାଯ ବିଯେର ରଥ?’

‘ଆମାର ଆଂଟି ଆଛେ ଝାଁପତେ, ଝାଁପ ଆଛେ ଆମାର ରଥେ, ଆର ଆମାର ରଥ ଆଛେ ବୁଝାନ ଦ୍ଵୀପେର କାହେ ସମ୍ବନ୍ଧେର ତଳେ । ସତକ୍ଷଣ ନା ତାଦେର ଆନିତେ ପାରଛେନ, ତତକ୍ଷଣ ବିଯେର କଥା ବଲିବେନ ନା ।’

ରାଜାମଶାଇ ଘୁରୁଟ ଖଲେ ମାଥା ଚାଲିକାତେ ଲାଗଲ ।

‘ସମ୍ବନ୍ଧେର ତଳ ଥେକେ ରଥ ? ସେ ଆନା ଥାଯ କହି କରେ ?’

‘ସେ ଭାବନା ଆମାର ନଯ । ଯେ ଭାବେ ପାରେନ ଆନ୍ତନ,’ ଏହି ବଲେ ରାଜକନ୍ୟା ଆଲିଓନା ତାର ଘରେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ରାଜା ଏକା ବସେ ରଇଲ ।

ବସେ ବସେ ଭାବେ ଆର ଭାବେ, ହଠାତ ଘନେ ପଡ଼େ ଗେଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଭାନେର କଥା ।

“ଓ ଠିକ ଏନେ ଦିତେ ପାରବେ !”

ତକ୍ଷଣ ରାଜା ତାକେ ଡେକେ ପାଠିଯେ ବଲିଲ:

‘କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଭାନ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକ ଆମାର । ତୁମି ଛାଡ଼ା ଆର ଫେରି ଆମାର ଆପନି-ବାଜା ବାଦ୍ୟ, ନାଚିଯେ ହାଁସ ଆର ରଗ୍ଭାତେ ବେଡ଼ାଳ ଏନେ ଦିତେ ପାରିବାନ । ତୁମିଇ ଆମାଯ ସ୍ଵନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଆଲିଓନାକେ ଏନେ ଦିଯ଼େଛୋ । ଏଥିର ଆମାର ଆରେକଟା କାଜ କରେ ଦିତେ ହବେ — ଆଲିଓନାର ବିଯେର ଆଂଟି ଆର ରଥ ଏନେ ଦାଓ । ଆଂଟି ଆଛେ ଝାଁପତେ, ଝାଁପ ଆଛେ ରଥେ, ରଥ ଆଛେ ବୁଝାନ ଦ୍ଵୀପେର କାହେ ସମ୍ବନ୍ଧେର ତଳେ । ଆଂଟି ରଥ ସଦି ଏନେ ଦିତେ ପାରୋ, ତବେ ତେଜୋକେ ଆମାର ରାଜ୍ୟେର ତିନଭାଗେର ଏକଭାଗ ଦିଯେ ଦେବ ।’

তা শুনে ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৰ্দ্ধিমান বলল:

‘কিন্তু মহারাজ, আমি তো আর তিমিমাছ নই, সমুদ্রের তল থেকে কী করে আংটি রথ নিয়ে আসব?’

রাজা রেগে উঠে পা ঠুকে চেঁচাল:

‘জানতে চাই না, শুনতে চাই না। রাজার কাজ হৃকুম করা, তোমার কাজ তা পালন করা। জিনিসগুলো এনে দাও — পুরস্কার পাবে, না আনলে — গর্দান যাবে!’

ইভান তাই আস্তাবলে ফিরে গিয়ে স্বর্ণকেশরীর পিঠে জিন চড়াতে লাগল।
স্বর্ণকেশরী জিজ্ঞেস করল:

‘কোথায় যাবে কর্তা?’

‘আমি নিজেই তা এখনও জানি না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই। রাজা হৃকুম করেছেন, রাজকন্যার আংটি আর রথ নিয়ে আসতে হবে। আংটি আছে ঝাঁপতে, ঝাঁপ আছে রথে, আর রথ আছে ব্যান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। তার খোঁজেই চলেছি।’

স্বর্ণকেশরী বলল:

‘একাজটাই হবে সবার কঠিন। পথ দ্রোর নয়, তবে, কী জানি কী হয়।
রথটা কোথায় আছে তা জানি, কিন্তু পাওয়া সহজ নয়। আমি সমুদ্রের তলে
গিয়ে রথ টেনে এনে তুলব। কিন্তু সাগরের ঘোড়াগুলো যদি আমায় দেখতে
পায় তবে কামড়ে মেরে ফেলবে। সারা জীবনেও আমাকে দেখতে পাবে না,
রথও না।’

ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৰ্দ্ধিমান ভাবনায় পড়ে গেল। অনেক ভেবেচিস্তে শেষকূলে
বেয় করলে একটা উপায়। রাজাকে গিয়ে বলল:

‘মহারাজ, বারোটা ঘাঁড়ের ছাল, বারো পুদ্র আলকাতরামাখাটাড়ি, বারো
পুদ্র আলকাতরা আর একটা বড় কড়াই চাই আমার।’

রাজা বলল, ‘তোমার যা খুশী, যতটা ইচ্ছে নাও। কেবল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে
পড়ো কাজে।’

তরুণ বীর ইভান তখন গাঢ়ীতে ষাঁড়ের ছাল, দাঢ়ি আর আলকাতরাভরা বিরাট কড়াটুঁপয়ে তার সঙ্গে স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে ঘুতে বেরিয়ে পড়ল।

এসে সেইছুল সমন্বয়ের তীরে, রাজার খাস মাঠে। সেখানে নেমে স্বর্ণকেশরী ঘোড়কে ষাঁড়ের ছালগুলো দিয়ে ঢেকে, ছালগুলো দৃঢ়ি দিয়ে বেঁধে দিল।

‘সাগরের ঘোড়া তোমায় দেখতে পেলেও সহজে দাঁত বসাতে পারবে না।’

বারেটা ছালই মে জড়য়ে দিল, বাবো পৃদ্র দৃঢ়ি দিয়ে তাদের বাঁধল। তারপর আলকাতরা গরম করে ঢেলে দিল — পুরো বারেটি পৃদ্র আলকাতরা মাথালে ছালে দাঁড়িতে।

স্বর্ণকেশরী বলল:

‘এখন আর আমার সাগরের ঘোড়াগুলোকে ভয় নেই, তুমি এই মাঠে আমার জন্যে তিনিদিন অপেক্ষা করে থাকো। বসে বসে তোমার তারের বাজনাটা বাজাও, কখনও চোখ বুজো না কিন্তু।’

এই বলে স্বর্ণকেশরী সমন্বয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ক্ষুদ্র ইভান বড় বৃদ্ধিমান একা একা বসে রইল সমন্বয়ের তীরে। একদিন গেল, দুদিন গেল, ইভানের চোখে ঘূম নেই, সে তার বাজনা বাজায় আর সমন্বয়ের দিকে চেয়ে থাকে। তিনিদিনের দিন কিন্তু চুল্লিন এল ইভানের। ঘূমে সে ঢলে ঢলে পড়ে, বাজনাও আর তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না। যতক্ষণ পারল ঘূমের সঙ্গে প্রাপ্তব্যে ঘুঁঘুল, কিন্তু শেষকালে আর না পেরে ঘুমিয়েই পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, ঘূমের মধ্যে শোনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ইভান চোখ মেলে দেখে কী, তারই স্বর্ণকেশরী ঘোড়া রথ টেনে আনছে তীরে। তার ছ'টা স্বর্ণকেশরী সাগরের ঘোড়া ঝুলছে তার দৃশ্যাশে।

ক্ষুদ্র ইভান বড় বৃদ্ধিমান তার ঘোড়ার কাছে দৌড়ে যেতেই ঘোড়া বলল:

‘তুমি যদি আমায় ষাঁড়ের ছাল আর দাঢ়ি বেঁধে আলকাতরা ঢেলে না দিতে, তবে আর আমায় দেখতে পেতে না, সাগরের ঘোড়ারা দল বেঁধে আমায় তেড়ে এসেছিল। ন'টা ছাল একেবারে কুটি কুটি করে ফেলেছে, আরো দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে। এই ছ'টা ঘোড়া দাঢ়ি আর আলকাতরায় এমন জোর দাঁত আটকে গেছে যে ছাড়াতে পারেনি। ভালই হয়েছে, এরা তোমার কাজে লাগবে।’

তরুণ বীর ইভান তখন সাগরের ঘোড়াগুলোকে দড়িতে বেঁধে চাবুক বের করে আদের শিক্ষা দিতে সুব্রত করল। ঘোড়াদের চাবুক মারে আর বলে:

‘মানিব বলে মানিব কিনা বল? আমার হৃকুমে চলিব কিনা বল? নইলে তোমার পিটিয়ে মারব, নেকড়ের ঘূর্খে ছাঁড়ে দেব! ’

সাগরের ঘোড়া ছ’টা তখন হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে লাগল:

‘কষ্ট দিও না বীর, মেরো না, যা বলবে সব আমরা শুনব। ধন্মমতে কাজ করব। বিপদে আপদে রক্ষা করব। ’

তখন ইভান মার বন্ধ করে সাতটা ঘোড়াকেই গাড়ীর সঙ্গে যুক্তে বাড়ী ফিরল। গাড়ী ছুটিয়ে এল একেবারে সিংহদরজার সামনে। স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটা সমেত ছ’টা সাগরের ঘোড়াকে আন্তাবলে রেখে দিয়ে ক্ষুদ্রে ইভান গেল রাজার কাছে।

‘মহারাজ, আপনার রথ নিন। গাড়ী-বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে তার ঘোরুক। ’

রাজার তখন আর ধন্যবাদ দেবারও তর সয় না। এক ছুটে রথ থেকে ঝাঁপিটি নিয়ে একেবারে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনার কাছে।

‘আলিওনা, সখ তোমার মিটিয়েছি, সব ইচ্ছে পূরিয়েছি। তোমার ঝাঁপি, তোমার আংটি এনেছি। দেখো, বিয়ের রথ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার বলো, কবে আমাদের বিয়ে হবে, কোন তারিখে নেমন্তন্ত্র করব?’

সুন্দরী রাজকন্যা উত্তর দিল:

‘বিয়ে করতে রাজী আছি, ভোজও শীগ্ৰগিৰই হতে পারে। তবে অমন শাদাচুলো বুড়ো আসবে বৱ হয়ে, সেটা আমার মন চাইছে না। লোকে নিজে কৱবে, দোষ ধৱবে। দেখে হাসবে, বলবে, “একটা বুড়ো হাবড়ার কঢ়ি বৈো।” বুড়োর বউ পরের ধন! লোকের ঘৃখের কথা, চাপা দেবে কে তা! তাই বলি, বিয়ের আগেই আপনি যদি আবার জোয়ান হয়ে যেতে পারেন, তাহলে সব দিক থেকেই ভালো। ’

রাজা বলল:

‘জোয়ান হতে পারলে তো ভালোই। তুমই নয় শিখিয়ে দাও কেমন করে

হব। বৃক্ষে আর্মাই ফিরে জোয়ান হয় এমন কথা তো রাজ্যের কেউ কখনো শোনেনি।'

সুন্দর রাজকন্যা আলিওনা বলল:

তিনটে বড় বড় তাঘার কড়াই চাই। একটাতে থাকবে এক কড়াই ভর্তি দুধ। অন্য দুটোতে ঝরণার জল। একটা জলের কড়াই আর দুধের কড়াইটা আগুনে ঢুকবেন। যেই ফুটতে আরম্ভ করবে অর্মান আপনি প্রথমে লাফিরে পড়বেন দুধের কড়াইতে, তারপর গরম জলেরটাতে আর শেষকালে ঠাণ্ডা জলে। দুব দিয়ে বেরিয়ে এলেই দেখবেন আপনি আবার কুড়ি বছরের সুন্দর জোয়ান হয়ে গেছেন।'

রাজা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পুড়ে যাব না তো ?'

'আমাদের রাজ্য একটিও বৃক্ষে নেই। সবাই এই ভাবে পুনর্ষেৰিবন পায় কিন্তু কেউ তো কোনদিন পুড়ে যায়নি।'

রাজামশাই ফিরে গিয়ে আলিওনার কথামত সব জেগাড় যন্ত্র করল।

দুধ আর জল যখন টিগবগ করে উঠল, রাজা তখন আর মন স্থির করতে পারে না। ভীষণ তার ভয়। কড়াই তিনটের চারদিকে কেবলি পায়চারি করে বেড়ায়। হঠাত তার মাথায় খেলল:

'আরে, আমি এত ভাবছি কেন? আগে ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃক্ষিমান ঝাঁপ দিয়ে চান করে আসুক, দৰ্শি কী হয়। যদি ওর কিছু না হয় তাহলে পরে আমিও ডুব দেব। আর যদি পুড়েই যায় তাহলে কাঁদবার কিছু নেই। ওর ঘোড়া কটা আমার হয়ে যাবে, রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগও দিতে হবে না।'

এই ভেবে রাজা ক্ষুদ্রে ইভানকে দেকে পাঠাল:

'হ্ৰজুৱ মহারাজ, আবার আপনার কী প্ৰয়োজন? আমি যে এখনো একটু জিৱিয়ে নিতেও পাৱিনি।'

'বেশীক্ষণ আটকাব না। তুমি কেবল একবার এই কড়াইগুলোতে ঝাঁপ দাও, ব্যস তারপর তোমার ছুটি।'

ক্ষুদ্রে ইভান কড়াইগুলোর দিকে তাকাল। দুটো কড়াইতে জল আর দুধ ফুটছে। কেবল তৃতীয় কড়াইয়ের জলটা ঠাণ্ডা।

ইভান বললে, ‘বলেন কী মহারাজ, আপনি আমাকে জ্যান্ত পৰ্ডিয়ে মারতে চান নাকি ? এই বৃক্ষ বিশ্বাসী কর্মচারীর পুরস্কার !’

‘আমি, না না ইভান, কোনো বৃক্ষে যদি ঐ কড়াইগুলোতে একবার করে দুর্ঘটনাতে পারে, ব্যস অমনি সে জোয়ান সুপুরূষ হয়ে যাবে।’

‘হৃজুর মহারাজ, আমি তো এমনিতেই বৃক্ষে নই, জোয়ান হবার কী আছে আমার ?’

ভীষণ রেগে গেল রাজা :

‘আচ্ছা বেয়াদব তো হে তুমি ! আমার কথার ওপরে কথা । নিজের ইচ্ছেয় যদি ডুব না দাও তবে জোর করে দেওয়াব, যম দ্বয়ারে পাঠাব !’

ঠিক সেই সময় সুন্দরী রাজকন্যা আলিঙ্গন ছুটে এল ঘর থেকে । সুযোগ বুঝে রাজার অলঙ্কা ফিসফিস করে ক্ষুদ্র ইভানকে বলল :

‘কাঁপ দেবার আগে তোমার সাগরের ঘোড়া আর স্বর্ণকেশীর ঘোড়াকে জানিয়ে দাও । তাহলে আর ভয় থাকবে না ।’

রাজাকে বলল :

‘দেখতে এলাম যা বলেছি সব ঠিকঠাক আয়োজন করা হয়েছে কিনা ।’

এই বলে রাজকন্যা এগিয়ে গিয়ে কড়াইগুলোর মধ্যে উর্ধ্ব মেরে দেখল ।

বলল, ‘ঠিক আছে । এবার মহারাজ চান করে নিন । আমি বিয়ের জন্মে তৈরী হই গো ।’

এই বলে রাজকন্যা ঘরে চলে গেল । ক্ষুদ্র ইভান বড় বৃক্ষিমান রাজার দিকে একবার চেয়ে বলল :

‘বেশ, রাজামশাই, শেষবারের মতো আপনার সথ মেটাব । কী আর আছে করবার, মরবে মানুষ একবার । কেবল আমার স্বর্ণকেশীর ঘোড়াটাকে দেখে আসি । আমরা দ্ব’জন একসঙ্গে কত ঘূরে বেড়িয়েছি । কে জানে কীভাবে এই শেষ দেখা ।’

‘ঘাও, কিন্তু বেশী দেরী করো না ।’

ক্ষুদ্র ইভান তখন আস্তাবলে গিয়ে তার স্বর্ণকেশীর ঘোড়া আর ছ’টা সাগর ঘোড়ার কাছে সব কথা খুলে বলল । ঘোড়ার বলল :

‘আমরা মেঝে একসঙ্গে তিনবার ডাকব অমনি তুমি নির্ভয়ে ঝাঁপ দিও।’

ইভান বাঞ্ছার কাছে ফিরে গিয়ে বলল:

‘মহারাজ! আমি প্রস্তুত, এই মহুর্তে ঝাঁপ দেব।’

ইভান শুনতে পেল ঘোড়াগুলো ডাকছে — এক বার, দ্বিতীয় বার, তিন বার — তিনভাবে শোনামাত্র ঝপাং — ইভান একেবারে গরম দৃষ্টিতে মধ্যে ঝাঁপয়ে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এসে গরম জলে লাঞ্ছিয়ে পড়ল। আর সবশেষে ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে ইভান ষথন বেরিয়ে এল তখন সে কী তার রূপ! সে রূপ বলার নয়, লেখার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়।

রাজা ক্ষুদ্রে ইভানকে দেখে আর ইতস্তত করল না। কোনোত্তমে বেদীর উপর উঠে গরম দৃষ্টি ঝাঁপ দিল, সিদ্ধ হতে থাকল সেখানেই।

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা তখন পাঢ়িমারি ছুটে এল। ক্ষুদ্রে ইভান বড়ো বৃদ্ধিমানের ধবধবে হাতটা তুলে নিয়ে আঙুলে পরিয়ে দিলে আংটিটা। মিষ্টি হেসে বললে:

‘তুমি আমায় রাজাৰ হৃকুমে হৱণ কৰেছো। এখন তো আৱ রাজা নেই; এখন তোমার যা খৰ্বশ। ইচ্ছে হয় আমায় আবাৰ ফিরিয়ে দিও, ইচ্ছে হয় কাছে রেখো।’

ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃদ্ধিমান সুন্দরী রাজকন্যার হাতটি ধৰে বৈ বলে ডাকলে, আঙুলে তার নিজেৰ আংটিটি পরিয়ে দিলে।

তারপর দ্বিতীয় পাঠিয়ে বাবা, মা, তার বগ্রিশ ভাইকে বিঘেৰ নেমন্তন্ত্রে ডেকে আনলে গ্রাম থেকে।

কিছু পৱেই রাজবাড়িতে এসে হাজিৰ হল বাগ্রশিটি তৱুণ বীৱি। আৱ তাৰ বাবা আৱ মা।

বিঘে হল, ভোজ হল। ক্ষুদ্রে ইভান বড় বৃদ্ধিমান আৱ তার সুন্দরী বৈ নিয়ে সুখেস্বচ্ছদে দিন কাটায়। মা বাপেৰ দেখাশোনা কৰে।



মাছের আজ্ঞায়

এক যে ছিল বুড়ো। বুড়োর তিন ছেলে। দুজন ছিল খুব চালাক চালাক
কিন্তু তৃতীয় জন হাঁদা ইয়েমেল্যা।

বড় দু'ভাই সারাক্ষণ কাজ করে আর ইয়েমেল্যা খালি চুল্লীর তাকে শুরে
থাকে, কোনো কিছু শেখার আগ্রহ নেই।

একদিন বড় ভাইয়েরা হাটে গেছে, তাদের দু'বো ইয়েমেল্যাকে বলল:

‘ইয়েমেল্যা, যাও তো, জল নিয়ে এসো।’

ইয়েমেল্যা চুল্লীর তাকে শুরে শুরেই বলে:

‘ইচ্ছে কৰছো জো...’

‘যাও ইয়েমেল্যা, নইলে কিন্তু দাদারা তোমার জন্যে হাট থেকে কিছু আনবে না, দেখো।’

‘কেশ, তবে যাচ্ছি।’

তড়াক করে চুল্লী থেকে নেমে ইয়েমেল্যা জামা জুতো পরে বালতি কুড়ুল নিয়ে নদীর দিকে চলল।

নদীতে গিয়ে ইয়েমেল্যা কুড়ুল দিয়ে বরফের গায়ে একটা গর্ত খুঁড়ে দ্বাৰা বালতি জল তুলল। তারপর বালতিদ্বারা নামিয়ে রেখে উৎকি দিয়ে দেখল বরফের গর্তের ভিতরে। দেখে কি, একটা মাছ। ধাঁ করে ইয়েমেল্যা মুঠোর মধ্যে মাছটাকে ধরে ফেলল।

‘বাঃ, তোমা মাছের ঝোল হবে আজ।’

মাছটা হঠাতে মানবের গলায় বলে উঠল:

‘ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, উপকার করব।’

ইয়েমেল্যা কিন্তু হেসে উঠল:

‘তুমি আবার কী উপকার করবে? না হে বাপ, আমি তোমায় বাড়ীতেই নিয়ে ঘাব, বৌদিদের বলব ঝোল বানিয়ে দিতে। চমৎকার ঝোল হবে।’

কিন্তু মাছটা আবার ঘিনতি করে বলতে লাগল:

‘আমায় ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, তুমি যা চাও আমি তাই করব।’

ইয়েমেল্যা বলল, ‘ঠিক আছে, তবে আগে দেখাও যে তুমি ফাঁকি দিচ্ছো না, তবে ছেড়ে দেব।’

মাছ বলল:

‘তুমি কী চাও, বলো।’

‘আমি চাই আমার বালতিদ্বারা নিজেরাই হেঁটে হেঁটে বাড়ী চলে যাক, কিন্তু এক ফেঁটা জলও যেন চলকে না পড়ে...’

মাছ বলল:

‘আমার কথা মনে রেখো, তোমার কিছু দরকার হলে কেবল বলো:

মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় !’

ইয়েমেল্যা বলে উঠল:

‘মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

বাল্পতি, তোরা নিজেরা হেঁটে হেঁটে বাড়ী চলে যা তো !’

যেই না বলা, অম্ভনি সৱ্যসাত বাল্পতি পাঢ় বেয়ে উঠতে স্বীকৃত করল।
ইয়েমেল্যা মাছটাকে সেই বরফের গতে ছেড়ে দিয়ে বাল্পতিদুটোর পিছন পিছন
হাঁটতে লাগল।

বাল্পতিদুটো গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। গ্রামবাসীরা সব অবাক।
ইয়েমেল্যা কিন্তু হাসে আর বাল্পতির পিছন পিছন আসে ... বাল্পতিদুটো সোজা
ইয়েমেল্যার বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে মাচার উপর উঠে বসল। ইয়েমেল্যাও তার
চুল্লীর তাকে উঠে গা গড়ালে।

গেল অনেক দিন, মাঝি অল্প দিন। বৌদিরা এসে আবার ইয়েমেল্যাকে
বলে:

‘ইয়েমেল্যা, শুয়ে আছো যে ? বরং কিছু কাঠ চালা করো !’

‘আমার ইচ্ছে করছে না ...’

‘না গেলে কিন্তু হাট থেকে দাদারা তোমার জন্যে কিছু আনবে না !’

ইয়েমেল্যার মোটেই চুল্লীর তাক ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না। মাছের কথা
মনে পড়ল তার, ফিস্ফিস্ক করে বলল:

‘মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

যা কুড়ুল গিয়ে কাঠ চালা কর, আর চালা কাঠ তোরা বাড়ীতে চুকে
চুল্লীর মধ্যে লাফিয়ে পড় !’

যেই না বলা, অমনি সত্ত্ব সত্ত্ব কুড়ুলটা বেঞ্চের তল থেকে বেরিয়ে এসে উঠেনে কাঠ কাটতে লাগল, আর চালা কাঠগুলোও সার বেঁধে নিজেরাই ঘরের মধ্যে চুকে চুল্পীতে লাফিয়ে পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ। বৌদ্ধিরা আবার এসে ইয়েমেল্যাকে বলল:

‘একটুও কাঠ নেই, ইয়েমেল্যা, যাও বনে গিয়ে কিছু কাঠ কেটে আনো।’

ইয়েমেল্যা চুল্পীর ওপর থেকে বলল:

‘তোমরা রয়েছো কী করতে?’

‘কী বলছো তুমি, ইয়েমেল্যা? বনে গিয়ে কাঠ কাট কাট কি আমাদের কাজ?’

‘আমার ইচ্ছে করছে না ...’

‘তবে কোনও জিনিষও পাবে না।’

কী আর করে, ইয়েমেল্যা চুল্পীর তাক থেকে নেমে এসে জুতো জামা পরে দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে উঠেনে গেল। তারপর স্লেজে চড়ে চেঁচিয়ে উঠল:

‘ফটক খুলে দাও!’

বৌদ্ধিরা বলল:

‘করছো কী হাঁদারাম, স্লেজে বসেছো ঘোড়া জোতোনি?’

‘ঘোড়া টোড়ার দরকার নেই আমার।’ বৌদ্ধিরা ফটক খুলে দিল আর ইয়েমেল্যা ফিস্ফিস্ক করে বলল:

‘মাছের আঙ্গায়,

মোর ইচ্ছায় —

যা স্লেজ, চলে যা বনে ...’

যেই না বলা, অমনি সত্ত্ব সত্ত্ব স্লেজটা এমন জোরে ছাটকে পার হয়ে দৌড়তে লাগল, যে ঘোড়া ছুটিয়েও তার নাগাল পাওয়া ভার।

বনের পথটা গেছে এক সহরের মধ্যে দিয়ে, স্লেজটা যে কত লোককে উল্টে ফেলে দিল, কত লোককে চাপা দিল, তার আর ইয়ত্তা নেই। সহরের

লোক সব ‘ধরো, ধরো, পাকড়ো, পাকড়ো!’ করে চেঁচিয়ে উঠল। ইয়েমেল্যা
কিন্তু তোয়াক্ষীর করল না, কেবল স্লেজটাকে আরও জোর ছোটাল। বনে এসে
সে বলে—

‘মাছের আঙ্গায়,
মোর ইচ্ছায় —

যা কুড়ুল, কিছু শুকনো দেখে ডাল কেটে নিয়ে আয় আর কাঠরা, তোরা
স্লেজে উঠে আপনা থেকেই বাঁধা হয়ে যা...’

যেই না বলা, অম্বিন সত্তি সত্তি কুড়ুল খট্খট্ খট্খট্ — শুকনো কাঠ
কাটতে লেগে গেল, আর কাঠগুলোও একটার পর একটা স্লেজে উঠে দড়ি বাঁধা
হয়ে যেতে লাগল। ইয়েমেল্যা তখন কুড়ুলকে একটা ভীষণ ভারী মৃগার কেটে
দিতে হ্রস্ব করল। এমন ভারী যেন তুলতে কঢ়ত হয়। তারপর সেই কাঠের
বোঝার উপর বসে বলল:

‘মাছের আঙ্গায়,
মোর ইচ্ছায় —

চল, স্লেজ, বাড়ী চল!'

স্লেজটাও ছুটল বাড়ীমুখো। যে সহরটার অনেক লোককে সে আসার সময়
চাপা দিয়েছিল, তারা তো লাঠি সোঁটা নিয়ে তৈরী — কখন সে ফেরে।
ইয়েমেল্যাকে তারা ধরে স্লেজ থেকে টেনে নামিয়ে গাল দেয়, পিটোয়।

বাপার সঙ্গীন দেখে ইয়েমেল্যা ফিস্ফিস্ করে বলে উঠল:

‘মাছের আঙ্গায়,
মোর ইচ্ছায় —

আয় মৃগার, দে ব্যাটাদের হাড় গুঁড়িয়ে ...’

মৃগারও অম্বিন লাফিয়ে উঠে দে পিটীন। সহরের লোক দে ছুট। ইয়েমেল্যা
তখন বাড়ী ফিরে আবার চুম্বীর তাকে উঠে শূয়ে পড়ে

অনেক দিন মাকি অল্প দিন — ইয়েমেল্যার কীর্তির কথা রাজার কানে গেল। রাজপ্রসন্নদে তাকে নিয়ে ঘাবার জন্যে লোক পাঠাল রাজা।

রাজার লোক এল ইয়েমেল্যার প্রামে। তার কুঁড়েছরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল:

‘তুমই কি হাঁদা ইয়েমেল্য ?’

চুম্বীর তাকের উপর থেকেই ইয়েমেল্যা বলে:

‘তোমার তাতে কী ?’

‘তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নাও, তোমায় রাজার বাড়ী নিয়ে ঘাব !’

‘আমার ইচ্ছে করছে না ...’

রাজার লোকটা রেগে গিয়ে ইয়েমেল্যার গালে মারলে এক চড়। ইয়েমেল্যা তখন ফিস্ফিস করে বলল:

‘মাছের আঞ্চায়,
মোর ইচ্ছায় —

দে তো মৃগুর হাড় গঁড়িয়ে ...’

সঙ্গে সঙ্গেই মৃগুর লাফিয়ে উঠে এমন মার মারলে যে লোকটা কোনোক্ষণেই পালিয়ে বাঁচল।

রাজার পেয়াদা ইয়েমেল্যাকে কাবু করতে পারেনি শুনে রাজা গেল অবাক হয়ে। মহাসামন্তকে ডেকে বলল:

‘হাঁদা ইয়েমেল্যাকে খুঁজে পেতে আমার কাছে ধরে আনা চাই, নইলে তোমার গর্দান ঘাবে !’

রাজার মহাসামন্ত কিশৰিশ, খেজুর আৱ মিষ্টি-রূটি কিনে ঝুঁপে সেই সে ঘামের সেই সে বাড়ীতে এসে বোর্দিদের কাছে জিজ্ঞেস কৰল ইয়েমেল্যা সবচেয়ে কী ভালবাসে।

ওৱা বলল, ‘ইয়েমেল্যা চায় মিষ্টি কথা। ওৱা সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার কৰেন, লাল কাফতান উপহার দেন, তবে যা বলবেন ও তাই কৰে দেবে।’

মহাসামন্ত তখন ইয়েমেল্যাকে সেই সব কিশোরিশ, খেজুর, গিঞ্চি-রুটি
দিয়ে বলল:

‘ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, কেন শুধু শুধু চুল্লীর তাকে শুয়ে আছো? চলো না আমার সঙ্গে রাজার বাড়ী যাই।’

ইয়েমেল্যা বলল, ‘এখানেই বেশ আছি...’

‘ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় কত ভালোমন্দ খাওয়াবেন। চলো যাই।’

‘আমার ইচ্ছে করছে না...’

‘ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় দেবেন একটা লাল কাফতান, টুপি, জুতো।’

ইয়েমেল্যা ভেবে চিন্তে বলল:

‘ঠিক আছে, আপনি আগে আগে চলে যান, আর্য পরে আসছি।’

মহাসামন্ত ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল, ইয়েমেল্যা চুল্লীর তাকে আরও কিছুক্ষণ
শুয়ে থেকে বলল:

‘আছের আজ্ঞায়,

মোর ইচ্ছায় —

চল চুল্লী, আমায় রাজার বাড়ী নিয়ে চল।’

যেই না বলা, অর্মনি ঘরের কোণ ফেটে গেল, বাড়ীর চাল নড়ে উঠল,
একদিকের দেয়াল ধরসে পড়ল আর চুল্লীটা নিজে নিজেই বেরিয়ে পড়ে সোজা
পথ ধরে রওনা দিল রাজবাড়ীর দিকে।

রাজামশাই তো জানলা দিয়ে বাইরে তার্কিয়ে অবাক।

‘ওটা কী ব্যাপার?’

মহাসামন্ত বলল:

‘আজ্ঞে, ঐ তো ইয়েমেল্যা, তার চুল্লীতে চড়ে আপনার প্রাসাদে
আসছে।’

রাজামশাই অলিন্দে এসে বললে:

‘শোনো ইয়েমেল্যা, তোমার নামে অনেক নালিশ এসেছে। অনেক লোককে
সেলজ চাপা দিয়েছো তুমি।’

‘ওরা আমার সেলজের নিচে পড়ল কেন?’

রাজার মেয়ে রাজকন্যা মারিয়া সেই সময় জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল
তাকে। ইয়েমেল্যা দেখেই ফিস্ফিস্ করে বলল:

‘মাছের আঙ্গুয়,
মোর ইচ্ছায় —

রাজার মেয়ে আমায় ভালবাসুক ...’

তারপর বলল, ‘চল চুল্লী, বাড়ী চল।’

চুল্লীটা ঘৰে সোজা ইয়েমেল্যার গ্রামে পৌঁছে গেল। তারপর বাড়ী দুকে
ঠিক নিজের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইয়েমেল্যাও শুয়ে রাইল আগের
মতো।

ওদিকে রাজবাড়ীতে তখন কানাকাটি পড়ে গেছে। রাজকন্যা মারিয়া
ইয়েমেল্যার জন্যে অস্থির, ওকে নইলে বাঁচবে না। রাজাকে সে কত করে বলতে
লাগল ইয়েমেল্যার সঙ্গে বিয়ে দিক। বিপদে পড়ে গেল রাজা। মনের দৃঃংখে
শেষে তার মহাসামন্তকে ডেকে বলল:

‘যা ও, ইয়েমেল্যাকে নিয়ে এসো। জ্যান্ত মরা যে ভাবে পাও, নইলে তোমার
গর্দান যাবে।’

মহাসামন্ত তো আবার নানারকম সুন্দর সুন্দর খাবার দাবার, ঘৰ্ষিষ্ঠ মাঝ
নিয়ে রওনা হল। সেই সে গ্রামের সেই সে বাড়ীতে গিয়ে রাজভোজ খাওয়াতে
লাগল ইয়েমেল্যাকে।

ইয়েমেল্যা পান করল, ভোজন করল, বেহংশ হয়ে ঘৰ্ময়ে পড়ল। মহাসামন্ত
তখন ঘৰ্মন্ত ইয়েমেল্যাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে সোজা ছান্টে গেল রাজার
কাছে।

রাজামশাহী তখন একটা মন্ত লোহা-লাগানো প্লাটে নিয়ে আসার হুকুম

দিল। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মারিয়াকে ভিতরে পুরে পিপেটা আলকাতরা মাথিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল সমন্বয়ে।

বহুক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, কে জানে। ঘূর্ম ভেঙে ইয়েমেল্যা দেখে — চারিসকে চাপাচার্প, অন্ধকার।

‘কোথায় আমি?’

উত্তর এল, ‘আমাদের কপাল খারাপ, আমার আদরের ইয়েমেল্যা! ওরা আমাদের একটা আলকাতরা মাথানো পিপেতে পুরে নীল সমন্বয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে।’

ইয়েমেল্যা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কে?’

‘আমি রাজকন্যা মারিয়া।’

ইয়েমেল্যা বলল:

‘মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

আয় তো রে ঝড়ের হাওয়া পিপেটাকে নিয়ে যা শুকনো তীরে, হলুদ বালিতে ...’

যেই না বলা, অর্মানি জোর হাওয়া উঠল, সমন্বয়ের বৃক দ্বলে উঠল, আর পিপেটা গিয়ে টেকল শুকনো তীরে, হলুদ বালিতে। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মারিয়া বেরিয়ে এল বাইরে। রাজকন্যা বলল:

‘থাকব কোথায়, ইয়েমেল্যা? তুমি যেমন হোক একটা ঘর তোলো।’

‘আমার ইচ্ছে করছে না ...’

রাজকন্যা তখন অনেক সাধ্যসাধনা করল। ইয়েমেল্যা বলল:

‘মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

এক্ষণ্ণ এখানে সোনার ছাদওয়ালা একটা পাথরের প্রাসাদ হয়ে থাক ...’

বলতে না বলতেই সোনার ছাদওয়ালা একটা চমৎকার পাথরের প্রাসাদ হয়ে
গেল তাদের ছেঁথের সামনে। চারদিকে তার সবৃজ বাগান: ফুল ফুটছে, পাখি
গাইছে। রাজকন্যা মারিয়া আর ইয়েমেল্যা প্রাসাদের ভিতর ঢুকে জানলার
পাশে বসল।

রাজকন্যা বলল, ‘আচ্ছা ইয়েমেল্যা, খুব সুন্দর হয়ে যেতে পারো না তুমি?’
ইয়েমেল্যার ভাবার কিছু ছিল না। বলে উঠল:

‘মাছের আঞ্চায়,
মোর ইচ্ছায় —

হয়ে ঘাই যেন বীর তরুণ, রূপে অরুণ ...’

অঘীন এমন সুন্দর হয়ে উঠল ইয়েমেল্যা যে সে রূপে বলার নয়, কওয়ার নয়,
কলম দিয়ে লেখার নয়।

এদিকে হয়েছে কী, ঠিক সেই সময় রাজামশাই শিকার করতে এসে দেখে,
আগে যেখানে কিছু ছিল না সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ।

‘কার এত বড় আস্পদৰ্দ্দী, আমার অনুমতি না নিয়ে আমার জৰিতে বাড়ী
বানায়!’

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ছুটল খোঁজখবর করতে: কে লোকটা।

দ্রুতেরা ছুটে গিয়ে জানলার নীচ থেকে জিজ্ঞেসাবাদ করে।

ইয়েমেল্যা বলে:

‘রাজামশাই আমার ঘরে অতিথি আস্বন, আমি নিজে তাঁকে বলব।’

রাজামশাই অতিথি এল, ইয়েমেল্যা তাকে বরণ করে নিয়ে এল পুরীতে,
টেবলে বসাল। শুরু হল ভোজ। রাজামশাই চৰ্বা-চোষা-লেহ্য-পেয় থায় আর
অবাক হয়ে থায়। শেষকালে আর থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করলে:

‘কে তুমি তরুণ বীর?’

ইয়েমেল্যা বলল, ‘হাঁদা ইয়েমেল্যাকে আপনার মনে আছে? সেই যে চুলীর
মাথায় চড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে আর রাজকন্যা

মারিয়াকে আন্তর্ভুক্তরা মাথা পিপেতে পুরে সম্ভবে ডাসিয়ে দিয়েছিলেন? আমিই সেই ইয়েমেল্য। ইচ্ছে করলে আপনার সমস্ত রাজস্বটা জৰালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে পারি আমি।’

রাজামশাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে ইয়েমেল্যার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল।

শুনল:

‘আমার মেয়েকে বিয়ে করো ইয়েমেল্যা, আমার রাজস্ব ভোগ করো, কিন্তু প্রাণে মেরো না।’

অমনি, কী আয়োজন, পান ভোজন। রাজকন্যা মারিয়াকে বিয়ে করে সুখেস্বচ্ছন্দে রাজস্ব করতে লাগল ইয়েমেল্য। কাহিনী হল সারা, শুনল লক্ষ্মী ঘারা।



ନିକିତା କର୍ଜେମ୍ୟାକା

একবার কিয়েভের কাছে এক নাগের উৎপাত সৃষ্টি হল। লোকের কাছ থেকে সে ডেট নিত কম নয়: প্রত্যেক ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী মেয়েটি মেয়েটিকে নিত আর খেয়ে ফেলত।

এবার রাজাৰ মেয়েৰ পালা। রাজকন্যাকে ধৰে নিয়ে নাগ এল তাৰ শহায়। কিন্তু থেলে না, রাজকন্যা থবই সুন্দরী, বিয়ে করে নিল। নাগ মুলৈ ঘায় তাৰ কাজে, রাজকন্যাকে দৰজা বন্ধ করে রাখে যেন পালাতে না পারে।

রাজকন্যার একটা কুকুৰ ছিল। রাজকন্যার পিছু পিছু এসেছিল কুকুৰটা। রাজকন্যা বাবা-মা'ৰ কাছে ছোট একটা করে চিঠি লিখে কুকুৰেৱ গলায় বেঁধে

দেয়, আর কুকুরটি যেখানে ঘাবার ছুটে যায়, উভর নিয়ে আসে। একদিন রাজা আর রাণী রাজকন্যাকে লিখে পাঠাল, রাজকন্যা যেন জেনে নেও নাগের চেয়েও শক্তিশালী কে।

রাজকন্যা নাগের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতে থাকে, জানতে চেষ্টা করে নাগের চেয়ে কে বলবান। অনেক দিন নাগ কিছু বলেনি, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, কিয়েভে নির্কিতা কজেম্যাকা* আছে, তার গায়ে নাগের চেয়েও জোর। রাজকন্যা সে কথা শুনে রাজাকে লিখে পাঠাল: “নির্কিতা কজেম্যাকাকে কিয়েভে সহরে খুঁজে বের করে আগ্রায় উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।”

ব্যবর পেয়ে রাজা তক্ষণ নির্কিতা কজেম্যাকাকে খুঁজে বের করে নিজেই তাকে অনুরোধ করল নাগের কবল থেকে যেন সে তার রাজত্ব আর তার কন্যাকে উদ্ধার করে।

রাজা যখন নির্কিতার বাড়ী গেল, নির্কিতা তখন চামড়া দলাই করছে, হাতে তার বারোটা চামড়া। স্বয়ং রাজা আসছে তার কাছে এই দেখে নির্কিতা ভয়ে এমন কঁপতে লাগল যে, তার বারোটা চামড়া ছিঁড়ে গেল। একেই রাজা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, তাতে এই লোকসান, ভারী রাগ হয়ে গেল নির্কিতার, রাজারাণীর হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই নাগ মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যেতে রাজি হল না।

তখন, পাষণ্ড নাগের উৎপাতে ধারা অনাথ হয়েছে তেমন পাঁচহাজার শিশুকে পাঠান হল নির্কিতার কাছে। তারা মিনাতি করে বলবে নির্কিতা যেন রূশ দেশকে এই মহা বিপদ থেকে বাঁচায়।

অনাথ শিশুর দল নির্কিতার কাছে গিয়ে তাদের জল ভরা চোখ তুলে নাগ মারবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। অনাথের চোখের জল দেখে নির্কিতার মন করুণায় ভরে গেল। তিনশ' পদ শগের দাঢ়ি নিয়ে তাতে জালকাতরা মাথাল নির্কিতা। নাগের কামড় থেকে বাঁচাবার জন্যে বেশ করে নিজের শরীর বেড়ে তা বেঁধে নিল। তারপর চলল লড়াই করতে।

* কজেম্যাকা মানে চামার।

নিকিতা এন্টে নাগের গৃহার কাছে। নাগ ওদিকে হৃড়কো লাঁগয়ে বসে আছে গৃহার কিছুতেই বেরতে চায় না।

নিকিতা হাঁকল, ‘শীগ্ৰি গুৰি বৈৱিয়ে আয়, খোলা মাঠে লড়ব, নইলে গৃহা তোৱ কেন্দ্ৰে গুড়িয়ে দেব এখনি।’ বলে দৰজা ভাঙতে সূৱত কৱে দিল মিকিতা।

নাগ দেখল বিপদ, কী আৱ কৱে, বৈৱিয়ে এসে খোলা মাঠে নিকিতাৰ সঙ্গে লড়াই সূৱত কৱল। অনেক দিন নাকি অল্প দিন, কৰ্তৃদিন লড়াই চলল, শেষ পৰ্যন্ত নাগকে ভূপাতিত কৱল নিকিতা, নাগ মিনাতি কৱতে লাগল:

‘একেবাৱে প্ৰাণে ঘৰে ফেলো না, নিকিতা। সাৱা প্ৰথিবীতে তোমাৰ আৱ আমাৰ মতো শৰ্কু আৱ কাৱো নেই। চলো আমৱা প্ৰথিবীটা দৰ্দ'ভাগে ভাগ কৱে নেই। এক অংশে থাকবে তুমি, অন্য অংশে আমি।’

নিকিতা রাজি হয়ে বলল, ‘বেশ, কিন্তু আগে সীমানা ঠিক কৱা চাই।’

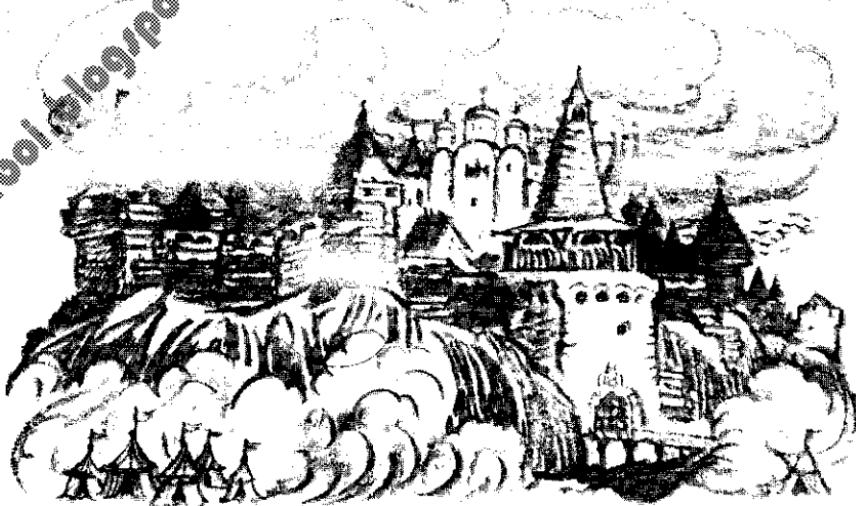
নিকিতা তখন একটা তিনশ’ পুদ্ৰ ওজনেৰ লাঙল বানিয়ে সেটা নাগেৰ ঘাড়ে ঘূতে মাটি ফেড়ে দাগ দিতে লাগল। সে দাগ গেল কিয়েভ থেকে কাভস্তুয়ান সম্মুখ পৰ্যন্ত।

নাগ বলল, ‘কী এবাৰ সাৱা প্ৰথিবীটা ভাগ হয়েছে তো?’

নিকিতা বলল, ‘মাটি ভাগ হয়েছে বটে, এবাৰ সম্মুচ্ছটাও ভাগ কৱব, নয়ত কে জানে, তুই হয়ত বলীব আমি তোৱ জল নিয়ে নিৰ্ছিছি।’

নাগ ঘখন মাৰ সম্মুখ অৰ্বাধি গেছে তখন নিকিতা তাকে ঘৰে তাৰ শৱীৱীটা সম্মুখে ডুবিয়ে দিল।

নিকিতাৰ পুণ্য কাঞ্জ শেষ হল। কাজেৱ জন্যে কিছু সে নিল না। বাঢ়ি ফিরে আবাৱ সে চামড়াৰ কাজে লেগে গেল।



ইলিয়া মুরমেৎসের প্রথম অভিযান

অনেক অনেক বছর আগে মুরম সহরের কাছে, কারাচারোভো গ্রামে এক চাষী থাকত, তার নাম ইভান তিমোফেয়েভিচ। বৌয়ের নাম ইয়েফ্রেসিনিয়া ইয়াকোভলেভনা। তাদের একটিমাত্র ছেলে, ইলিয়া।

ইলিয়া একদিন সাজগোজ করে মা-বাবাকে বলল:

‘বাবা-মা শোনো, রাজধানী কিয়েভ নগরে যাব রাজা ভ্যাদিমেরের কাছে। ধর্মমতে জন্মভূমি রাশিয়ার সেবা করব। শত্রুর হাত থেকে রাজা ঘাটিকে বঁচাব।’

বুড়ো বাপ ইভান তিমোফেয়েভিচ বলল:

‘তোমার ভাল কাজে আমার আশীর্বাদ রাইল, মন্দ করজি নয়। সোনাদানার জন্যে নয়, লাভের আশায় নয়, রুশ দেশকে রক্ষা করতে ইমানের নামে, বীরের

গোরবে। বিনা ক্ষমতারে মানবের রক্তপাত করো না; মাস্তের চোখে জল ঝরিয়ে না; ভুলে ফেও না তুমি চাষীর ছেলে, মাটির ছেলে।'

আন্ধমি কুর্নিশ করে ইলিয়া ঘোড়ায় লাগাম পরাতে চলে গেল। ঘোড়ার নাম ঝাঁকড়া-লোমো। ইলিয়া জিনের কাপড়টা ঘোড়ার পিঠে ফেলল, তার ওপর দিল আন্তর, তারপর সেই চেরকেসীয় জিনটা। তার বারোটি বন্ধনী রেশেমের, আর তেরটা লোহার। শোভার জন্যে নয়, মজবুতির জন্যে।

ইলিয়ার ইচ্ছে হল নিজের শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখে।

ঘোড়া ছুটিয়ে ইলিয়া ওকা নদীর তীরে গেল। নদীর পাড়ের উচু পাহাড়টায় কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলে দিল জলের মধ্যে। সে পাহাড়ে নদীর খাত বন্ধ হয়ে গেল, নদীটাকে বাঁক নিতে হল অন্য পথে।

ইলিয়া এক টুকরো কালো রুটির ছাল ছিঁড়ে ওকা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বললে:

'ওকা, আমার মা! ইলিয়া মুরমেৎসকে খাইয়েছো, দাইয়েছো। তোমায় ধন্যবাদ!'

চলে থাবার আগে ইলিয়া জন্মভূমির এক মুঠো মাটি সঙ্গে নিল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে চাবুকটা একবার সঙ্গেরে চালাল ...

লোকে দেখল ইলিয়া ঘোড়ায় উঠেছে। দেখতে পেল না কোথায় গেল। মাঠের মধ্যে জেগে উঠল শুধু একটা ধূলোর মেঘ।

ইলিয়ার চাবুক পড়ে আর ঝাঁকড়া-লোমো এক এক লাফে দেড় ভাস্ট এগিয়ে যায়। যেখানে ঘোড়ার খুর মাটিতে ঠেকে সেখানেই জেগে ওঠে জলের ফোয়ারা। ইলিয়া একটা করে মন্ত্র ওক গাছ কেটে তোরণ বানিয়ে দেয় ফোয়ারার ওপর দিয়ে। তোরণের গায়ে খোদাই করে দেয়: "চাষীর ছেলে রূশী বগাতীর ইলিয়া ইভানভিচ এসেছিল এখানে!"

সেই ফোয়ারার ঝরণা আজও তোরণের তল দিয়ে ঘৰে ছিলেছে। রাতের বেলা ভালুক ঘাস সেখানে ঠাণ্ডা জল খেতে। আর সেই জল খেয়ে খেয়ে তার গায়ে হয় বগাতীরের শক্তি।

এমনি করে ইলিয়া চলল কিয়েভ সহরের দিকে।

চেরানিগভ সহরের মধ্যে দিয়ে সিধে রাস্তা। ইলিয়া চলল সেই রাস্তা ধরে। চেরানিগভ সহরে আসতেই শোনে দেয়ালের কাছে ভীষণ গম্ভগোল: হাজার হাজার^১ তাতার বাহিনী সহর ঘেরাও করেছে। ঘোড়ার খুরের ধূলোয়, মৃথের রিংশাসে সারা প্রথিবী আঁধার, সূর্য ঢাকা পড়েছে। মেঠো খরগোসেরও সাধ্য নেই গলে যায়, ঝলমলে বাজপার্থিরও ক্ষমতা নেই উড়ে যায়। সহরের ভিতর থেকে আসে কান্নার আওয়াজ, আর্টিনাদ, সৎকারের ঘণ্টাধূরনি। সহরের লোকজন সব পাথরের গির্জার মধ্যে চুকে দ্রব্যা আটকে বসে বসে কাঁদছে, প্রার্থনা করছে, আর মৃত্যুর জন্যে তৈরি হচ্ছে, কারণ চেরানিগভ সহরকে ঘেরাও করেছে তিনজন তাতার রাজা, এক একজনের চাঁপ্পশ হাজার করে সৈন্য।

ইলিয়ার বকে আগুন জললে উঠল। ঝাঁকড়া-লোমোর রাশ টেনে একটা কঁচা ওক গাছ শিকড়শুল্ক উপড়ে নিয়ে শগ্নির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইলিয়া। বাড়ি মারে সে ওক গাছ দিয়ে, ঘোড়ার খুরে মাড়িয়ে দিয়ে যায় শগ্নির দের। গাছটা এদিকে হাঁকায় অমনি পথ হয়ে যায়, ওদিকে হাঁকায় অমনি গলি। ইলিয়া ঘোড়া ছুটিয়ে গেল তিন রাজার কাছে। গিয়ে তাদের সোনালী ঝুঁটি ধরে বলল এই কথা:

‘ধিক তোদের, তাতার রাজা! কী ভাস্তারা, বন্দী করব নাকি মাথা কেটে ফেলব? বন্দী করব কিন্তু রাখব কোথায়? পথে বেরিয়েছি, ঘরে বসে নেই। আমার থলির রুটি নিজের জন্যে, নিষ্কর্মাদের জন্যে নয়। মাথা নেব — সেটায় বগাতীর ইলিয়া মূরমেৎসের গৌরব বাড়বে না। তাই পালা তোদের বাহিনীর এলাকায়, শগ্নি-মহলে, রাষ্ট্র করে দে, জন্মভূমি রাশিয়া জনশৃঙ্খল নয় — সে দেশে আছে মহাবল মহাবীর বগাতীররা, শগ্নিরা যেন তা মনে রাখে।’

এই বলে ইলিয়া চুকল চেরানিগভ সহরের ভিতর। পাথরের গির্জায় যেখানে সবাই কাঁদছে, কোলাকুলি করছে, শেষ বিদায় নিছে, সেখানে গিরে ইলিয়া বলল:

‘নমস্কার চেরানিগভবাসী, পূরুষ তোমরা, কাঁদছো কেন, কোলাকুলি করছো, শেষ বিদায় নিছো?’

‘না কেবল উপর কী, তিনজন তাতার রাজা চালিশ হাজার করে সৈন্য
নিয়ে আমাদের চেরানিগড় সহর ঘেরাও করেছে ! মরার অপেক্ষায় আছি !’

‘দুর্গের প্রাচীরে উঠে খোলা মাঠে শত্রুবাহিনীর দিকে একবার তাকিয়ে
দেখো দৌধি,’ ইলিয়া বলল।

সকলে প্রাচীরের উপরে উঠে দেখে কী, শিলাবৃষ্টিতে খসে পড়া ফসলের
মতো সারা ময়দান ভরে উঠেছে তাতার সৈন্যের ঘৃতদেহে।

এই দেখে চেরানিগড়বাসী সকলে সমস্তমে অভিবাদন করে ন্ম আর রুটি,
সোনা রংপো আর জড়োয়া কাপড় দিয়ে স্বাগত জানাল ইলিয়াকে।

‘তরুণ বৌর রংশ বগাতীর, কী তোমার কুল-বংশ, কে তোমার বাপ, কে
তোমার মা ? তোমার নাম কী ? তৃঘি এসো আমাদের সর্দাৰ হও ! আমরা সকলে
তোমার কথা মানব, সম্মান কৰিব তোমার, চৰ্য-চোষ্য খাওয়াব ! ধনে যশে
উথলে উঠবে !’

ইলিয়া মূরমেৎস মাথা নাড়ল।

‘চেরানিগড়ের ভালোমানুষেরা শোনো, আমি সাধারণ রংশী বগাতীর,
মূরম সহরের কাছে কারাচারোভো প্রায়, সেই গ্রামের চাষীর ছেলে। লাভের
আশায় আমি তোমাদের উদ্ধার কৰিনি; সোনা রংপোর আমি পরোয়া কৰি
না। রংশ জাতির সুন্দরী কুমারী, অসহায় শিশু আর বৃক্ষ মায়েদের আমি
উদ্ধার করেছি। আমি তোমাদের নেতা হতে চাইনে। আমার ধন আমার শক্তি
আর আমার ব্রত রাণিয়ার সেবা, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা তাকে করা !’

চেরানিগড়বাসীরা তখন সকলে ইলিয়াকে অন্তত একটা দিন থেকে যেতে
বলল। তাদের সঙ্গে ভোজ খেয়ে আনন্দ করে যাবার জন্যে অনুরোধ কৰলু
কিন্তু ইলিয়া তাতেও রাজি হল না।

‘আমার সময় নেই, ভালোমানুষেরা। রংশদেশ শত্রুর পীড়নে কানেছে,
আমায় তাড়াতাড়ি গিয়ে যোগ দিতে হবে রাজা ভ্যাদিমিরের পক্ষে, কাজে
লাগতে হবে। পথে যাবার জন্যে আমায় বরণ কিছু রুটি দাও, তুঁকা নিবারণের
জন্যে দাও ঝরণার জল, আর কিরণে যাবার সোজা পথটা দেখিয়ে দাও !’

চেরানিগড়বাসী সকলেই ভাবনায় পড়ল, দৃঃখ হুঁক।

‘রংশ বগাতারী ইলিয়া মুরমেৎস, কী বলব বলো। কিরেভ ঘাবার সোজা
পথ ঢেকে ঘোষ ঘাসে। সে পথ দিয়ে শিশবছর কেউ ঘায়নি...’

‘তাৰ মানে?’

‘যুথমানের ছেলে, শিসে-ডাকাত সলভেই-এর হাতে সেই পথ। স্মৰণোদিনা
নৃমুকিৰ ধারে তিনটে ওক গাছের নয়টা ডালের ওপৰ মেঝে থাকে। সে যখন
পাখিৰ গলায় শিস দেৱ, জন্মুৰ গলায় গজের্স ওঠে তখন সমস্ত গাছ মাটিতে নুঁড়ে
পড়ে, ফুলেৰ পাপড়ি খসে ঘায়, ঘাস ঘায় শুকিয়ে, আৱ প্ৰাণ হারিয়ে মানুষ
ঘোড়া সব লুটিয়ে পড়ে। তুমি বৱং ঘৰ পথে ঘাও ইলিয়া। সোজা পথে
কিরেভ অৰিশ্য তিনশ’ ভাস্ট, ঘৰ পথে পৰো হাজার ভাস্ট।’

ইলিয়া মুরমেৎস কিছুক্ষণ চুপ কৰে থেকে মাথা নেড়ে বলল:

‘শিসে-ডাকাত কিরেভেৰ পথ আটকে রাখবে, জন মানুষকে উৎপাত কৰবে
আৱ আমি রংশ বীৰ ঘৰ পথে কিরেভ ঘাব, এ আমায় শোভা পায় না, এ
আমাৰ সম্মানে লাগে। আমি ঘাব সোজা রাস্তায়, অগম পথে।’

এই বলে ইলিয়া এক লাফে জিনে চড়ে বসল, ঝাঁকড়া-লোমোকে চাবুক
লাগল, চেৱনিগভবাসীৱা দেখতে না দেখতেই নিম্নেৰ মধ্যে উধাও হয়ে
গেল সে।



ইলিয়া মুরমেৎস আৱ শিসে-ডাকাত সলভেই

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল ইলিয়া মুরমেৎস। তাৰ ঘোড়া ঝাঁকড়া-লোমো
শিখৰ থেকে শিখৰে লাফায়। নদী, হৃদ পৌরৱে ঘায়, টিলা পাহাড় ডৰ্ভিঙ্গে
ধায়।

শেষকালে ইলিয়া এসে পৌঁছল বিস্ক বনে। এবাৰ বিৰাড়য়ে পড়ল
ঘোড়া। আৱ এগুনো ঘায় না। চাৰিদিকে জলা জমি পাঁকে শৰা। পেট অবধি
ডুবে গেল ঘোড়া...

ইলিয়া লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়াটাকে টেনে তুলে ডাল হাত দিয়ে ওক গাছগুলো শিকড়শুল্ক উপড়ে উপড়ে ফেলে এক কাঁচের রাস্তা বানিয়ে ফেলল। জলার মধ্যে দিয়ে ত্রিশ ভাস্ট লম্বা পথ। আজ্ঞার ভালোমানুষেরা সে পথ ধরে যাতায়াত করে।

এই ভাবে ইলিয়া পেঁছল স্মোরোদিনা নদীতে।

চওড়া নদী খরস্তোতা, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছে।

বাঁকড়া-লোমো ডাক ছাড়ল। তারপর লাফিয়ে ঘন বনের মাথা ছাড়িয়ে পেরিয়ে গেল নদী।

ওপারে তিন ওক গাছের নয় ডালের উপর বসে শিসে-ডাকাত সলভেই। সে গাছের কাছে কোনো বাজ ওড়ে না, জানোয়ার আসে না, সাপ এগোয় না। সবাই শিসে-ডাকাত সলভেইকে ভয় পায়, কে আর সেধে মরণ চাইবে...

ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ কানে ঘেতেই ওক গাছের মাথায় উঠে ভীষণ গলায় হাঁক দিল সলভেই:

‘কোন শয়তান ঘোড়া হাঁকায়, আমার খাস গাছের পাশ দিয়ে যায়, শিসে-ডাকাত সলভেই-এর ঘূর্ম ভাঙ্গায় !’

তারপর যেই সলভেই পাথির গলায় শিস দিল, জন্মুর গলায় গর্জাল, সাপের মতো হিস্ট্রিসিয়ে উঠল, অমনি সারা পৃথিবী কেঁপে উঠল, ওক গাছ টপ্পেতে লাগল, ফুলের পাপড়ি ঝরে গেল, নেতীয়ে পড়ল ঘাসগুলো। বাঁকড়া-লোমো হুর্মাড়ি থেয়ে পড়ল হাঁটুর ওপর।

ইলিয়া কিন্তু অটল হয়ে বসে রইল। মাথার চুলের গোছাও নড়ল না। রেশমী চাবুকটা নিয়ে সে শুধু সজোরে বাঁড়ি ঘারল ঘোড়াটাকে।

‘খড়ের বস্তা তুই ! রূশ বগাতীরের ঘোড়া নস। কোন দিন বুর্জু চুন পাথির শিস শুনিসনি ? হেলে সাপের হিস্ট্রিসানি কানে ধায়নি ! এক্ষণ্ণে উঠে দাঁড়া, নিয়ে চল আমায় সলভেই-এর বাসায়, নইলে আমি তোকে নেকড়ের মুখে ফেলে দেব !’

এই শুনে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে একছুটে একবারে সলভেই-এর বাসায়।

এত অবাক হয়ে গেল সলভেই, মাথা বার করলে বাসা থেকে।

এক মুহূর্ত দোর না করে ইলিয়া তার ধন্দক টেনে লোহার তীর ছুড়ল।
তীরটা ছেটই বলতে হয়, ওজনে পুরো এক পদ্ম।

উচ্চার দিয়ে তীর ছুটল, সলভেই-এর ডান চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে
কান দিয়ে বেরিয়ে এল। সলভেই তার বাসা থেকে গাড়িয়ে পড়ল যেন এক
আঁটি খড়। ইলিয়া তখন ওকে ধরে, চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল
বাঁ রেকাবের সঙ্গে।

সলভেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ইলিয়ার দিকে, মৃথ দিয়ে কথা বেরয়
না।

‘হতভাগা ডাকাত, কী দেখছিস হাঁ করে? রুশ বগাতীরকে দীর্ঘসমন
কখনো?’

সলভেই কাকিয়ে উঠল, ‘হায় রে কপাল! শক্ত লোকের পাণ্ডায় পড়েছি।
আমার স্বাধীনতা বুঝি এবার গেল।’

ইলিয়া সোজা রান্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পেঁচল সলভেই-এর বাড়ীতে।
সে বাড়ীর উঠোনটাই সাত ভাস্ট লম্বা, তাতে সাতটা খুঁটি। চারিপাশে লোহার
বেড়া, প্রত্যেকটি লোহার খুঁটিতে লোহার চূড়া, প্রত্যেকটি চূড়ায় একটি
করে বগাতীরের কাটা মাথা। উঠোনের মাঝখানে একটা জমকালো শ্বেত পাথরের
প্রাসাদ, তার সোনার অলিঙ্গ আগুনের মতো জ্বলছে।

সলভেই-এর মেয়ে বগাতীরের ঘোড়া দেখতে পেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে
উঠল:

‘দেখ দেখ, আমাদের বাবা সলভেই রাখমানভিত্তি বাড়ী ফিরছে একজো
গেঁয়ো চাষীকে রেকাবে বেঁধে।’

সলভেই-এর বৌ জানলা দিয়ে মৃথ বের করে দেখে দৃঃহাত ছাঁড়ে বলল:
‘কী বলছিস বোকা কোথাকার! এ যে একটা গেঁয়ো চাষীই আসছে, তোরই
বাবাকে রেকাবে বেঁধে নিয়ে।’

এই শব্দে সলভেই-এর বড় মেয়ে পেলকা দৌড়ে উঠেনে গিয়ে একটা
নবুই পদ্ম ওজনের লোহার ডাঙড়া তুলে নিয়ে ছাঁড়ে মারল ইলিয়ার দিকে।

কিন্তু বৃক্ষ করেইলিয়া ডাঙডাটা লুফে নিয়ে ফের সেটাই ঘৰ্ণিরয়ে ছবড়ে মারল।
ডাঙডাটা গিলৈ সজোরে পেল্কার গায়ে লাগল। তক্ষণ পড়ে মরে গেল
পেল্কা।

সলভেই-এর বৌ ইলিয়ার পারে কেঁদে পড়ল।

‘আমাদের সোনা বুপো র্মগমুক্তা যা তোমার ঘোড়া বইতে পারে সব
নাও বগাতীর, কেবল আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও।’

ইলিয়া উত্তর দিল:

‘অসতের দান আমার চাই না। এ সব শিশুর কানায়, রূশীর রক্তে ভেজা,
চাষীর অন্ন কেড়ে সম্পদ। ধৰা পড়লে ডাকাত তখন বন্ধ। ছেড়ে দিলেই
দুঃখের আর শেষ হবে না। আমি সলভেইকে নিয়ে কিয়েভ যাচ্ছি। সেখানেই
রুটি পাব ক্রতাস খাব।’

ইলিয়া ঘোড়া ঘৰ্ণিরে ছোটাল কিয়েভের পথে, চুপ করে রইল সলভেই,
৫° শব্দটি পর্যন্ত করল না।

কিয়েভ সহরে গিয়ে ইলিয়া এসে থামল একেবারে রাজবাড়ীতে,
ভ্যাদিমিরের প্রাসাদে। ঘোড়াটাকে একটা খণ্টির সঙ্গে বেঁধে, ডাকাতটাকে
রেকাবের সঙ্গেই ঝুলিয়ে রেখে নিজে চুকল বৈঠকখানায়।

রাজা ভ্যাদিমির বসে আছেন টেবিলে। খানাপিনা চলেছে। রূশ বগাতীরের
দল বসে আছে টেবিল ঘিরে। ইলিয়া ঢুকে কুর্নিশ করে চোকাঠের কাছে
দাঁড়িয়ে রইল।

‘জয় হোক, মহারাজ ভ্যাদিমির, রাণী আপ্রাক্সিয়া! পথিক বীরকে বগে
করবেন কি?’

রঙ্গ-রবি ভ্যাদিমির জিজ্ঞেস করলেন:

‘কোথা থেকে আসছো বীর, কী তোমার নাম? কী তোমার রূশ-কুল?’

‘আমার নাম ইলিয়া। আসছি মূরম সহরের কাছ থেকে, কারাচারোভো
গ্রামের চাষীর ছেলে। এসেছি আমি চেরনিগভ থেকে সোজা রাস্তা ধরে।
আপনার কাছে ধরে এনেছি শিসে-ডাকাত সলভেইকে। আপনার প্রাসাদের

উঠোনেই সে ঝুঁজছে, আমার ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। একবার কি বাইরে এসে দেখবেন?’

এই কথা শুনে রাজা, রাণী, বগাতীরের দল সকলে টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ইলিয়ার পিছন পিছন ছুটে এসে দাঁড়াল উঠোনে ঝাঁকড়া-লোমো ঘোড়ার মাছে।

দেখে কী, এক অঁটি খড়ের মত রেকাব থেকে ঝুঁজছে ডাকাতটা। আর বাঁচোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিয়েভ সহর, তাকিয়ে দেখছে রাজার দিকে।

রাজা ভ্যাদিমির বললেন:

‘কী রে ডাকাত, একবার পাঁখির গলায় শিস দে তো, জন্মুর গলায় গর্জন কর!’

শিসে-ডাকাত সলভেই কিন্তু মৃদু ফিরিয়ে রইল, কথা শুনল না।

‘তুমি আমায় বন্দী করোনি, হুকুম করা তোমার সাজে না।’

এই শুনে রাজা ভ্যাদিমির ইলিয়ার দিকে ফিরে বললেন:

‘হুকুম করো ডাকাতকে, ইলিয়া ইভার্নার্ভচ।’

‘বেশ মহারাজ, কিন্তু রাগ করবেন না। আমি আপনাকে আর রাণীকে দেকে রাখব আমার চাষীর কাফতান দিয়ে, কোনো ক্ষতি যেন না হয়। আর সলভেই রাখ্যার্নার্ভচ, তোকে যা বলা হয়েছে, কর।’

ডাকাত বলল, ‘শিস আর্মি দিতে পারছি না। গলা শুর্কিয়ে গেছে।’

‘আগে দেড় বালতি মিষ্টি মদ দাও শিসে-ডাকাতটাকে আর দেড় বালতি তেতো বিষের, আর দেড় বালতি মধু, সঙ্গে খাওয়ার জন্যে কিছুটা গমের শাদী রুটিও দিও। তাহলে শিস দেবে, আমাদের সখ মেটাবে ...’

সলভেইকে পানাহার করিয়ে শিস-দেওয়ার জন্যে তৈরি করা হলো

ইলিয়া বলল, ‘কিন্তু ডাকাত, মনে রাখিস পুরো গলায় শিস দিস না, আধো গলায় শিস দিব, আধো গলায় গর্জাব। নয়ত মজা তৈরি পাব।’

সলভেই কিন্তু ইলিয়ার হুকুম মানল না। ওর মনে মন্তব্য ইচ্ছে সারা কিয়েভ সহর ধৰ্মস করবে, রাজা রাণী, রূশ বগাতীর সকলকে মেরে ফেলবে। যত

জোর পারে শিল্পদিয়ে ভীষণ গর্জনে গর্জিষ্যে প্রাপ্তপথে হিস্থিসিয়ে উঠল
সলভেই।

অমরি সে কৌ কাণ্ড !

বুড়ির ছাদ টলে পড়ল, গাড়ি-বারান্দা খসে এল দেয়াল থেকে, জানলার
কচ ফেটে গেল, আস্তাবল ছেড়ে ছুটে পালাল ঘোড়াগুলো, বগাতীরের দল
হৃড়মুড়িয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিতে লাগল। স্বয়ং রাজা ভ্রাদীমির প্রায় আধময়া
হয়ে টলতে লাগলেন, ইলিয়ার কাফতানের আড়ালে লুকলেন।

ইলিয়া রেগে লাল। বলল:

‘আমি তোকে বলেছিলাম রাজা রাণীকে একটু আনন্দ দিতে, আর তুই
ঘটালি সর্বনাশ। এবার দফা সারাছি। মা বাবার চোখে জল ঝরানো, যুবতীদের
বিধবা করা, ছোট ছেলেমেয়েদের অনাথ করা এবার তোর বক্ষ হবে, লুঁঠতরাজ
তোর এবার শেষ।’

এই বলে ইলিয়া একটা ধারালো তলোয়ার দিয়ে সলভেই-এর মাথা কেটে
ফেলল। শিসে-ডাকাতের জীবন গেল।

রাজা ভ্রাদীমির বললেন, ‘অশেষ ধন্যবাদ তোমায়, ইলিয়া মূরমেৎস,
এসো আমার অনুচরদলে, তুমি হবে আমার প্রধান বগাতীর, সব বগাতীরের
ওপর তুমি কর্তা। কিয়েভ সহরেই থাকো তুমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।’



দৰীন্যা নিকিতিচ আৱ জ্বেই গৱীনীচ

কিয়েভের কাছেই এক বিধ্বা থাকত, তার নাম মামেল্ফুতি
তিমোফেয়েভনা। তার এক ছেলে, বগাতীর দৰীন্যা। দৰীন্যার মা তাকে খুব
ভালবাসত। সারা কিয়েভ সহরশুল্ক লোক দৰীন্যার প্রশংসায় পণ্ডমৃথ। দেখতে
সে যেমন লম্বা তেমনি সুঠাম, যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমনি লড়াইয়ে নির্ভীক,
উৎসবে ব্যসনেও হাসিস্থৰ্দশ। গান বাঁধত, বাজনা বাজাত, রসিক মন্তব্য করত।
স্বভাব ছিল শান্তিশঙ্গ মিঞ্চি, কখনো কাউকে রূচ কথা বলত না, কাউকে
অপমান করত না। সেইজন্যে সবাই ওকে ডাকত সুশুস্তি দৰীন্যা বলে।

সেদিন ভূঁড়ণ গরম। গ্রীষ্মকাল। দৱীন্যার ভীষণ ইচ্ছে হল নদীতে গিয়ে নাইবে। মায়ের কাছে গিয়ে বলল:

‘মা গো, আমায় আজ পৃচাই নদীর ঠাণ্ডা জলে নাইতে যেতে দাও না। গ্রীষ্মের গরমে পৃচ্ছে ঘাচ্ছি।’

মামেল্ফা তিমোফেয়েভ্না ভারি দৃশ্যস্থায় পড়ল। দৱীন্যাকে বোঝাবার চেষ্টা করল:

‘দৱীন্যা শোনো, পৃচাই নদীতে যেও না বাবা। সে নদী ভয়ঙ্করী, চণ্ডমুর্তি। নদীর প্রথম দরিয়ায় আগুন, মাঝ দরিয়ায় আগুনের ফুর্তি আর শেষ দরিয়ায় কেবল ধৈঁয়া।’

‘বেশ, তবে অন্ততঃ পাড়ে যাই, হাওয়া থাব।’

মামেল্ফা তিমোফেয়েভ্না মত দিল।

বেড়ানোর পোষাকটা পরে, উঁচু গ্রীক টুর্প মাথায় এঁটে, তীর, ধনুক, ধারালো তলোয়ার, চাবুকগাছা নিয়ে দৱীন্যা তৈরী।

তারপর তাজা ঘোড়ার চড়ে, বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে নিয়ে রওনা দিল। একঘণ্টা যায়, দু'ঘণ্টা যায়, দৱীন্যা চলেছে তো চলেছে। মাথার উপর গ্রীষ্মের স্বর্ণ জবলছে। দৱীন্যা মায়ের নিষেধ ভুলে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘোরালে পৃচাই নদীর দিকে।

নদী থেকে ঠাণ্ডা আমেজ আসছিল।

দৱীন্যা ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা বাচ্চা চাকরের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললে:

‘তুই এখানে থাক, ঘোড়াটার উপর নজর রাখিস।’

এই বলে তার জামাকাপড়, গ্রীক টুর্প খুলে, অস্তশস্ত সব মেজাজ পিঠে রেখে দৱীন্যা ঝাঁপ মারল নদীতে।

দৱীন্যা সাঁতার কাটে আর অবাক হয়:

“পৃচাই নদী সম্বন্ধে কী যে বলে মা! নদীটা ভয়ঙ্করী কোথায়, বরঞ্চ একেবারে বর্ষাৰ জলভৱা ডোবার মত শান্ত।”

কিন্তু দৰীন্যার কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ ইঠাং কালো করে এল। আকাশে মেঘ নেই, ব্ৰহ্ম নেই, কিন্তু বাজের ডাক; খড় নেই, কিন্তু আগুন বলসাৰু।

দৰীন্য মাথা তুলে দেখে, নাগ জ্বেই গৱীনীচ তাৰ দিকে উড়ে আসছে। এক ভয়াবহ নাগ। তিনটে মাথা, সাতটা লেজ, নাক দিয়ে আগুন বেৱয়, কান দিয়ে ধোঁয়া। থাবাগুলোৱ তামা নখ চক্চক কৱছে।

দৰীন্যাকে দেখে বজ্র গৰ্জনে হেঁকে উঠল নাগ:

‘প্ৰাচীন লোকেৱা ভাৰ্বিষ্যদ্বাণী কৱেছিল নিৰ্কিতাৰ ছেলে দৰীন্যার হাতেই নাৰ্কি আমাৰ ম্তুয়। কিন্তু দেখছি দৰীন্যাই আমাৰ খশ্পৰে পড়েছে। ইচ্ছে হলে এখন জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পাৰি, ইচ্ছে হলে আবাৰ বন্দী কৱে গৃহায় নিয়েও যেতে পাৰি। বন্দী রংশ আমাৰ কাছে কম নয়। বাৰ্কি কেবল দৰীন্যাই।’

এই শুনে দৰীন্যা নৱম গলায় বলে উঠল:

‘থাম, হতভাগা নাগ, আগে দৰীন্যাকে ধৰ, তাৱপৰ গৰ্ব কৱিস। দৰীন্যা এখনও তোৱ হাতে পড়েনি।’

ভালো সাঁতাৰ জানত দৰীন্যা। এক ডুবে সে নদীৰ তলায় গিয়ে ডুব সাঁতাৰ কাটতে লাগল। তাৱপৰ সাঁতৱে একটা খাড়া পাড়েৱ কাছে গিয়ে, পাড় বেয়ে উঠে চট্টপট্ট ঘোড়ায় চেপে বসবে, কিন্তু কোথায় ঘোড়া? তাৰ চিহ্নমত নেই। নামেৰ গৰ্জন শুনে তাৰ বাচ্চা চাকৰটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ঘোড়ায় উঠে একেবাৱে উধাও। অস্তশস্ত্বও সব তাৱই সঙ্গে।

নাগেৰ সঙ্গে লড়াই কৱাৰ ঘতো কোনো হাতিয়াৰ নেই।

নাগ এদিকে ফেৱ ঝাঁপয়ে পড়ে দৰীন্যার উপৰ। আগুনেৰ জৰলন্ত শুকাক ঝাৰিয়ে সে দৰীন্যার ধৰল দেহ পুড়িয়ে দেয়।

বগাতীৱেৰ প্ৰাণ কেপে উঠল।

তীৱেৰ সে তাৰিয়ে দেখল, হাতে নেবাৰ ঘতো কিছুই নৈই। একটা লাঠি নেই, একটা পাথৰ নেই, খাড়া পাড়েৱ চারিদিকে কেবল হলুদ বালি। তাৰ ওপৰ পড়ে আছে তাৰ গ্ৰীক টুপিটা।

দৰীন্যা টুঁপটাই তুলে নিল, তাতে বালি ভৱল কম নয়, বেশী নয় — পূরো
পাঁচ পুদ্ৰ অৱপৰ সেটা ঘৰুৱয়ে ছংড়ে মারল জ্যেষ্ঠ গৱীনীচৰে দিকে। জ্যেষ্ঠ
গৱীনীচৰে একটা মাথা গৰ্দভিয়ে গেল।

দৰীন্যা তখন হাঁচকা টানে মাটিতে আছড়ে ফেলল নাগকে, বুকেৰ ওপৰ
হাতু চেপে বসে অন্য দুটো মাথাও কেটে ফেলতে যাবে ...

এমন সময় নাগ কাকুতি-মিনাতি কৰে বলে উঠল:

‘দোহাই দৰীন্যা, দোহাই বগাতীৰ, আমায় মেৰে ফেলো না, এবাৱেৰ মতো
ছেড়ে দাও। তুম যা বলবে তাই কৰব। তোমার কাছে এই শপথ কৰাছি, তোমাদেৱ
সূৰ্যীপুল রাশিয়ায় কোনোদিন আৱ আসব না, কোনোদিন আৱ রংশীদেৱ বন্দী
কৰে নিয়ে যাব না। দোহাই দৰীন্যা, প্রাণে আমায় মেৰো না, আমাৰ ছেলেপলেৱ
অনিষ্ট কৰো না।’

নাগেৱ চালাকিতে ভুলে গেল দৰীন্যা, তাৱ কথায় বিশ্বাস কৰে পাষণ্ডটাকে
ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে নাগটা মেঘেৱ রাজে উঠতে না উঠতেই সোজা চলল কিৱেড
সহৱেৱ দিকে, উড়ে এল রাজা ভ্যাদিমিৱেৱ বাগানে। সেই সময় রাজা
ভ্যাদিমিৱেৱ ভাইৰি জাবাভা প্ৰতিয়াতিশ্না বেড়াছিল বাগানে।

রাজকুমাৰীকে দেখতে পেয়ে তো নাগেৱ মহা আনন্দ। মেঘেৱ রাজ্য থেকে
নেমে এসে তাৱ তামাৱ নথগুলো দিয়ে ছোঁ মেৰে রাজকুমাৰীকে নিয়ে চলে গেল
একেবাৱে সৱোচিনস্ক পাহাড়ে।

এদিকে দৰীন্যা তাৱ চাকৱকে খঁজে পেয়ে বেড়াবাৱ পোষাকটা পৱছে, এমন
সময় আকাশ কালি কৰে এল, বাজ পড়তে লাগল। দৰীন্যা মাথা তুলে দেখে,
জ্যেষ্ঠ গৱীনীচ তাৱ থাবাৱ মধ্যে জাবাভা প্ৰতিয়াতিশ্নাকে ধৰে কিৱেডেৱ
দিক থেকে উড়ে আসছে।

ভাৱি মন খারাপ হয়ে গেল দৰীন্যার, ভাৱি দৃশ্যমান পড়লা বাড়ী ফিৱে
সে মন খারাপ কৰে চুপ কৰে বসে রইল একটা বেঞ্চতে। একটা কথাও কইল
না। মা জিঞ্জেস কৱল:

‘কী হয়েছে দৰীন্যা? মন খারাপ কেন? কীসেৱ দৃঃখ্য সোনা?’

‘দৃঢ়খের কিছু নেই, শোকের কিছু নেই, শূধু বাড়ীতে বসে থাকতে মন টিকছে না। কিরেভে রাজা ভ্যাদিমিরের বাড়ীতে আজ এক মন্ত ভোজ আছে, সেখানে শাখা’

‘বা না বাছা, রাজবাড়ীতে যেও না। আমার ঘন বলছে অঙ্গল হবে। আমাদের বাড়ীতেই বরং ভোজ লাগানো যাক।’

দ্বরীন্য মায়ের কথা শুনল না। সে চলল কিরেভে, রাজা ভ্যাদিমিরের কাছে।

কিরেভে পেঁচেছেই দ্বরীন্য এসে দাঁড়াল রাজার ধরে। খাবারের ভারে টেবিল ভাণ্ডে ভাণ্ডে, পিপে ভর্তি মিষ্টি মধু, কিস্তু অতিথিরা কেউ কিছু মুখে দিচ্ছে না, মাথা নীচু করে বসে আছে। আর ঘরের মধ্যে পারচারি করে বেড়াচ্ছেন রাজা, কাউকে খেতে ডাকছেন না। রাণী মুখ দেকে বসে আছেন। অভ্যাগতদের দিকে চাইছেন না।

রাজা ভ্যাদিমির হঠাত বললেন:

‘আদরের অর্তিথদল, এই ভোজে আজ আনন্দ নেই। রাণীর মনে ভারি শোক, আমার মনেও দৃঢ়খ। মুখপোড়া জ্যেষ্ঠ গরীনীচ আমাদের আদরের ভাইয়ি, তরণী জাবাভা পুত্রাতিশ্নাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে সরোচিন্স্ক পাহাড়ে গিয়ে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আনতে পারো?’

কিস্তু কোথায় কী? অতিথিরা এ ওর পেছনে লুকোয়, লম্বারা মাঝারিদের পিছনে, মাঝারিরা বেঁটেদের পিছনে আর বেঁটেরা মুখ বক্ষ করে চুপচাপ বসে রইল।

হঠাত তরণ বগাতীর আলিওশা পপোভচ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে:

‘শুনুন রাজা রাজ-রাবি! কাল আমি খোলা মাঠে বেড়াচ্ছিলুম, দ্বরীন্যাকে দেখেছিলুম পুচাই নদীর ধারে। জ্যেষ্ঠ গরীনীচের সঙ্গে কী তার ভাব! জ্যেষ্ঠ গরীনীচকে ছোট ভাই বলে সে ডাকছিল। দ্বরীন্যাকেই পাঠান নাগের

গুহায়, সে বিনা ক্ষেত্রেই আপনার আদরের ভাইবিকে চেয়ে নেবে তার পাতানো
ভাইয়ের কাছ থেকে।'

রাজা ভূদিমির রেগে উঠলেন:

'এই যখন ব্যাপার তখন দৱীন্যা, ঘোড়া ছুটিয়ে যাও সরোচিন্ম্বক পাহাড়ে।
মেঘনে গিয়ে আমার আদরের ভাইবিকে এনে দাও, নরত তোমার গর্দান
যাবে।'

দৱীন্যা তার উচু মাথা নীচু করে একটিও কথা না বলে টেবিল ছেড়ে উঠে
এল, ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল বাড়ী।

তার মা দৱীন্যাকে বরণ করতে এসে দেখে সে দৱীন্যা আর নেই।

'কী হয়েছে দৱীন্যা, কী ঘটেছে, বাছা আমার? কী হয়েছে নেমন্তম
বাড়ীতে? অপমান করেছে কেউ? মদের পেয়ালা দিতে ভুলে গেছে, ভালো
আসনে বসায়ন?'

'না মা, অপমান করেনি, পেয়ালাও বাদ পড়েনি, আসনও ছিল মানমতো,
মর্যাদামতো।'

'তবে অমন করে মুখ নীচু করেছো কেন?'

'রাজা ভূদিমির এক কঠিন কাজের ভার দিয়েছেন। জাবাভা
প্রতিযাতিশ্নাকে জ্বেল গৱীনীচ ধরে নিয়ে গিয়ে সরোচিন্ম্বক পাহাড়ে রেখে
দিয়েছে। গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে আমার।'

মামেল্ফা তিমোফেয়েভ্নার ভীষণ ভয় হল। কিন্তু দৃঃখ করল না সে,
চোখের জল ফেলল না। বরং কাজের কথা ভাবতে লাগল।

'এবার শুতে যাও বাছা। ঘুময়ে জিরিয়ে গায়ে বল এনো। রাত পোয়ালে
ব্রহ্ম খোলে, কাল সকালে পরামর্শ' করা যাবে।'

শুল দৱীন্যা, ঘুময়। নাক ডাকায় যেন জলপ্রপাতের গর্জন।

কিন্তু মামেল্ফা তিমোফেয়েভনা শুল না, বেঁওতে বসে এসে সারারাত
ধরে সে সাতরঙা রেশম দিয়ে সাতগুছি চাবুক বানিয়ে চলল।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছেলেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল:

‘ওঠো ছেলে, উঠে পড়ো। সাজ করো, সজ্জা করো, চলে যাও পুরনো
আন্তাবলে। দেখবে তিনি নম্বর খোঁয়াড়ের দরজাটা খোলে না। অর্ধেকটা চাপা
পড়ে গেছে অয়লার তলায়। কাঁধ লাগিয়ো দৱীন্যা, দরজা খুলো। দেখবে
খোঁয়াড়ের মধ্যে তোমার দাদুর ঘোড়া বুর্কা। পনেরো বছর ধরে ঘোড়াটা ওই
যোঁয়াড়ে এক হাঁটু ময়লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটাকে ভাল করে দলাই-
সেলাই করে, দানাপানি দিয়ে নিয়ে এসো গাড়ি-বারান্দার কাছে।’

দৱীন্যা আন্তাবলে গিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে বুর্কাকে নিয়ে এল গাড়ি-
বারান্দার কাছে। তারপর লাগাম পরাতে লাগল। প্রথমে ঘোড়ার পিঠে জিনের
কাপড় পাতল, তার উপর দিল একটা পশমী আন্তর, তার ওপর চাপাল দামী
রেশমের নস্তা-তোলা সোনা-বসানো চেরকেসীয় জিন, বাবো গুচ্ছ রেশম দিয়ে
বাঁধল, সোনার লাগাম পরিয়ে দিল। মামেল্ফা তিমোফেয়েভ্না বেরিয়ে এসে
হাতে দিল সেই সাতগুছি চাবুকটা, বলল:

‘তুমি যখন সরোচিন্স্ক পাহাড়ে পেঁচবে, জ্মেই গরীনীচ তখন বাড়ী
থাকবে না। ঘোড়া ছুটিয়ে ঢুকে যেয়ো নাগের গৃহায়, নাগশিশুদের খুরের চাপে
দলে দিয়ো। ওরা তখন বুর্কার পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাবে, তুমি এই চাবুক তুলে
বুর্কার দু'কানের মাঝখানে ঘা মারবে। লাফাতে থাকবে বুর্কা, পা ঝেড়ে
সবকটাকে মাটিতে ফেলে পিষে মেরে ফেলবে।’

গাছ ভেঙে পড়ল ডালটি, ডাল খসে ফলাটি। মায়ের বুক থেকে খসে রস্তবরা
রংগে চলল ছেলে।

দিন যায় যেন বৃষ্টির ধারা, সপ্তাহ যায় যেন নদীর স্নোত। চলেছে দৱীন্যা —
আকাশে রাঙা রবি, চলেছে দৱীন্যা — আকাশে ফুটফুটে চাঁদ, চলতে চলতে এসে
পেঁচল সরোচিন্স্ক পাহাড়ে।

সে পাহাড়ে নাগের গৃহায় ছানাপোনায় কিলৰিল। বুর্কার পায়ে পায়ে
জড়িয়ে যায় তারা, খুরের গোড়ায় দাঁত বসায়। দৌড়াতে পারে না বুর্কা, হাঁটু
ভেঙে বসে পড়ে। দৱীন্যার তখন মায়ের কথা মনে পড়ল সাতগুছি রেশমী
চাবুক দিয়ে বুর্কার দু'কানের মাঝখানে ঘা মারতে লাগল। বলে:

‘লাফিয়ে ওঠো বুর্কা, ঝাঁপিয়ে ওঠো, নাগশিশুদের বেড়ে ফেলো পা
থেকে !’

চাকুক থেয়ে বুর্কার শঙ্কি বাড়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে সে, ক্ষেশ পেরিয়ে
পাথুরন্তুড়ি ছিটকে যায়, পা থেকে বেড়ে বেড়ে ফেলে নাগশিশুদের। থুর
দিয়ে চাঁট মারে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, দলে পিষে দিল সবকটিকে।

দ্বর্ণীন্য তখন বুর্কার পিঠ থেকে নামল। ডান হাতে তার ধারালো তলোয়ার,
বাঁ হাতে বগাতীরের মুগ্ধুর। দ্বর্ণীন্য চলল নাগের বাসার দিকে এগিয়ে।

এক পা সবে এগিয়েছে হঠাত আকাশ কালি করে এল, বাজ ডাকতে লাগল।
উড়ে আসে জ্বেই গরীনীচ, তামার থাবায় মরা মানুষ, মৃত্যু দিয়ে আগমন বেরয়,
কান দিয়ে ধৈঁয়া, তামার নখ ঝালসাচ্ছে আগমনের মতো ...

দ্বর্ণীন্যকে দেখে জ্বেই গরীনীচ মৃত দেহটা মাটিতে ফেলে বাজখাই গলায়
হেঁকে বলল:

‘কেন প্রতিজ্ঞা ভাঙলি দ্বর্ণীন্য, কেন মেরেছিস আমার বাচ্চাদের?’

‘বটে রে পাষণ্ড নাগ, কথা রাখিনি, শপথ ভেঙেছি, সে কি আৰি ? কেন
তুই কিয়েভে গিরেছিলি ? কেন জাবাভা প্রতিয়াতিশ্নাকে নিয়ে এসেছিস ?
বিনা ঘুকে রাজকুমারীকে ফিরিয়ে দে। তবেই তোকে মাপ কৱব !’

‘দেব না জাবাভা প্রতিয়াতিশ্নাকে। তাকে খাব, তোকেও খাব, বন্দী করে
আনব সমস্ত রুশকে !’

রাগে জবলে উঠল দ্বর্ণীন্য, শুরু হয়ে গেল নির্মম জড়াই।

শিলাপাথর ছিটকে যায়, শিকড়শুক্র উলটে পড়ে ওক গাছ, এক হাত করে
ঘাস ডেবে যায় মাটির মধ্যে ...

তিনদিন তিনরাতির লড়াই চলল। দ্বর্ণীন্য হারে হারে, নাগ তাকে ছেড়ে
দেয়, আছড়ে ফেলে ... হঠাত দ্বর্ণীন্যের মনে পড়ল চাবুকটার কথা। চাবুকটা
নিয়েই সে নাগের দু'কানের মাঝখানে লাগাল ঘা। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জ্বেই
গরীনীচ আর দ্বর্ণীন্য তাকে বাঁ হাতে মাটিতে চেপে ধরে, ডান হাতে চাবুক
মারে। রেশমী চাবুক দিয়ে ঘেরে ঘোড়া ঠাণ্ডা করার মতো ঠাণ্ডা করল তাকে,
সবকটা মাথা কেটে ফেলল।

গলগল করে নাগের কালো রক্ত বেরিয়ে এসে পুরু পশ্চিম গাঢ়িয়ে গেল,
কোমর অবধি ডুবে গেল দৰীন্যা।

তিনিদিন তিনরাত কালো রক্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল দৰীন্যা। পাদটো তার
অম্বত হয়ে গেল, বুকে জমল ঠাণ্ডা। নাগের রক্ত শূষ্ক নিতে চায় না বাশিয়ার
মাটি।

দৰীন্যা দেখল তার কাল ঘৰিয়ে আসছে। তথম সে তার সাতগুছি বেশমী
চাবুক বার করে মারতে লাগল মাটির ওপর।

‘মা ধৰণী, দ্বিধা হও, নাগের রক্ত শূষ্ক নাও।’

কঁচা মাটি দ্বিধা হল, নাগের রক্ত শূষ্ক নিল।

দৰীন্যা একটু জিরিয়ে নিয়ে, হাতমুখ ধূয়ে, বগাতীরের বর্মাঁট ঘষে মেজে
এগোলে নাগের গৃহার দিকে। সারা গৃহায় তাগার দরজা জোড়া, লোহার খিলে
আঁটা, সোনার তালায় বক্ষ।

দৰীন্যা তালা খুলে, খিল দরজা ভেঙে দুকল প্রথম গৃহার ভিতরে। চালিশ
দেশ, চালিশ রাজ্যের জার আর জারপুত্র, রাজা আর রাজপুত্র সেখানে। আর
কত যে সাধারণ যোদ্ধা তার সংখ্যা করা যায় না।

দৰীন্যা বলল:

‘বিদেশের জার, বিভুঁইয়ের রাজা, আর তোমরা, সাধারণ যোদ্ধারা সব শোনো,
খোলা আলোয় বেরিয়ে এসো, ফিরে যাও যে ধার দেশে। আর রুশ বগাতীরকে
ভুলো না। সে না থাকলে তোমরা চিরকাল এই নাগের কাছে বন্দী হয়ে
থাকতে।’

মৃক্তি পেয়ে দৰীন্যায় বেরিয়ে এল সবাই, দৰীন্যাকে অভিবাদন করে
বলল:

‘রুশদেশের বগাতীর, চিরকাল তোমার কথা মনে রাখব!

দৰীন্যা এগিয়ে চলে। একটার পর একটা গৃহ খোলে আর বন্দীদের মৃক্ত
করে দেয়। বৃক্ষ বৃক্ষ, যুবক যুবতী, শিশু, বালক, রুশদেশী পরদেশী — সবাই
বেরিয়ে আসে, কিন্তু জাবাভা প্রতিয়াতিশ্নার আর খৈঁজ নেই।

দৰীন্যা এগারোটা গুহা পেরিয়ে গেল। একেবাবে শেষের গুহায় এসে দেখে — জাবাভা পুত্রিয়াতিশ্না: হাতদুটো তার সোনার শিকলে বাঁধা, স্বাংসেতে দেওয়াল থেকে সে ঝুলছে। দৰীন্যা শিকল ভেঙে ফেলে তাকে দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিল। তারপর কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল খোলা আলোয়।

জাবাভা পুত্রিয়াতিশ্না দাঁড়াতে যায়, পা কাঁপে, সূর্যের আলোয় চোখ বোজে। দৰীন্যাকে চেয়ে দেখে না। দৰীন্যা তখন তাকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর তাকে নিজের জোব্বা দিয়ে ঢেকে নিজেও শুয়ে পড়ল।

আকাশের সূর্য পাটে বসল। দৰীন্যা জেগে উঠে, বুর্কাৰ পিঠে জিন চাপিয়ে, রাজকন্যার ঘূম ভাঙাল। তারপর রাজকন্যা জাবাভাকে সামনে বসিয়ে রওনা হল ঘোড়াৰ পিঠে। চারপাশে তার লোকেৱ মেলা। গুণে আৱ শেষ কৰা যায় না। আভূষি মাথা ন্ডইয়ে সবাই তারা দৰীন্যাকে ধন্যবাদ জানায়, যে যাব দেশের পথ ধৰে।

আৱ দৰীন্যা জাবাভা পুত্রিয়াতিশ্নাকে নিয়ে হলদে স্টেপেৰ ভিতৰ দিয়ে ঘোড়া ছোটাল কিয়েভ সহয়েৰ দিকে।



ଆଲିଓଶା ପପୋଭିତ

ଆକାଶେ ସେ ଦିନ ପ୍ରତିପଦେର ରୂପୋଳୀ ଚାନ୍ଦ, ଆର ମାଟିତେ ଗିର୍ଜାର ବୁଡ଼ୋ ପୁରୋହିତ ଲେଖନୀର ସରେ ଜଞ୍ଚ ନିଳ ଏକ ପରାହାନ୍ତ ବୀର ବଗାତୀର । ନାମ ଦେଉଥାଇଲା ଆଲିଓଶା ପପୋଭିତ । ସ୍ଵର୍ଗର ନାମଟି । ଖେଳେ ଦେଯେ ମାନ୍ଦ୍ର ହୟ ଆଲିଓଶା, ଅନେକ ସେଥାନେ ଏକ ସନ୍ତାହ, ଆଲିଓଶା ତା ବେଡ଼େ ଓଠେ ଏକ ଦିନେଇ, ଅନେକ ସେଥାନେ ବହର, ଆଲିଓଶାର ସେଥାନେ ଏକ ସନ୍ତାହ ।

ହାଟାହାଟି କରେ ଆଲିଓଶା, ପାଡ଼ାର ଛେଲେଦେର ସଙ୍ଗେ ଖେଳେ ବେଡ଼ାଯ । କିନ୍ତୁ ଆଲିଓଶା ଯେଇ କାହାଓ ହାତ ଧରେ, ହାତ ଧାର ଭେଣେ, ଯେଇ କାହାରେ ପା ଛୋର, ପା ଧାର ମଚକେ ।

আলিওশা যখন জোয়ান তখন বাবা-মারের কাছে গিয়ে সে আশীর্বাদ চাইল খেলোমাঠে বেরবে। বাবা বলল:

‘জোনো আলিওশা, খোলা মাঠে থাবে, তোমার চেয়ে তের বেশী গায়ে জোর রাখে এমন সব লোক সেখানে আছে। তাই পারানের ছেলে মারীশকোকে সঙ্গে নিয়ো।’

তেজী ঘোড়ায় চেপে বসল তরুণ দুই বীর। ধূলোর মেঘ আকাশে উড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল তারা।

তরুণ বীরেরা এসে পেঁচল কিয়েভ সহবে। আলিওশা পপোভিচ সেখান থেকে সোজা গেল রাজা ভ্যাদিমিরের শ্বেতপাথরের প্রাসাদে। শাস্ত্রমতে কুশ করল সে, বিধিমতে নমস্কার করল চার্দিকে, আর বিশেষ করে কুর্নিশ করল রাজা ভ্যাদিমিরকে।

রাজা ভ্যাদিমির তখন এগিয়ে এসে তরুণে বীরদের স্বাগত জানালেন, ওক কাঠের টেবিলে বসালেন, তরুণ বীরদের ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে খবরাখবর নিতে লাগলেন। তরুণ বীরেরা ভোজন করল স্বাদু ভোজা, পান করল মদির সুরা। রাজা ভ্যাদিমির জিজ্ঞেস তখন করলেন:

‘কারা তোমরা তরুণ বীর? দৃঃসাহসী বগাতীর, নাকি পথচলাতি পথিক, সুখের পায়রা?’

আলিওশা জ্বাব দিল:

‘গজীর বৃক্ষে প্ররোচিত লেওন্সির ছেলে আমি, আলিওশা পপোভিচ। আর সঙ্গী আমার পারানের ছেলে মারীশকো।’

থাওয়া দাওয়ার পর আলিওশা পপোভিচ ইঁটের চুল্লীর উপর শয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। মারীশকো বসে রইল টেবিলের সামনেই।

এই সময় রাজা ভ্যাদিমিরের কাছে এল এক নাগপুর বগাতীর তুগারিল। এল সে শ্বেতপাথরের কক্ষে রাজা ভ্যাদিমিরের কাছে। তার স্তোপাঠি পাঠ তখনো চোকাঠে আর ডান পা গিয়ে পড়ল ওক কাঠের টেবিলের কাছে। গপগপ করে সে গেলে, চোঁচো করে ঘদ টানে, রাজার মহিষীকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, স্বয়ং রাজা ভ্যাদিমিরকে ঠাণ্টা করে, গালি দেয়। এ গালে এক, ও গালে এক — আন্ত

রুটি তেসে, একটা আন্ত রাজহাঁস জিভ দিয়ে সাপটে, মন্ত এক পিটে মুখে পুরে
এক গরাসে গিলো নিল সবটা। ইটের চুল্লীর উপর থেকে শুয়ে শুয়ে আলিওশা
নাগপুত্র তুগারিনকে বলল এই কথা:

‘গুজীর পুরোহিত আমার বাবা লেওন্টির ছিল এক পেটুকচাঁদ, ছিল একটা
গুজী শুড়ীখানায় গিয়ে গিয়ে তলানিসমেত পিপে ভর্ত বিয়র গিলত। গেল
পেটুকচাঁদ দীর্ঘতে। দীর্ঘির সব জল খেয়ে নিল। পেট ফেটেও
মরল অম্বনি। তুমিও তুগারিন টেবিলেই ফেটে না মরো।’

এই কথা শুনে তুগারিন গেল চটে। তার দামাঙ্ক ইস্পাতের ছোরাটা ছুঁড়ে
মারল আলিওশা দিকে, কিন্তু আলিওশা ছিল খুব চটপটে, ওক কাঠের খণ্টির
পিছনে আড়াল নিল। আলিওশা তখন বলল এই কথা:

‘ধন্যবাদ বগাতীর, নাগপুত্র তুগারিন! দামাঙ্ক ইস্পাতের ছোরাটা দিলে
বটে। তোমার ধবল বুক আরি চিরে দেব, তোমার উজল নয়ন নির্ভিয়ে দেব।’

এই সময় পারানের ছেলে মারীশকো টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তুগারিনকে
জাপটে ধরে আছড়ে ফেলল শ্রেতপাথরের দেয়ালে, ঝমঝম করে জেঙে পড়ল
জনগার কাঁচ।

আলিওশাকে বলল মারীশকো:

‘দামাঙ্ক ইস্পাতের ছোরাটা আলিওশা আমাকেই দাও, নাগপুত্র তুগারিনের
ধবল বুক চিরে দিই, উজল নয়ন নির্ভিয়ে দিই।’

কিন্তু আলিওশা উত্তর দিল:

‘শ্রেতপাথরের পুরীটাকে নোংরা করো না মারীশকো, ওকে ছেড়ে দাও
খোলা মাঠে, সেখানে আর যাবে কোথায়? কাল খোলা মাঠে ওর সঙ্গে মোকাবিলা
হবে।’

পরদিন ভোর ভোর, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠল পারানের ছেলে মারীশকো,
তেজী ঘোড়াদুটোকে নিয়ে গেল খর মদ্দিতে জল খাওয়াতে। শিশু দেখে
তুগারিন আকাশের নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর আলিওশা পশ্চিভুকে খোলা
মাঠে মোকাবিলার জন্যে ডাকছে। পারানের ছেলে মারীশকো ফিরে এল
আলিওশার কাছে:

‘ভগবান তোমার বিচার করবেন আলিওশা, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা দিলে না, তাহলে ওর ধবল বৃক চিরে দিতাম, উজল নয়ন নিভিয়ে দিতাম। এখন অরি ওর কী করবে, আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে?’

আলিওশা তার তেজী ঘোড়া বের করে চেরকেসীয় জিন চাপাল। সে জিনটার ধারোটা রেশমের বন্ধনী, সে বন্ধনী শোভার জন্যে নয়, মজবূতির জন্যে। তারপর ঘোড়া ছুঁটিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে দেখে, নাগপুর্ণ তুগারিন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আলিওশা আকাশের দিকে তাকায়, বাজডাকা মেঘকে ডেকে বলে, জল ঢেলে তুগারিনের ডানা যেন ভিজিয়ে দেয়।

অমনি কালো মেঘ উড়ে এল, বৃষ্টি ঢেলে তুগারিনের ঘোড়ার পাথা দিল ভিজিয়ে। ভেজা মাটিতে পড়ল তুগারিন, খোলা মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকাল।

ধাক্কা লাগল যেন পাহাড়ে পাহাড়ে। আলিওশা পপোভিচের সঙ্গে তুগারিনের বেধে গেল যদ্য। গদা হাঁকাল তারা, কিন্তু ভেঙে গেল গদা। তুলে নিল বল্লম, বল্লম গেল বেঁকে। তারপর তলোয়ার, তলোয়ারের ধার গেল ভৌঁতা হয়ে। হঠাৎ আলিওশা টাল সামলাতে না পেরে খড়ের আঁটির মতো জিনের উপর থেকে পড়ে গেল গড়িয়ে। তুগারিনের উল্লাস আর ধরে না, আলিওশাকে মারতে যাবে, কিন্তু আলিওশা ছিল ভারি চটপটে। চট্ট করে সে তুগারিনের ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে চুকে, উহেটা দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরা দিয়ে তুগারিনের ডান বৃকে বসিয়ে দিল। ধাক্কা দিয়ে তুগারিনকে ঘোড়াটা থেকে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল আলিওশা:

‘নাগপুর্ণ তুগারিন, দামাস্ক ইস্পাতের হোরার জন্যে ধন্যবাদ। এইবার তোমার ধবল বৃক চিরে দেব, উজল নয়ন নিভিয়ে দেব।’

এই বলে তুগারিনের তাজা মাথা কেটে ফেলল আলিওশা, কেটে নিয়ে গেল রাজা ভ্যাদিমিরের কাছে। ঘোড়ার পিঠে আলিওশা চলে, আর খেলা করে মাথাটা নিয়ে। একবার করে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে যেখা তাকে লুক্ষে নেয় বল্লমের ডগায়। রাজা ভ্যাদিমির তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।

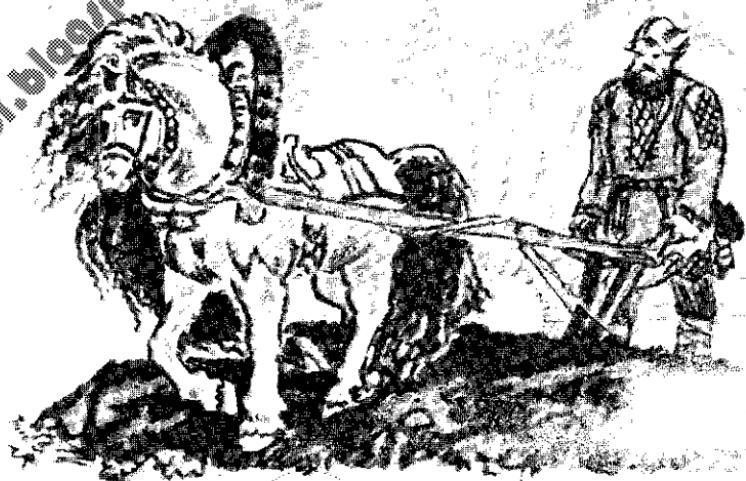
‘আসছে তুগারিন, আলিওশার তাজা মাথা নিয়ে আসছে। এবাব ও
আমাদের স্বামীর রাজ্য গোলাম করে রাখবে।’

পাহাড়ের ছেলে মারীশকো বলে উঠল:

‘কন্ত-রবি ভ্যার্দিমির, কিয়েভ-পাতি, দৃঢ়থ করবেন না। ঘমের অর্চি এ
তুগারিন যদি না উড়ে মাটিতে ঘোড়া চালায়, তাহলে ওর তাজা মাথাটা দামাস্ক
হস্পাতের বলমের ডগায় গেঁথে নিয়ে আসব। দৃঢ়থ করবেন না, রাজা
ভ্যার্দিমির।’

মারীশকো তখন তার দ্বৰবীন দিয়ে দেখে — আলিওশা পপোভিচ।
বললে:

‘দেখছি আমি বগাতৌরের বিভঙ্গ, তরুণ বীরের ব্রহ্ম! খাড়া হয়ে বসেছে
ঘোড়ায়, মুণ্ডু নিয়ে সে খেলছে, ছুঁড়ে দিয়ে লুকে নিছে বলমের ডগায়। এ
সেই ঘমের অর্চি তুগারিন নয়, মহারাজ, এ আসছে আলিওশা পপোভিচ,
নাগপুর তুগারিনের মুণ্ডু নিয়ে আসছে সে।’



ମିକୁଲା ମେଲଯାନିଗଭିତ୍ତି

ସାତ ସକାଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଠାର ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଭଲ୍ଗା ବେରଲ ସଞ୍ଚାଗରୀ ମହାର ଗୁରୁଚେତେଃସ ଆର ଅରେହଚେତେଃସ ଥେକେ ଭେଟ ନଜରାନା ଆଦାୟ କରତେ ।

ତେଜୀ ବାଦାମୀ ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢ଼େ ଧାରା କରଲ ଶୈନ୍ସାମନ୍ତ୍ରର ଦଲ । ଖୋଲା ମାଟେ ଫାଁକା ଡାଙ୍ଗା ପୋଛିତେ କାନେ ଏଲ ହାଲ ଦେବାର ଶବ୍ଦ । ହାଲ ଦିଛେ ଚାଷୀ ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଶିମ ଦିଛେ । ତାର ଲାଙ୍ଗଲେର ଫାଲେର ମୁଖେ ପାଥର ପଡ଼େ ଶବ୍ଦ ତୁଳଛେ । ମନେ ହଲ ଚାଷୀ ସେନ କାହେଇ କୋଥାଓ କାଜ କରଛେ ।

ବୀରରା ଚଲଲ ଚାଷୀର ଖୌଜେ: ଦିନ ଗିଯେ ରାତ ହୟ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଦେଖା ମିଲଲନା । ଶିମେର ଆଓଯାଜ ଶୋନା ଯାଚେ, ଲାଙ୍ଗଲେର କ୍ଯାଚକୋଟି ପାଥରେର ଧୂପଧାପ — ସବହି କାନେ ଆସଛେ, ଚାଷୀକେ କିନ୍ତୁ ଆର ଦେଖା ଧାର ନାହିଁ ।

পরদিন আবুর তারা ঘোড়া ছেটাল, সঙ্গে পর্যন্ত এল, তবু চাষীর দেখা মিলল না। অঞ্চল শিসের আওয়াজ আর লাঙলের কাঁচকেঁচ, পাথরের ধূপধাপ সবই শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে ভল্গা আর তার লোকজন পেঁচল চাষীর কাছে। লাঙল দিচ্ছে চাষী, তাড়া দিচ্ছে, হেটহেট করছে ঘোড়াকে, ফালের দাগ পড়ছে যেন এক একটা গভীর গড়খাই। বিরাট বিরাট ওক গাছ উপড়ে তুলছে, বড় বড় পাথরের চাঁই পাশে ছুঁড়ে ফেলছে। দুলছে শুধু মাথার কেঁকড়া চুল, রেশমের মতো লুটিয়ে পড়ছে ঘাড়ে।

চাষীর ঘোড়া কিন্তু দুবই সাধারণ জাতের। জাঙলটা যেগুল কাঠের, দাঁড়গুলো রেশমের। চাষীকে দেখে অবাক হয়ে গেল ভল্গা, অভিবাদন করে বলল:

‘কুশল হোক সুজন, চাষ করছো?’

‘কুশল হোক ভল্গা ভস্মেলাভিয়েভিচ, চলেছো কোথায়?’

‘গুৰুচেভেৎস আর অরেহভেৎস সহরে চলেছি, সওদাগরদের কাছ থেকে ভেট নজরানা আদায় করব।’

‘এই দুই সহরের সওদাগররা একেবারে ডাকাত। গরিব চাষীদের ওরা চুয়ে থায়, রাস্তা দিয়ে গেলে কর আদায় করে। আমি একবার নূন কিনতে গিয়েছিলুম। এক এক বস্তায় একশ’ পন্দ, তিন বস্তা নূন কিনে আমার ছেয়ে ঘোড়ার পিঠে চাঁপয়ে বাড়ী ফিরছি। সওদাগরেরা সব আমায় ঘিরে ধরল। পথ কর দিতে হবে। যত দিই, তত চায়। রাগ হয়ে গেল আমার। ক্ষেপে গিয়ে শেষ মেটালাম এই রেশমের চাবক কষে। যারা দাঁড়িয়েছিল বসে পড়ল, আর যারা বসেছিল তারা ধরাশায়ী।’

শুনে অবাক হয়ে গেল ভল্গা। মাথা নাইয়ে বলল:

‘ধন্য চাষী তুমি, মহাবীর বগাতীর। চলো আমার সঙ্গী হুবৈ।’

‘তা বেশ, যাব ভল্গা ভস্মেলাভিয়েভিচ, ওদের কেকু সময়ে দেওয়া দরকার, চাষীদের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার করতে না যাবে।’

এই বলে চাষী লাঙল থেকে রেশমের দড়ি খুলে নিয়ে, হেয়ে ঘোড়ার কাঁধ
থেকে জোয়াল নামিয়ে চেপে বসল, যাগ্ন করল।

প্রাপ্তি অর্ধেক পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে বীরেরা, হঠাতে ভল্গা
ভঙ্গেলাভয়েভিচকে চাষী বলল:

‘এই রে, একটা ভুল হয়ে গেছে ভল্গা, খোলা মাঠে লাঙলটা ফেলে
এসেছি। তোমার বীর অনুচরদের পাঠিয়ে দাও। লাঙলটা টেনে তুলে কাদা
মাটি ঝেড়েবুড়ে, যেন ওটা গাছের ঘোপে রেখে আসে।’

ভল্গা দলের তিনজনকে পাঠিয়ে দিল।

তারা ঘূরিয়ে পেঁচিয়ে কত চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই লাঙলটা তুলতে
পারল না।

ভল্গা তখন তার দশজন বগাতীরকে পাঠাল। কুর্ডি হাতে তারা ঠেলাঠেলি
করেও নড়াতে পারল না।

এবার সব লোক নিয়ে এল ভল্গা। এক কম দশজন লোক সবাই মিলে,
চারদিক থেকে টানাটানি করে হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল, কিন্তু লাঙলটাকে
এক চুলও নড়াতে পারল না।

তখন ঘোড়া থেকে নিজেই নামল চাষী। একহাতে ধরে একটানে সে
লাঙলটা মাটি থেকে তুলে ফেলল। ফাল থেকে মাটি ঝেড়েবুড়ে ছুঁড়ে দিল
গাছের ঘোপের দিকে। মেঘের সমান উচ্চতে উঠে ঘোপ পেরিয়ে ভেজা নরম
মাটিতে পড়ে হাতল অবধি ঢুকে গেল লাঙলটা।

কাজ হল, আবার পথ ধরল বগাতীরের দল।

এল ওরা গুরুচেতেৎস আর অরেহভেৎস সহরের কাছে। ওখানকার
সওদাগররা ছিল ধৃতি। যেই না চাষীকে দেখা, অর্মান তারা অরেহভেৎস নদীর
পুলে কাঠের পাটাতনগুলোর তলা কুপয়ে রেখে দিল।

আর যেই অনুচরদল পুলের উপর উঠেছে অর্মান পুলটা ছেড়েমুড় করে
ভেঙে পড়ল। নদীর জলে ডুবতে লাগল বীরেরা, ঘরতে লাগল সাহসী সৈন্য,
র্তালয়ে যেতে লাগল ঘোড়া মানুষ।

ভল্গা আর মিকুলা গেল ভীষণ রেগে। চাবুক কষে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা

এক লাফে প্রেরিয়ে গেল নদী। ওপারে পেঁচেছেই শিক্ষা দিতে লাগল
দুর্ব্বলদের।

চাষুক চালায় চাষী, আর বলে:

‘বৈছ-ছি, লোভী সওদাগরের দল, চাষীরা তোদের রুটি জোগায়, মধু
খাওয়ায়, আর তোরা এক কণা নন্দন দিতেও নারাজ !’

আর ভল্গা তার অনুচরদের, বগাতীরী ঘোড়াদের শোধ তুলতে লাগল
গদা দিয়ে।

গুরুচেতেৎস নগরের লোকেরা তখন অনুত্তাপ করতে লাগল। বলল:

‘আমাদের অপকর্ম, আমাদের ছলচাতুরী মাপ করুন। আপনার ভেট
নজরানা সব দিয়ে দিচ্ছি। চাষীও যেন নিশ্চিন্তে নন্দন কেনে। আর এক
কাশাকাড়িও চাইব না।’

বারো বছরের মতো ভেট নজরানা আদায় করল ভল্গা, তারপর দুই
বগাতীর বাড়ীর দিকে রওনা হল।

ভল্গা চাষীকে বলল:

‘রূশ বগাতীর, কী বলে তোমায় ডাকে, কী নামে মান্য করে ?’

চাষী বলল, ‘আমার বাড়ী ছলো, ভল্গা ভ্সেম্লাভরেভিচ, তাহলেই
জানতে পারবে লোকেরা আমায় মান্য করে কোন নামে ডাকে !’

বগাতীররা ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সেই মাঠে পেঁচল। চাষী লাঞ্ছলটা টেনে
তুলে, সারা মাঠ চষে সোনার বীজ পুর্ণতে দিল ...

স্বৰ্য অন্ত ঘেতে না ঘেতে ক্ষেতে তার বর্মবাঘিয়ে উঠল ফসল।

অঙ্ককার রাত ঘনিয়ে আসতেই চাষী সেই ফসল কেটে নিল। সকা঳ে
ঝাড়াই করে, দৃশ্যরবেলা মাড়াই করে, খাওয়ার আগেই পিষে, ময়দা ঘনিয়ে
পিঠে গড়ে সন্ধ্যের মুখেই পাড়ার সব লোকজন ডেকে এক মন্ত ভোজ দিল।
পিঠে খেতে লাগল লোকে, বিয়র খেতে লাগল, গুণগান করতে লাগল চাষীর:

‘অনেক ধন্যবাদ তোমায়, সেল্যানিনপুর মিকুলা !’

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসম্পর্ক বিষয়ে আপনাদের
মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য
পরামর্শও সাদরে শুনগীয়।

আমাদের ঠিকানা:

‘রাদুগা’ প্রকাশন

১৭, জুবোভিস্ক বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

‘Raduga’ Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

На языке бенгали

Перевод сделан по книгам:
«Русские народные сказки» в обработке А. Н. Толстого;
Детгиз, Москва, 1946 г. и «Русские народные сказки»,
Госполитиздат, Москва, 1952 г.